পূর্ব্বাপর

উপন্যাস

অনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

চার টাকা

ভাদ্র—১৩৬৩

উৎসর্গ

অরুণা ও অঞ্জলি

পূর্ব্ব এবং পর—

ভানু—

বিজ্ঞপ্তি

সর্ব্বাণী উপন্যাসের-যে প্রথমাংশ উহ্য রাখিয়া উহার শেষ অংশ বিবৃত করা হইয়া ছিল উহা লইয়া লিখিয়াছিলাম পূর্ব্বাপর নাটক। ১৩৫৬ সালের মহিলা পত্রিকায় ঐ অংশটী প্রকাশিত হইযাছিল।

এক্ষনে সেই পূর্ব্বাংশকে উপন্যাসাকারে সর্ব্বাণীর সহিত একত্র সংযুক্ত করিয়া পূর্ব্বাপর নাম দিযা এই উপন্যাসটী প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বাপর নাটক বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, বিশেষ করিয়া সিনেমা-মহলের। উপন্যাসটীও পাঠক মহলে সম সহানুভূতি লাভ করিলে ধন্য হইব।

রোজভিলা
রানীগঞ্জ—১৩৬২

নিবেদিকা
লেখিকা

ভূমিকা

রেল লাইনের খুবই কাছে, তাই ট্রেনে বসিয়া সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায় ঐ বাড়ীটাকে এবং বাসিন্দাদেরও ঐ দিকে থাকিলে, কতকগুলি মোটা মোটা থামের উপর লোহার রেলিং ঘেরা চওড়া গাড়ি-বারান্দা-ওয়ালা মধ্য-ভিক্টোরিয়ান্ যুগে যে ধাঁচের বাড়ী এদেশেও প্রচুরতররূপে প্রচলিত হইযা উঠিয়াছিল, আজও যথেষ্ট দেখা যায়, সেই রকমেরই বেশ বড়-সড় একখানা বাড়ী এটা। এব জন্ম তারিখ তো আর এর গায়ে লেখা নাই, তবে আকার-প্রকারে জানা যায় শতাব্দী পূর্ব্বেরই হয়ত বা তার কিছু কম বেশীও হইতে পারে এর জন্মকালে এ বাড়ীটার রং কি ছিল তার গায়ের একশো বছরের বর্ষা জলের শেওলা পড়া কালো দাগের মধ্য দিয়া, সে তো আর এখন বুঝিতে পারা যায় না হয়ত সেটা সাদাও হইতে পারে, আবার হল্‌দে হওয়াও কিছুই বিচিত্র নয়! উপর, নীচের জানলার সংখ্যা গুণিলে জানা যায় ঘর এ বাড়ীতে নিতান্ত সংখ্যাল্প নয়। বাড়ী-খানির প্রশস্ত চৌহদ্দিটি উঁচু পাঁচিল দিয়া ঘেরা। লোহার ফটকটার মাথাটা বহু পুষ্প প্রসবিনী মালতী লতার দ্বারা খচিত। সেটা যে বহুকাল হইতেই ওখানে আশ্রয় পাইয়াছে তার মোটা মোটা কাণ্ডগুলি হইতেই তা' সুস্পষ্ট জানা যায়। বাগানের এখন অবশ্য শ্রী ছাঁদ তেমন নাই তবে বিগত বৈভবের সাক্ষ্য স্বরূপে ভাল ভাল নামজাদা অনেকগুলি গাছ আজও এখানে সেখানে বাঁচিয়া-বর্ত্তিয়া আছে। বকুল, মাধবীলতা, গুলঞ্চ, কাঞ্চন, কামিনী, গন্ধরাজ এ ছাড়াও দুইটা ঝাউ, দু এক ঝোঁপ ক্যাক্‌টাস্, কয়েকটা পাতা-বাহারী ক্রোটন এম্‌নি এম্‌নি কষ্টসহিষ্ণু গাছেরা যাদের

প্রাণশক্তি নিতান্ত ভঙ্গুর নয়। তা ছাড়া বাড়ীটার পিছন পিঠে নিম, জাম, আম, কাঁঠাল ও কয়েকটা তাল নারিকেলের সহিত বিদ্যমান।

এ বাড়ীর ডান হাতি বেশ বড় একটি পুষ্করিণী। গোবিন্দলালদের বারুণী পুকুরের মত হয়ত নয়, তবে সাধারণতঃ যে সমস্ত ঐ জাতীয় পুষ্করিণী বাংলা দেশকে ম্যালেরিয়া প্রদানে ধন্য করিতেছে, তাদের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে না। এ বাড়ীর এতদিনকার অধিবাসীবৃন্দ এরই জল সরিত বলিয়া বাগানটার মত এর প্রতি হেনস্থা জ্ঞাপন করিতে পারে নাই। কাঁচ-স্বচ্ছ সলিল বক্ষে দিনে সূর্য্য-বিম্ব, রাত্রে নক্ষত্রের গাঁথা মালা মন্দ বায়ু হিল্লোলে নর্ত্তিত হইতে একটুও বাধা পায় না। বাঁধানো সিঁড়ির উপরে একটি প্রশস্ত চাতালের দুধারে পাথর বসান দুটি বিশ্রামাসন অবস্থিত। পিছনটায় তার হেলান দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করাও আছে, তার গঠনেও আঙ্গীকে নিপুণ কারিগরের হাতের একটুখানি নৈপুণ্যের ছাপও দেখা যায়। বাড়ীর বাবুরা অপরাহ্ণে মেয়েরা ঘাট সারিয়া চলিয়া গেলে হয়ত উদ্যান ভ্রমণান্তে এইখানে বসিয়া বিশ্রামে ও বিশ্রম্ভালাপে নিরত রহিতেন।

ফটকের একদিকে গাড়ি ঘোড়ার আস্তাবল। মনে হয় এ দুটি বহুকালেরই পরিত্যক্ত। এর মধ্যে এখন বাড়ী মেরামতের চুনগোলার প্রকাণ্ড জালা ও ভাঙ্গা হাঁড়ী বালতী, রাবিস ভর্ত্তি মালির কাজের বাঁটভাঙ্গা কোদাল, নিড়ানি, ফুটা-ঝারি, আর কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া কোন্ সত্যকালে ঝুলাইয়া রাখা ঝুল ও ধূলি ধূসরিত ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জামগুলা পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। দরজার একটা পাল্লা খুলিয়া গিয়াছিল, বসানো আর হইয়া উঠে নাই, হয়ত শীতকালে আগুন পোহানোর জন্য না হয় চাপাটি বানাইতে অন্য ধারের মালি ও দরওয়ানের ঘরের অধিকর্ত্তা সাহারাণ বা ভোজপুরী দরওয়ানই তাকে চ্যালা কাঠ করিয়া লইয়া তাদের কাজে লাগাইয়াছে! এ বাড়ীর বহু অধিবাসী অধ্যুসিত

এই প্রকাণ্ড বাড়ীটায় আজ তার একমাত্র অধিবাসী এবং অধিকারী,—যিনি তাঁর সরকারী উচ্চপদ হইতে পেন্‌সন লইয়া একমাত্র মেয়ে সঙ্গে জীবনের শেষ সীমাটুকু পার হইতে পিতৃ-পিতামহের আবাস গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নাম তাঁর সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,—তিনিই তাঁর এই বিশ্বস্ত দরওয়ানটিকে তাঁর শেষ কর্ম্মস্থান হইতে সঙ্গে করিয়া আনিযাছেন। সে ঐ ঘরের ছোট্ট একটা চুলায় ক্ষুদে একটি 'বাঁটলো' চাপাইয়া 'রহরীর' দাল আর অা-চালা আটার হাতে গড়া মোটা মোটা চাপাটী বানাইযা ভোজনকালে কাঁচ্চা-দু-তিন ঘিয়ে সেগুলি জুবড়াইয়া লয়। কাজ তার এমন কিছু বেশী নয়। এটা সেটা বাজার দোকানটা সারে, তারপর আলস্য-অলসিত মধ্যাহ্নে ও অনুত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় দড়ি ছাওয়া চারপাইযে হাত-পা ছড়াইযা কখন মৃদু গুঞ্জনে, কখন গলা ছাড়িয়া কবীরজীর বা তুলসীদাসেব দোঁহা আওড়াইয়া বা পড়িয়া নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের রিক্ততা ও তিক্ততার পরিহার চেষ্টা করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে সে সুর মধুর ও করুণ হইযা অদূরবর্ত্তী জনবিরল গৃহ বাতায়নে আনমনা একটি মাত্র সঙ্গহীনা তরুণীর কাণে তার সুরটুকু করুণ মূর্চ্ছনায় তরঙ্গিত হইযা প্রবিষ্ট হয়। হয়ত বা গানের দু-একটি ছত্রও সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, কদাচিৎ উহা গভীর অন্যমনস্কতা হইতে তাহাকে সচকিত করিয়া তোলে। হযত বাকিটা শোনার জন্য উন্মুখ ও উৎকর্ণও কখনও কখনও করে, কিন্তু গান হযত শেষ হয় না। হয়ত দালের চুল্লিতে কাঠ ঠেলিবার প্রয়োজন পড়িযা যায় অথবা গায়কের বিদ্যার দৌড় ঐ পর্য্যন্তই! গান অবশ্য উচ্চাঙ্গেরই,—কিন্তু গায়ক তার মূল্য-মূলে পৌছিতে না পারার জন্য সে তো তার কাছে যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়! সে নিতান্ত সহজ বুদ্ধিতেই সোজাসুজি কলি কয়টা গাহিয়া উঠিয়াছিল, কোন ভাব মনে লইয়া তো নয়,—

"যাঁহা লোটা রশি ঔর কুঁয়া নাহি,—
উঁহা পিয়াসন ত্যেয়াগণ করেকে চাহি,—
ঐসি,—মনকে ধৈরজ ধরে কে চাহি।"

গান থামিয়া গেলেও গীতকারের উচ্চারিত ঐ কথাগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রোত্রীর মনের মধ্যে ভ্রমর গুঞ্জনের মতই গুমরিয়া গুমরিয়া ফিরিতেই থাকে। সহজ ও সরল উপদেশ মাত্র! তৃষার্ত্তকে ব্যর্থ প্রয়াস ত্যাগ করিতে বলিতেছেন,—

"যাঁহা লোটারশি ঔর কুঁয়া নাহি,
উঁহা পিয়াসন ত্যেয়াগণ করে কে চাহি।"

উপদেষ্টা ঠিকই তো বলিয়াছেন! যেখানে পিপাসা মিটাইবার কোন উপায় বা উপাদান কিছুমাত্র নাই, সেখানে পিপাসাকেই পরিত্যাগ করা সঙ্গত এই না সুযুক্তি? অথচ এতবড় যুক্তিটা শুনিতে শুনিতে বুকের ভিতর গভীর হইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস গলার কাছে ঠেলিয়া উঠে,—কিন্তু কেন? এ ছাড়া আর কি কিছু বলার ছিল? তা' ছিলনা, তবে বলা যত সোজা করা কি তেমন?

পরিত্যক্ত ছায়াচ্ছন্ন ঘরগুলায় ঢুকিলে মন যেন কেমন ছম্‌ছম্‌ করিতে থাকে, দর্শককে হাঁ করিয়া ওরা যেন গো-গ্রাসে গিলিতে আসে! কতই বা আগে এই সব ঘর পূর্ব্বাধিবাসীদের জিনিষে পত্রে সাজে সরঞ্জামে ছেলেতে মেয়েতে ভর্ত্তি ও ভরপূর ছিল। এখন সেই সব জনহীন পরিত্যক্ত ঘরগুলার মধ্যে মাত্র দু' একখানায় কচিৎ ভাঙ্গা একটা সেকেলে শালকাঠের তক্তাপোষ, অন্যত্র ছেঁড়া একখানা ছোবড়ার গদি,—ফ্রেমভাঙ্গা পোকায় কাটা আর্ট স্কুলের ছাপা সুলভ মূল্যের কলঙ্কভঞ্জন বা কালীয় দমন গোছের কয়েকখানা জীর্ণ ছবি একটা ঘরের একটা কোণে

পড়িয়া আছে। আর আছে দেয়ালের গায়ে ছবি টাঙ্গানোর হুক ও পেরেক পোঁতার অসংখ্য গর্ত্ত এবং কোথাও কোথাও ছবির মাপের এক একটা চৌকা বা লম্বা ছাপ দেয়ালের গায়ে গায়ে ছাপা।

বহির্ব্বাটীর হল ঘরটায় মস্ত একটা তালা ঝুলানো,—চাবি বন্ধ সেটা। বড় বড় সেকেলে ছয় অথবা নয় ডালের ঝাড়গুলা কলিকাতার বাসায় তো আর লইয়া যাওয়া চলে না, তাই হলজোড়া কার্পেট, ঐ ঝাড় কটা আর পিতৃপুরুষদের প্রমাণ তৈলচিত্রগুলাই, এবং ভারি ভারি জর্জ্জরথাডপ্যাটান সোফা-সেটীদের সঙ্গে পিতৃ-পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত স্থলেই আপাততঃ রহিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতের কথা অবশ্য ভবিষ্যতে! তখন হয়ত দেখা যাইবে যে ঐগুলি চুলচেরা হিসাবে দাম কষিয়া এ বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্তাকেই মিটাইয়া দিতে হইতেছে! তা' এ সবে তার দরকার বা রুচি থাক আর না-ই থাক।

এতলোক সহসা চিরদিনের বাস উঠাইয়া অকস্মাৎ মহামারী বিধ্বস্ত অথবা মারামারির আসন্নতার আতঙ্কে আতঙ্ক গ্রস্তদের মতন একসঙ্গে দেশত্যাগী হইয়া ছুটিয়া পলাইল কোথায় এবং কেনই বা? এ একটা খুব দরকারী প্রশ্ন বৈ কি! কিন্তু এর উত্তর তো এক কথায় দেওয়া আর সম্ভব নয়? এর জন্য যে পূর্ব্বাপরের অনেক কুলজী ঘাঁটিতে হইবে। অতীতকে না জানিলে বর্ত্তমানকে তো চেনা যায় না, সে কথা সবাই জানতো? তবে বর্ত্তমানের ব্যাপারটা মোটামুটি এই রকম ;—সুরঞ্জন তাঁর পৈত্রিক গৃহে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বাস করিয়া শেষ জীবনে একটুখানি তৃপ্তি পাইবেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর এই সঙ্গী-হীনা, জীবনে অ-প্রতিষ্ঠ একমাত্র মেয়েটিকেও তার নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে স্নেহ-সূত্রে নিবদ্ধ করিয়া কিছুটা হয়ত বা নিশ্চিন্ত হইলেও হইতেও পারিবেন, অন্তর্গূঢ়ভাবে এইটেই হয়ত তাঁর মনোভিলাষ ছিল।

এমন ধারা কাণ্ডটা ঘটিবে এ বার্ত্তা জানিতে পারিলে এতবড় অন্তর্ব্বিপ্লব ঘটানো তাঁর সুসংযত ও সুভদ্র চিত্তের একটি কোণাযও কোনমতেই হয়ত স্থান পাইত না! পিতামহের উইল অনুসারে তাঁর তৈরি করা এই বাড়ীটি নাকি ভাগাভাগি করা নিষিদ্ধ ছিল। সুরঞ্জনেব অর্দ্ধাংশ এবং তাঁব খুল্লভ্রাতাদের বাকি অর্দ্ধ, অপর পক্ষ তাঁকেই সেগুলি সমস্ত কিনিযা লইতে বলিলে দ্বিরুক্তিমাত্র না করিযা তিনি তাঁদেরই ইচ্ছামত এই বিরাট বাড়ীব দায়ভার একরকম অনাবশ্যকেই মাথায় তুলিয়া লইলেন। সে সময উহারা মনেব কথা তাঁদেব তো তাঁকে জানান নাই! একেবারে নীরবে থাকিয়াই নিজেদের মধ্যে নিষ্ক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তাহার আযোজন করিযা তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করিয়া তুলিতেছিলেন, সে খবর কেমন কবিযা যুক্তপ্রদেশে থাকিযা ইনি জানিতে পারিবেন? গণৎকাব বা ইন্‌টুইসিনষ্ট এসব কিছুই তো তিনি ন'ন। একমাত্র মেযে সঙ্গে সুরঞ্জন তাঁর পুনঃপুনঃ আশাহত গভীর ক্ষত চিহ্নিত চিত্তমন লইয়া বাহ্যতঃ হাসিমুখে সেদিনকার সকালে এ বাড়ীর দেউড়ি পার হইয়াই চমকিযা উঠিয়া দেখিলেন পরেব পর, পরের পর মাল বোঝাই ও লাদাই গাদাই হইয়া বড় বড় লরীর শ্রেণী তাঁহারই বাড়ি হইতে দল বাঁধিযা বাহির হইযা যাইতেছে! এই অভাবিত দৃশ্য দর্শনে মনে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। গাড়ি-বারান্দায গাড়ি ঢুকিবার স্থান তো ছিল না, তাড়াতাড়ি অদূরেই নামিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে সাম্‌নের বারান্দায় উঠিতে গিযাই এবাড়ীর এতদিনের অবিসম্বাদী কর্ত্তা অনুকূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। তিনি তখন ঘর দালান ভর্ত্তি বড় বড় সমস্ত মাল চালান দিতে মহা ব্যতিব্যস্ত। "এই যে!"—বলিযা কাছে আসিলেন, পায়ে হাত দিয়া প্রণামও একটা করিলেন। এটা যে নূতন সৃষ্টি সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই বিস্ময়

বিমূঢ় সুরঞ্জন স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "এত সব জিনিষপত্র কোথায় যাচ্চে অনুকূল? ছেলেমেয়েরাই বা সব কোথায়? কই?— কারুকেই দেখতে পাচ্চিনে যে?"

মুখে এক রকমের একটা চাপা হাসির বিকৃত ভঙ্গী করিয়া সুরঞ্জনের পিছনে আড়ষ্ট অভিভূতবৎ দণ্ডায়মানা তাঁর তরুণী কন্যাটির দিকে বিষ-মাখানো তীরের ফলার মত তীর্যক দৃষ্টি হানিয়া মেজকর্ত্তা অনুকূল সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, "তারা কেউই তো এখানে নেই তো দেখতে পাবে কি করে? ওরা সব্বাই কলকাতায় আগেই চলে গেছে। কেউ গেছে সালখে, কেউ টালা, কেউ ভবানীপুর। আমি এই বাকি জিনিষপত্তরগুলো পাঠিয়ে খালি করে এই ঘণ্টা কতকের মধ্যেই তোমার বাড়ী তোমায় ছেড়ে দিচ্চি। খুব বেশি দেরি আর হবে না। এই কুলি! না, ঐ বড় সিন্দুকটা আগে তোলা, আর এই যে এই গুলো রে, ব্যাটা!—" অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং ছুটিয়া নির্ব্বোধ কুলিকে নির্দ্দেশ দিতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে সুরঞ্জন শব্দ-ভেদী বাণবিদ্ধ ঋষিকুমারের মতই ভিতরে ভিতরে ছটফট করিয়া উঠিয়াছেন, তাঁর ভায়ের সেই অব্যর্থ লক্ষ্য, বিদ্ধস্থান হইতে এক ঝলক বক্ষশোণিতের মতই একটা বিস্ময়াপ্লুত বেদনাও আকুল স্বর বেগের সহিত ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

"অনুকূল! অনুকূল! এ' কি বলছ তুমি? তোমরা সব্বাই তোমাদের চিরদিনের এই পিতৃ-পিতামহের ঘর ছেড়ে ভাড়া বাড়ীতে চলে যাচ্চো? না না না, এ' কি কখন হতে পারে? এ' কি একটা কথা! আমরা যে তোমাদের কাছে, তোমাদেরই আশ্রয়ে থাকবার জন্যেই এতদূর থেকে ছুটে এলুম!" তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া দ্রুত আসিয়া অনুকূলের হাত ধরিলেন, "না না, এ' হতে পারে না অনু! এক্ষণি ওদের সব বিদায়

করে দাও,—লক্ষ্মী ভাই! আমার কথা শোন,—আমরা তবে কিসের জন্যে এখানে এলুম? কা'কে নিয়ে এই বাড়ীতে থাকবো?"

এত কথা, এত বড় আকুল আবেদন, এ শুনিয়া নরম হওয়া তো দূরে থাক, অনুকূলের মুখ আরও অনেকখানি কঠোর হইয়া উঠিল, ব্যস্তভাবে নিজের ধৃত হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া তিনি কার্য্যরত কুলিটাকে একটা প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচণ্ড ধমক দিয়া উঠিলেন; "ওটা নয় রে, বুড়্বক। ঐ, ঐ, ঐটে নে', কত দেরি করছিস এই ইষ্টুপিড!" সুরঞ্জনের দিকে স্পষ্ট চোখে না চাহিয়া টেরছা চোখের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে,—জ্বলন্ত প্রতিশোধের ও প্রতিজ্ঞা সাফল্যের বিজয়দর্পে পরিপূর্ণ সেই দৃষ্টি পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর প্রতি বিষাক্ত তীরের মতই সবেগে নিক্ষেপ করিয়া অপারেসন ছুরির মতই নির্ম্মম অথচ তেমনই শান্ত ও সুস্থির কণ্ঠে জবাব দিলেন, "তা' বলে তো আর তোমার বাড়ীতে তোমার ঐ কন্যা-রত্নের সঙ্গে এক বাড়ীতে বউ ঝি নিয়ে আমরা বাস করতে পারিনে' বড়দা! সমাজই বা তা' আমাদের করতে দেবে কেন বল? সে তো ভাই, তোমার জজকোর্টের সেরেস্তাদার নয়!"

এর পরে আর তর্ক চলে না এবং অনুনয় বিনয় অনুরোধ উপরোধ,—কিছুই না, আর নয়! এ যে নির্ম্মম সত্যের একান্তই উলঙ্গ প্রকাশ! মাথা হেঁট করিয়া অতি কষ্টে স্খলিত কণ্ঠে তবুও বলিলেন, "একথা আগে তুমি আমায় লেখনি কেন? তা'হলে তো আমরা এখানে আসতুম না।"

অবিনাশ কুলিদের সঙ্গে কর্ম্মব্যস্ত থাকিয়াই এবার অস্পষ্টভাবে একটু-খানি হাসির মত যেন শব্দ করিয়াই এর জবাব দিলেন "বাঃ! তুমি পয়সা খরচা করে বাড়ী কিনেছ, পুরো বাড়ীর মালিক এখন তুমি, নিজের বাড়ীতে বাস করতে আসছো, বলবার কথা এ'তে কি আছে যে, তুম করে বলতে যাব? যাও, ভিতরে যাও বড়দা! ব্যবস্থা তোমার সবই

ঠিক করা আছে। আজকের মতন কোন অসুবিধেই তোমায় ভোগ করতে হবে না, ধনিয়া মালি আছে, শশিঠাকুরটাও—আমি এখন ওগুলো সব রওনা করে দিই গে',—নইলে সময়মত পৌঁছতে পার্ব্বে না, বড্ড অসুবিধেয় পড়তে হবে। আচ্ছা, এখন আমি আসি। যাও তুমি যাও বিশ্রাম করগে, পথে তো কষ্ট একটু হয়েইছে। চেহারায় তো আর কিছুই নেই, চেনাই যায় না!"

শিকার করা বিহঙ্গীকে বাজ পাখারা যে দৃষ্টিতে দেখে সেই রকমেরই একটা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তীব্র অপমানের আঘাতে অর্দ্ধমৃত মেয়েটার শব-শুভ্র মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া অনুকূল বেগের সহিত চলিয়া গেলেন।

তাইতো আগেহ বলিয়াছিলাম যে, কার্য্যের কারণটুকু জানা না থাকিলে সবই যেন হেঁয়ালি লাগে! কিন্তু না, ঠিক তাতো নয়, সব ঘটনারই পিছনে পৌর্ব্বাপর্য্য থাকে। হেঁয়ালি বলিয়া ততোক্ষণই মনে হয়, যতক্ষণ না অতীতকে জানা যায়। পুরাতনকে না জানিলে, অতীতের অন্ধকার গুহা নিহিত সত্যতত্ত্বকে উদ্ধার করিয়া দিবালোকে সুস্পষ্টরূপে চোখের উপর ধরিয়া দিতে না পারিলে বর্ত্তমান পা রাখিবে কোন সুদৃঢ় আধারের উপরে?

পূর্ব্বাপর

বিদ্যুৎপ্রভা

১

সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করিয়া সুরঞ্জন অল্পদিন মাত্র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিবার পর মহকুমা শাসকের পদ পাইলেন। দু জায়গা ঘুরিয়া কর্ম্মস্থান হইল পূর্ব্ববঙ্গের একটি জেলায়। সেই সময় কয়েকদিনের ছুটিতে কলিকাতা আসিয়া কলেজের এক সহপাঠীর জন্য কনে দেখিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। কনে বিদ্যুৎপ্রভা অত্যন্ত সুন্দরী, বি-এ পাশ, সঙ্গীত শাস্ত্রেও তিনি সুনিপুণা এবং উচ্ছল প্রাণময়ী। পিতৃমাতৃহীনা হইলেও মাতুল ও মাতুলানীর স্নেহ সৌভাগ্যে সবিশেষ সৌভাগ্যবতী। অপছন্দ করার কথাই এস্থলে ওঠে না, কিন্তু হঠাৎ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল! ঐ মেয়ে মামাকে নিজে গিয়া বলিল, সে প্রিয়ব্রত ঘোষালকে বিবাহ করিবে না, বরের বন্ধু সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করিবে। প্রিয়ব্রত এই দিকেরই ধনী জমিদার, দেখিতে শুনিতেও সে এমন কিছু মন্দ নয় এবং গ্র্যাজুয়েট। হইলে কি হয় তা', বড় একগুঁয়ে মেয়ে, সে একেবারেই বাঁকিয়া বসিল। মামা মামী তাকে বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না। সুরঞ্জন অবশ্য প্রিয়ব্রতর চাইতে সুদর্শন, সে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, তার দাম হয়ত আধুনিকার চক্ষে বেশী হওয়াই সম্ভব, কিন্তু টাকার দিক দিয়া প্রিয়ব্রত ওর চাইতে যথেষ্ট বেশী ধনী। বিদ্যুৎ সে যুক্তি মানিল না। অগত্যাই তার মামা সুরঞ্জনকে গিয়া ধরিয়া পড়িলেন। সুরঞ্জন বন্ধুর প্রতি অন্যায় করা হইবে বলিয়া রাজী হইল না। নিরুপায় মামা প্রিয়ব্রতর কাছে

গেলেন। প্রিয়ব্রত অপমানে কালো হইয়া গেলেও ঘোর অভিমানে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া বলিল, "আমিও ওঁকে চাই নে, যাকে ইচ্ছা উনি বিয়ে করুন গিয়ে, আমার তা'তে কোন আপত্তি নেই।"

শেষ পর্য্যন্ত কন্যাপক্ষের আনাগোনায় এবং প্রিয়ব্রতেরই বিশেষ আগ্রহে সুরঞ্জনের সঙ্গে বিদ্যুতের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ বাসরে এবং ফুলশয্যার পুষ্পবাসরে প্রিয়ব্রত সবচেয়ে বেশী করিয়াই আমোদ করিল এবং যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবেই সে বিদ্যুতের সহিত বন্ধুপত্নীর ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করিয়া দুজনকার মন হইতেই সমস্ত কুণ্ঠা বিদূরিত করিয়া দিল। কুণ্ঠা অবশ্য সুরঞ্জনের দিকেই, বিদ্যুৎ নিজ কার্য্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইয়াছে এমন মনে হয় না। সে বেশ সহজ সপ্রতিভ ভাবেই স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

সুরঞ্জন কিছু বিস্মিত হইলেও এদের দুজনের ভাব দেখিয়া সরল মনে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁর প্রকৃতি অত্যন্ত ভদ্র এবং একান্ত ন্যায়পরায়ণ হইলেও সিভিল সার্ভিসোচিত নয়, নিরীহ ও একান্ত শান্তিপ্রিয়।

বাহিরে তাঁদের দিন ভালই কাটিতেছিল কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঠিক যেন খাপ খায় নাই, সেখানে গোপনে গোপনে একটা অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত হইতে চলিয়াছে। বিদ্যুতের স্বভাব তার স্বামীর সম্পূর্ণই বিপরীত। সে যেমন অভিমানী তেমনি প্রভুত্বপ্রিয়। সুরঞ্জনের আদর্শ তিনি যে পদাধিকার করিয়া আছেন তার প্রকৃত সার্থকতা দ্বারা দেশের যথাসাধ্য মঙ্গল সাধন করা। বিলাত ফের্ত্তার উগ্র সাহেবীয়ানার পরিবর্ত্তে দেশ-সেবকের চিত্ত লইয়াই তিনি এই উচ্চপদাধিকার করিয়াছিলেন। সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিলিয়া সকলের সর্ব্বকার্য্যের সহায়তা করিয়া অল্পদিনেই তিনি তাঁর অধিকৃত জেলার সার্ব্বজনীন চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া

লইতেন। বিদ্যুতের নিকট তাঁর এই নম্রতা একান্ত হীনতার পরিচায়ক মাত্র ঠেকিত। সে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ তুলিয়া পরিবর্ত্তে শান্তযুক্তি এবং স্নিগ্ধহাস্যমাত্র লাভ করিত। শান্ত প্রকৃতি সুরঞ্জন তাঁর অতি শিক্ষিতা ও আধুনিকা স্ত্রীর হাতে নিজ গৃহের সমস্ত অধিকারই নিঃস্বত্বে প্রদান করিয়া তাঁহারই আশ্রিত হইয়া আছেন, কিন্তু নিজের কার্য্যক্ষেত্রের আদর্শ হইতে একটি পা'ও সরিয়া দাঁড়ান নাই। 'মৃদুনি কুসুমাদপি' হইলেও সেখানে তিনি ছিলেন 'বজ্রাদপি কঠোর'। বিদ্যুতের কথাতো স্বতন্ত্রই, সামান্য ভৃত্য চাপরাসী কেরাণী বা অধীন কর্ম্মচারীরাও কেহ কোনদিন তাঁর মুখে একটা কড়া কথা শোনে নাই অথবা মুখভার করিতে দেখে নাই। প্রয়োজন হইলে কঠোর তিরস্কার করিয়াছেন একথা সত্য, কিন্তু উপযুক্ত বাক্যবিন্যাসের আবরণে ঢাকা দিয়া এমন করিয়া বলিয়াছেন যে, তিরস্কৃত বোধ না করিয়া তাহারা তাহাতে পুরস্কৃতই বোধ করিয়াছে।

বিদ্যুৎ—শুধু বিদ্যুৎই তাঁর এত বড় মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিল না। সে ছিল বৃটিশ আমলের একজন তথা-কথিত পরিমার্জ্জিত শিক্ষা ও রুচির উত্তরাধিকারিণী মহিমাময়ী লেডি। আশা তার বহু ঊর্দ্ধ-প্রসারী, আদশ সুদূর বিশারী, ডিগনিটি জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারীতেই তার স্বামীর কর্ম্মভূমি নিবদ্ধ থাকিবে এ তার অসহ্য! দেশের বাজে লোকদের খোসামোদ না করিয়া যাদের মতে ও পথে চলিলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয় তার মতে সেই পথই শ্রেয়ের পথ ও সেই পথই একমাত্র প্রেয়, নতুবা এ চাকরীতে ঢোকার কোন অর্থ-ই তো হয় না! তাঁর নীচে হইতে অন্যেরা কাজ দেখাইয়া খুসী করিয়া এক লাফে উপরে উঠিয়া যাইবে আর সে থাকিবে মাঝ পথে পড়িয়া? এ অসহ্য!

এই লোকটার কন্দর্প-কান্ত রূপের ভিতরকার মূর্ত্তিটা কি লোহার না

পাথরের ? রস-কষ কি এর মধ্যে কোথাও কিছু নাই ? বিদ্যুতের যে গান শুনিয়া কলিকাতার পথচারীরা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কান পাতিত, তার সেই সঙ্গীত সাধনার মধ্য হইতে সহসা কোন্ কচুপোড়া কাজের কথা স্মরণ করিয়া সুরঞ্জন না বলা কওয়া হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া যান। বিদ্যুৎ অভিমান করিলে উত্তর দেন, "কাজটা ফেলে রাখা যে চলতো না।" আসল কথা রসবোধ যাহাকে বলে সে বস্তু সুরঞ্জনের মধ্যে আদৌ জন্মেই নাই। মানুষের বাহিরের রূপ আর অনন্তর রূপে যে দুইটা মেরুর মত মিল থাকে না সে অভিজ্ঞতা সুরঞ্জনকে বিবাহ করার পূর্ব্বাবধি বিদ্যুতের ছিল না। কিন্তু হইলে কি হয়, সে তার সুরূপ ও সুবিদ্বান আত্মভোলা স্বামীকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়াই যে ভালবাসিয়াছে। যাহাকে সে তার সমস্ত নিঃশেষে নিবেদন করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে তাহার নিকট হইতে ঠিক তেমনি করিয়াই প্রতিদান না পাইলে তার চলিবে কেন ? সে তো গীতা পাঠ করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, ইংলিশ অনারে বি-এ পাশ করিয়াছে। সে ভাব-প্রবণা, নৃত্য-গীত পটীয়সী, অভিনয় কলা-কুশলা, বহু কাব্য-নাট্যের সরস রস গ্রহণে তার চিত্ত মন গঠিত হইয়াছে, অথচ সে পুরাপুরি বস্তুতান্ত্রিক। এই দুই অসম আদর্শের নর-নারীর মিলন তাই অত সুখের উপাদান ও উপচারের মধ্যেও ঠিক সুখের হইতে পারিতেছিল না। অবশ্য সেটা এক তরফায়, কারণ সুরঞ্জনের মনে সুখ-শান্তির কোন অভাব দেখা যাইত না। তিনি মনে মনে হয়ত দুঃখ পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত বা বিগলিত করে নাই। স্ত্রীর সকল কার্য্যই তিনি অপ্রতিবাদে মানিয়া নে'ন, কিন্তু নিজের কর্ত্তব্যে অবিচলিতই থাকেন। যদি না প্রিয়ব্রত ঘোষাল—অর্থাৎ মিষ্টার ঘোষাল তাঁদের পিছনে ছায়ার মত লাগিয়া থাকিত, হয়ত এমন করিয়াই তাঁদের

জীবন কাটিয়া যাইত, হয়ত বিদ্যুৎ ক্রমশঃ তার স্বামীর মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজের সঙ্গে কতকটা আপোষ করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু—

সেদিন সূর্য্যাস্তকালের একটা সুন্দর অপরাহ্ণ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিরাট বাংলোর সুসজ্জিত ড্রইংরুমে ততোধিক প্রসাধন সজ্জিতা ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী তার আগতপ্রায় নাট্যাভিনয়ের চিন্তায় ও তৎসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় আয়োজনে অত্যন্তই ব্যস্ত থাকিয়া আত্মগত কহিতেছিল, "স্কুলের জন্যে একটা চ্যারিটি পারফরম্যান্স করতেই হবে, তা'তে নিশ্চয়ই অনেকগুলো টাকা উঠবে, ইনি তো কিচ্ছুটিই করে উঠতে পার্ব্বেনই না, ভাগ্যে এই সময়টায় মিঃ ঘোষাল এসে পড়েছেন কি একটা কাজে, তাই রক্ষে! কত সাহায্য যে পাচ্চি ওঁর কাছে, চমৎকার লোক কিন্তু!—ওঃ—তুমি এসেছ? দেখ, এই অকেজনটার জন্যে নিজেই একটা ড্রামা লিখেছি, তোমায় একটু পড়ে শোনাতে চাই এটা।"

সুরঞ্জন প্রবেশ করিয়াছিলেন নিজেরই কোন জরুরী কাজে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমায় যে এক্ষুণি বেরুতে হবে, শোনা তো শেষ হবে না, ওরা যে এসে পড়বে।"

বিদ্যুৎ একখানা খাতা হাতে টানিয়া নিয়া একটা কৌচে আসিয়া বসিল, বলিল, "বসো, বসো,—তোমার অ্যাসিস্ট্যাণ্টটি কি জন্যে আছেন? সব তা'তেই তোমায় ছুটতে হয় কেন? তাঁকে লিখে পাঠাও তোমার মাথা ধরেছে।" বলিয়াই সে পড়িতে আরম্ভ করিল, "তুঙ্গীন-পুরের রাজপ্রাসাদ, রাজার বিশ্রাম কক্ষ, রাজা আত্মগত—

"পাঠান এসেছে দ্বারে, সত্য কি একথা? দূত গেছে আনিতে বারতা, এখনও এলোনা কেন? (রাণীর প্রবেশ) রাণী। মহারাজ! নিদ্রামগ্ন বিশ্বচরাচর, তোমার কি বিশ্রামেরও নাহি অবসর? রাজা (ম্লান ভাবে) ছুটে আসে বন্যাবেগে পাঠান বাহিনী, কেড়ে নিতে রাজ্য ধন

মান, নিদ্রার সময় কোথা রাণী ? রাণী, মিথ্যাকথা রচা এ কাহিনী ! কালি মোর বসন্ত উৎসব, মুরজ মৃদঙ্গ বীণা বাঁশরীর রব, মোহিয়া রাখিবে চিত্ত, গানে গানে ঘুচাইবে জীবনের যত কিছু গ্লানি ।”

দ্বারের বাহির হইতে বয় জানাইল, “হুজুর ! নিস্‌পিকটর সাহেব ঔর দোসরী সাহেব লোগ সালাম ভেজা, মোটর তৈযারী হ্যায ।”

সুরঞ্জন “যাতা হ্যায” বলিয়া সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

বিদ্যুৎ কহিল, “বল্লুম না, বলে দাও মাথা ধরেছে, যেতে পার্ব্বো না, এস্. ডি. ও’কে নিয়ে যেতে বলো ।”

সুরঞ্জন হাসিযা কহিলেন, “তা’ও কি হয় পাগল ! দরকারী কাজ যে ।”

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিদ্যুৎ কহিল, “মাথা তোমাব কখন ধরে না ?”

সুরঞ্জন কহিলেন, “আজ তো ধবে নি । মিথ্যা কথা বলে সরকারী কাজের ক্ষতি করা কি ঠিক ?”

“অতটুকু মিথ্যেয কিচ্ছুই যায় আসে না । বেশ ও কথা না বলতে পারো, বলে দাও আমার স্ত্রীর কলেরার মতন হযেছে ।”

সুরঞ্জন মৃদু হাসিলেন, “সেটা মিথ্যে বলা হবে না ?”

বিদ্যুৎ রাগ করিয়া বলিল, “চার ফোঁটা আর্সেনিক খেলে এক্ষুণি তাকে সত্যি করে দিতে পারি, বেশ, তাই কর্ব্বো ।”

সুরঞ্জন কাছে আসিয়া সস্নেহে কহিলেন, “কি ছেলে মানুষ তুমি বিদ্যুৎ ! ভীষ্ম জীবনে মিথ্যা বলেন নি, তাই তিনি মৃত্যুকে ইচ্ছাধীন করেছিলেন । কাজটা আজ সেবে আসি, কাল তোমার নাটক শুনবো । কেমন না ?”

বিদ্যুৎ সাভিমানে মুখ ফিরাইল,—“মৃত্যুকে ইচ্ছাধীন করতে কোন তপস্যারই দরকার করে না । যাও, তোমায় আমার বই শুনতে হবে না । তুমি তোমার গোলামখানায় গোলামী করতে যাও ।

আমায় যেমন ভূতে ধরে, তাই মরতে তোমার খোসামোদ করতে যাই।"

বয় দ্বারের নিকট হইতে সসঙ্কোচে আবার জানাইল, "হুজুর! উন্‌লোগোনে বলতি হ্যায়, কে' টেরেন কিবখ্‌ত হোগিয়া।"

সুরঞ্জন তিক্তস্বরে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্চি, যা।" স্ত্রীর উদ্দেশে বলিলেন, "ফিরতে রাত হবে। কাল নিশ্চয়ই শুনবো। লক্ষ্মীটি! রাগ করো না, কাল দেখো—"

সুরঞ্জন চলিয়া গেলে বিদ্যুৎ আসিয়া তার পরিত্যক্ত কৌচটায় বসিয়া পড়িয়া খাতাখানা সবেগে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"কাল শুনবে! কাল আমি শোনালে ত! কাল আমি বেঁচে থাকলে ত! নাঃ, সত্যি,—ভস্ম করতে ইচ্ছে করে। খুব খানিক আর্সেনিক কি পট্যাসিয়াম সাইনাইড পেতুম এই সময়! যাঃ—আমি কিচ্ছু কর্ব্বো না। ছাই লেখা! ছাই অভিনয়! আমার সব ব্যর্থ!"

ঠিক এই সময় "আসতে পারি" প্রশ্ন করিয়াই খাঁটি সাহেবী পোষাকে মিঃ ঘোষাল প্রবেশ করিলেন,—"নমস্কার মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী! —এ কি! এমন করে বসে কেন? না না, হাসবার চেষ্টা কর্ব্বেন না! ওতে আপনার মুখের ঘনীভূত মেঘ বিদ্যুদালোকের মধ্য দিয়ে আরো বেশী করে ফুটে ওঠে, আমার প্রাণে বজ্রের মত বিদ্ধ হয়। কিন্তু কেন? এই তো সবে চারটি বছর আপনাদের বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে এত ঝগড়া-ঝাঁটি হয় কিসের বলুন ত? বস্ত্রালঙ্কার আপনি এর চাইতে অনেক বেশী পেতে পারেন, দু একখানা হীরে না হলে আপনার এই বৈদ্যুতিক রূপ কি সোনা মুক্তোয় মানায়! তা' আমি এ কথাটা ওকে বলবো।"

বিদ্যুৎ সচকিতে কহিয়া উঠিল, "না না, কিচ্ছু বলবেন না!

একবার একটা হীরের আংটি কিনতে গেছলাম, বল্লেন, ওঁর খুড়তোত ভাইএর মেয়ের বিয়েয় ঢের টাকা ওঁকে দিতে হবে; এখন থাক।—তক্ষণি ফেলে দিয়েছিলুম।”

মিঃ ঘোষাল শিহরিয়া উঠিলেন, “হোয়াট এ স্যারো ভিউ! ওই কথা ও আপনাকে বলতে পারলে! এমন কুইন অফ বিউটি এঁর জন্য সমস্ত সংসার একদিকে—”

বিদ্যুৎ ঈষৎ লজ্জিত মুখে বলিল, “কি যে বাজে বকেন!”

মিঃ ঘোষাল হাসিলেন, “For truth has such a face and such a mien.

“As to be loved need only to be seen.”

বিদ্যুৎ খাতাখানা কুড়াইয়া লইয়া ঘোষালের বাহুমূলে মৃদু আঘাত করিল, “যান! আপনি বড় খোসামুদে।”

“যার যেমন ভাগ্য! এই প্রিয়-সত্য আমার বন্ধুর মুখে প্রেমের গুঞ্জন লাগতো আবার আমার মত একটা বাইরের অভাজনের মুখে—”

“মাপ কর্ব্বেন, মিঃ ঘোষাল! আপনি আমার কাছে আর বাইরের লোক নেই। স্বামীর বন্ধু রূপে এসেছিলেন, কিন্তু আজ আমারই বন্ধু আপনি। আপনিই বলুন, যদি আপনার প্রশংসা বাক্যের অর্দ্ধেকটাও আমি হতেম, তাহলে কি আপনার বন্ধু আমায় এমন করে দূরে ঠেলে রাখতে পার্ত্তেন? তাঁর মনে আমার স্থান খুবই সঙ্কীর্ণ হয়ত বা শূন্যই—”

মিঃ ঘোষাল দীর্ঘ করিয়া একটা নিঃশ্বাস মোচন করিলেন, সখেদে কহিলেন,—“ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। আমি ওকে একথা বলেছিলুম, যাক্‌গে, ওসব অপ্রিয় আলোচনা না করাই ভাল। ভাল, আপনার সেই ড্রামা লেখার কতদূর কি হলো? সত্যি, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী!

আপনি যদি ঘর সংসারের এটা সেটা না করে এই একটা জিনিষ নিয়েই ধরে থাকতেন, একটা মস্ত বড় নাম করতে পারতেন।”

বিদ্যুৎ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা, কতটা পর্য্যন্ত শুনেছেন বলুন তো? মীরজুম্‌লার সঙ্গে রাণীর সখী উৎপলাক্ষীর কথোপকথনের দৃশ্যটা না?”

মিঃ ঘোষাল সোৎসাহে কহিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ষ্ট্রাইকিং সীনটাই তো হচ্ছিল! আচ্ছা, আসুন না কেন, আমরা পশ্চিমের বারান্দায় ঐ উজ্জ্বল মধুর সান্‌সেট দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ ড্রামাটিক পোজের মধ্যে এই অতি অপূর্ব্ব নবজাত নাটিকাখানি থেকে মিষ্ট রসটি উপভোগ করিগে’।”

“তাই চলুন! আঃ মিঃ ঘোষাল! আপনি না এসে পড়লে এ ড্রামা তো আমি এতক্ষণে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়েই ফেলেছিলুম!”

মিঃ ঘোষাল আতঙ্কে শিহরিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি সর্ব্বনাশ! এমন কথা মনেও আনবেন না! আমি ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও যখন যা’ আপনার প্রয়োজন পড়বে, আমায় অসঙ্কোচে আদেশ কর্ব্বেন, কৃতার্থ হয়ে গিয়ে তা’ প্রাণপণে সম্পন্ন করে দেবো।”

বিদ্যুৎ কৃতজ্ঞতায় নিজেই যেন কৃতার্থ হইয়া গিয়া আবেগভরে উচ্চারণ করিল,

“এ ফ্রেণ্ড ইন নীড,
এ ফ্রেণ্ড ইনডীড।”

এ কথাটার মূল্য আজ আমি মনে প্রাণে বুঝতে পারলেম।
বয়কে ডাকিয়া বারান্দায় চেয়ার দিতে আদেশ করিল।

২

ইহার পরদিন পূর্ব্ব সর্ত্তানুযায়ী সুরঞ্জন যথাকালে আসিয়া কহিলেন, "কই, তোমার বই না খাতাটা নিয়ে এসো, কি পড়বে, পড়ো শুনি।"

বিদ্যুৎ পূর্ব্ব সঙ্কল্প সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়া পরমোৎসাহে খাতা খুলিয়া ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান স্বামীর পাশে একটা সেটীতে আসিয়া বসিল এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ পড়া আরম্ভ করিল। মনের সকল অভিমান তার ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। তার পরম রূপবান স্বামীটিকে সে যে চোখে চোখে রাখিয়া ভালবাসিতে ও ঠিক সমান ওজনে ভালবাসা লাভ করিতে চায়—এ কেন সে বোঝে না? মানুষকে যেমন নেশায় পায় তার রূপ-তৃষ্ণার্ত্ত উগ্র-প্রেমও তাকে তেমনি করিয়া যেন এই স্বামী-সঙ্গ নেশায় পাইয়া বসিয়া আছে। জানিয়া বুঝিয়াও সে ইহার সর্ব্বগ্রাসী হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না, কি করিবে?

নাটকের দুটি অঙ্ক শেষ হইতেই সুরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, "এইবার উঠি বিদ্যুৎ! বিশেষ একটু কাজ আছে। ফের কাল শোনা যাবে, কেমন?"

বিদ্যুৎ তার বিশাল নেত্র টানিয়া বিদ্যুতের ঝিলিক মারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, মাথা ঝাঁকাইয়া তীব্র স্বরে বলিল, "কি রকম! কাল তুমি বল্লে না আজ শুনবে? আজ আবার কাজের বায়না শোনাচ্চো যে বড়?"

সুরঞ্জন মৃদু হাসিলেন, "কম্‌লী নেহি ছোড়তা হ্যায় জী! আমি কাজ ছাডতে চাইলে কি হবে, কাজ আমায় ছাড়ে কই?"

বিদ্যুৎ সবেগে মাথা নাড়া দিল, সরোষে কহিল, "সে আমি জানিনে, কাল তুমি বলেছিলে।"

সুরঞ্জন বলিলেন, "কাল আমি বলেছিলেম এবং আজ আমি তোমার নাটকের দু-দুটো অঙ্ক শুনেওছি ; কিন্তু বিদ্যুৎ! এতগুলো করে টাকা মাইনে খাচ্চি, কাজে ফাঁকি দিই কি করে বল তো? সেটা কি ধর্ম্মে সইবে?"

"আঃ আবার সেই তোমার আন্ত কেলে পচা পুরোণ ধর্ম্মের তর্ক! তুমি জ্বালালে! মাইনে ত আর তোমায় ওরা অমনি দিচ্ছে না, আর একলা তোমাকেই ঢেলে দিচ্ছে না, যত লোক সরকারের মাইনে খায়, সব্বাই কি তোমার মতন গাধার খাটুনী খাটে বলতে পার? কোনও নব-বিবাহিত ইংরেজ দম্পতি তার কচু পোড়া কাজের খাতিরে তার বিলাভেড ওয়াইফকে হামেসা এই রকম ডিসাপয়েণ্ট করে বলতে চাও? ওদের কাছে ম্যানারস্‌টা শিখতে পারোনি, যখন বিলাতে ছিলে?"

সুরঞ্জন উঠিয়া ছিলেন ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "সেটাতো ওখানে আমাদের পাঠ্য ছিল না বিদ্যুৎ! আর নেহাৎ আনাড়ি বলে হাতে কলমে শেখারও সুবিধা হয়ে ওঠে নি। যাক্ গে' ও ফাইল আজ বাঁধাই থাক, তুমি পড়ো।"

"অমন মুখ ভার করে শুনলে আমি কক্ষণো পড়বো না। আচ্ছা, আমার কাছে থাকতে হলে তুমি অত বিরক্ত হও কেন বলতো? আমায় একটুও ভাল লাগে না?"

সুরঞ্জন উঠিয়া বসিয়া বিদ্যুতের অভিমানভরা মুখখানা কাছে টানিয়া আনিলেন, সহাস্য চোখে চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "বিলক্ষণ! তোমায় ভাল না লেগে ভাল লাগতে যাবে কা'কে শুনি? কাজ যে বড্ড বেশী পড়েছে কি করি? আমার কি সাধ তোমার কাছে না থাকি?"

বিদ্যুৎ সাভিমানে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "কি জানি!

মনে হয় তুমি কোনদিনই আমায় ভালোবাসোনি। আমিই তোমায় ভালবেসে জোর করে স্বয়ম্বরা হয়েছি, তুমি তো আর আমায় চাও নি বরং আপত্তিই তুলেছিলে।"

সুরঞ্জন কহিলেন, "বিলক্ষণ। সেটা কি খুবই অন্যায় করেছিলাম? ওটুকু না করলে ও কি ভাবছো বলো ত? যাক সে তো সব চুকেই গেছে—আজও সে অভিমান মন থেকে তোমার গেল না?" খাতা ধরা হাতটা জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া সাদরে নাড়িয়া দিলেন,— নাও, নাও লক্ষ্মীরাণীটি আমার! তারপর কি হ'ল? পড়ো তো শুনি।"

বিদ্যুৎ খাতার পাতা উল্টাইয়া কহিয়া উঠিল,—"কি মাথামুণ্ড পড়বো! তুমি আমার ফিলিংটাই যে নষ্ট করে দাও, আর কি তেমন করে জমবে! আবার এইখানেই একটা গান দিয়ে মরেছি ছাই! সেটাতো গেয়েই শোনাতে হবে।" আরম্ভ করিল,—

"তুদ্দীনপুরের পুরোদ্যানে রাণীর সেই অষ্ট-সখী বসন্তোৎসবে মত্ত রহিয়াছে, সকলের অঙ্গে অঙ্গে ফুলের সাজ, ফুল তুলিতে তুলিতে গান গাহিতে ছিল,—উঠিয়া অর্গানের কাছে গেল ও সাধনা-সিদ্ধ সুধাকণ্ঠে গাহিল—

আঁচল ভরে তুলবো কুসুম কাননভরা ফুলে ফুলে,—
বসন্তের ঐ গন্ধবহ বইছে প্রাণের কূলে কূলে,
অশোক এবার উঠবে ফুটে, রাঙ্গা পায়ের পরশ লাগি,
চাঁদের চোখে চাউনি বাঁকা, চন্দ্রাননের দরশ মাগি,
কুরুবকের কোমল মালা পরিয়ে দিই আয় চুলে চুলে।

"—এমন সময় রাজা রাণী একসঙ্গে প্রবিষ্ট হয়ে মুকুলিত অশোক তরুর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এখানেও একটা গান দিয়েছি। এর

সুরটা কি দিই ? কানাড়া দোষ কিনা ঠিক বুঝতে পারছিনে, তুমি যদি গান-টান একটু জানতে !”

এই সময়ে বয় দ্বারের ওপাশ হইতে জানাইল, “হুজুর ! নাজীরজী কুছ্ জরুরী বাতকো ওয়াস্তে খাড়ি হ্যায় ।”

সুরঞ্জন উত্থিত হইলেন, বলিলেন, “কহো আতা হ্যায় ।”

বিদ্যুৎ উত্তপ্ত তীক্ষ্ণস্বরে সবেগে কহিয়া উঠিল, “ঠিক এই সময়টাতেই চল্লে !”

“আসছি,”—বলিয়া সুরঞ্জন চলিয়া গেলেন ।

বিদ্যুৎ মিউজিক টুল হইতে উঠিয়া আসিয়া হতাশভাবে কৌচের উপর ঝুম করিয়া বসিয়া পড়িল,—“অসম্ভব ! এই লোক নিয়ে ঘর করা চলতে পারে না, কিচ্ছুতে না ! কক্ষণো না ! যাকে এত ভালবেসে বিয়ে করলুম, এত তাচ্ছিল্য তার কাছ থেকে অহোরহ সহ্য করতে আর যেন পারছিনে ! কেন ? আমি ছাড়া আর একজনকেও তো কই এতটুকু অপেক্ষা করতে বলতে পারেন না ! যত অগ্রাহ্য এই আমাকেই ? আমি ওঁর অধীন বলে ? গলগ্রহ বলে ? আচ্ছা, আমিও এর শোধ তুলবো, দেখিয়ে দেবো আমিও নেহাৎ তুচ্ছ কর্ব্বার মতন ছিলুম না, একদিন আমারই জন্যে ঐ বড় বড় দুচোখ দিয়ে হুহু করে জল ঝরে পড়বে, তবেই—”

সুরঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া নিজের পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিলেন, হাস্য স্মিত স্বরে কহিলেন,—“যাক বিদায় করে দিয়েছি ! এমনি করে তোমরাই আমাদের স্পয়েল করো । স্রেফ বলে দিলাম, বাড়ীতে বিশেষ কাজ আছে, আজ বাইরে যেতে অসমর্থ, ওখানে জানিয়ে দিতে । খুসী ?—পড়ো ।”

বিদ্যুৎ আত্মসম্বরণ করিতে করিতে স্নিগ্ধ চোখে চাহিয়া হাসি মুখে একটু কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, বলিল, “দেখলে ত, স্ত্রী বেচারাকে

এইটুকু ফেভার করতে পৃথিবী উল্টে ফেলতে হলো না ?—নাঃ ও গানটা এখানে মানাবে না, যুদ্ধের শেষে ওটা রাণী রাজার গলায় বিজয় মাল্য দিতে দিতে একাই গাইবে। এখন এইটে বরং হোক,—মৃদু মৃদু খালি গলাতেই গাহিল, অত্যন্ত সুকণ্ঠী সে, শিক্ষাও তার তেমনই অনবদ্য !—

গীত

"পথ চেয়ে দিন কাটলো মোদের যে অতিথির আসার আশে,
আজ কি তুমি সময় পেলে বসন্তের এই মধুমাসে ?"

দ্বারের বাহিরে ভয়ার্ত্ত নারী কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "আমি কি একটু আসতে পারি স্যার ? আমার যে বড্ড বিপদ !"

সুরঞ্জন চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন, সংশয়িত স্বরে কহিলেন, "কে ? মিসেস্ সেন ? কি হয়েছে ? ভিতরে চলে আসুন।"

পাতলা শীর্ণ শরীর, সামান্য সাড়ী সেমিজ আলুথালু ভাবে পরা, একটি দীর্ঘাঙ্গী নারী অর্দ্ধ বিহ্বল ভাবে প্রবেশ করিয়াই টলিয়া পড়িতেছিল, সুরঞ্জন হাত বাড়াইয়া ধরিয়া পাশের একটা আসনে বসাইয়া দিয়া মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হলো আপনার ?"

বিদ্যুৎ গান থামাইয়া ছিল, তার বিদ্যুৎ চঞ্চল তীক্ষ্ণদৃষ্টি তীব্রতর হইয়া উঠিল।

মিসেস্ সেন হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল,—"ছোট বাচ্চাটার কাল থেকে খুব জ্বর, আজ ডাক্তার মিত্রকে অনেক কষ্টে পেলাম, তিনি বলছেন, ডিপথিরিয়া। সেরাম নাকি ফুরিয়ে গেছে, এক্ষুণি মোটরে করে যদি কেউ যায় তো সন্ধ্যার মধ্যে ফিরতে পারে। তাঁর তো মোটর নেই, কে যাবে ? কি হবে স্যার ?"

"আপনি বাড়ী যান, আমিই যাচ্ছি"—এই বলিয়া সুরঞ্জন পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। মিসেস্ সেন কষ্টে উঠিয়া বাহিরে যাইতেছিল, বিদ্যুৎ উহাকে ডাকিয়া ফিরাইল, কঠিন কণ্ঠে কহিল, "এটা একটু বেশী অ্যাড্‌ভানটেজ নে'ওয়া হচ্ছে না কি? উনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলার কর্ত্তা, তুমি চাও ওঁকে দিয়ে চাকরের খাটুনী খাটাতে?"

মিসেস্ সেন স্তব্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ়ভাবে বিদ্যুতের দিকে চমকিয়া চাহিল, ব্যাকুল কণ্ঠে কান্নার সুরে কহিল, এ কি বলছেন! ওঁকে দিয়ে চাকরের খাটুনী খাটাবো আমি! এতবড় স্পর্দ্ধা হবে আমার! উনি বড্ডই দয়ালু, উনি দাতা, উনি দেবতা, তাই না এই বিপদের অকুল সমুদ্রে পড়ে ওঁর দয়ার প্রত্যাশায় জ্ঞান শূন্য হযে ছুটে এসেছি, যদি উনি কারুকে দিয়ে আনিয়ে দেন। দয়া করেন বলেই না এতটা সাহস। তা' নইলে আমার মত অনাথা বিধবার সাধ্য কি যে এমন করে কালেক্‌টার সাহেবের কুঠীতে ট্রেসপাশ করতে সাহস করি।"

"উনি বুঝি বরাবরই তোমার সাহায্য করেন?"

সাগ্রহে মিসেস্ সেন উত্তর করিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ! আমার স্বামী কোন ছোট বেলায ওঁর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আমার ছেলে দুটির জন্যে যে কত করেছেন, তা' এক কথায় বলা যায় না। আজও যে দুমুঠো ভাত দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি, সে শুধু ওঁরই দয়ায়। জুনিয়ার ট্রেনিং পড়ার খরচ দিয়ে পাশ করিয়ে এই চাকরী-টুকুও তো ওঁর জন্যেই পেয়েছি, নৈলে কে দিত আমায়? গরীব বন্ধু বলে বরাবরই একটু যত্ন নিতেন, তারপর মরণকালে ওঁকে ডেকে পাঠিয়ে আমাদের ওঁরই পায়ে ফেলে দিয়ে গেছেন। আমি যাই মিসেস্ চ্যাটার্জী! খোকা একলা পড়ে আছে, বড় খোকাকে বসিয়ে রেখে আমি ছুটে এসেছি।" বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

বিদ্যুৎ ক্রোধ-পরুষ কণ্ঠে তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আর কারু কাছে যেতে পারনি? একেবারে কালেক্টারের ড্রইংরুমে ছুটে ঢোকা,—এটা নাটকেই চলে, সংসারে চলে না। চাপরাসীগুলোও কি তেমনি হয়েছে!"

মিসেস্ সেন সভয়ে উত্তর করিল, "গরীবের প্রতি দয়া জগতে ক'জন করে মিসেস্ চ্যাটার্জী? দেবতা একজনই কদাচিৎ জন্মান। আর চাপরাসীরা? হ্যাঁ তারাও আমায় যথেষ্ট বাধা দিয়েছিল বইকি, আমিই তাদের কথা মানিনি—"

সুরঞ্জন এই সময় আসিয়া বলিলেন, "আসুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। হেঁটে গেলে দেরি হবে।"

উহারা চলিয়া গেলে বিদ্যুৎ অসহায়ের মত অর্গানের ডালায় তার ঘূর্ণিত মস্তক রক্ষা করিল, "উঃ—অসহ্য! ঐ শুঁটকী মাছের মতন মাগীটার সঙ্গে এত ইনটিমেসী! কি রকম নীচ প্রবৃত্তি! ঘেন্নায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে! উঃ মোটরে আমার জায়গায় ঐ নোংরা মাগীটাকে পাশে বসিয়ে সারা সহরের বুকের উপর দিয়ে আবার ছুটে চল্লেন! লোকে কি ভাববে?" তীব্রস্বরে সহসা বলিয়া উঠিল, "নাঃ, আমি আর ও গাড়িতে চড়বো না,—না,—কক্ষণো না! কক্ষণো না!"

মিষ্টার ঘোষাল কোন সাড়া না দিয়াই প্রবেশ করিয়া কাব্যপাঠের কৃত্রিম সুরে আবৃত্তি করিলেন :—

"কিহেতু নীরব আজি কলকণ্ঠ কোকিলার সঙ্গীত লহর? হুঁ হুঁ! দেখছেন কি? আপনার সঙ্গ পেয়ে আমিও এক পা এক পা ক'রে কবি হ'বার দিকে এগুচ্ছি যে! সেই যে কালিদাস না কে একজন নাকি যেন লিখে গেছেন, "বাচালং করোতি মূকং" উঃ হুঁঃ, ভুল করেছি, 'বাচাল'টা' পরে হবে, 'মূকং করোতি বাচালং'—কি? আপনি হাসছেনও

না যে? কথাও কইছেন না একটা? 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের' মত মুখ করে বসে আছেন? কি ব্যাপার?"

বিদ্যুৎ দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল।

মিঃ ঘোষাল কাছে সরিয়া আসিলেন, "অ্যাঁ! আজকেও আবার এক পশলা হয়ে গ্যাছে নাকি? নাঃ! আপনারা দেখছি জীবনগুলো একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলছেন! স্রেফ একটা কাঠগোঁয়ার। ওর মধ্যে যদি কোন রস-কস ভব্যতা জ্ঞান আছে, বরাবরই ওটা ঐ একরকম! আমি এই হাতযোড় করে মাপ চাচ্চি, মিসেস্ চ্যাটার্জী! আপনি ওর কথা ধর্ব্বেন না, বড্ড পাড়াগেঁয়ে কিনা, আপনাকে ঠিক মতন ধরতে পারে না। আমি তো আপনার ভক্ত সেবক একটা রয়েছি,—যা' যখন আদেশ কর্ব্বেন পালন করে কৃতার্থ হয়ে যাবো। বলুন না কি করতে হবে?"

চোখের উপর হইতে হাত সরাইয়া দিতে দিতে গম্ভীর স্বরে কহিল,— "কি নরম হাত আপনার! কবিরা বোধহয় একেই 'কর পল্লব' বলে থাকেন!"

বিদ্যুৎ সহসা অভিভূত হইযা পড়িল, আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "এ আমার পাপের প্রাযশ্চিত্ত! মিষ্টার ঘোষাল! মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে, তখন তার জন্যে পড়ে থাকে শুধু প্রায়শ্চিত্তের দীর্ঘ অবসর মাত্র আর কিছুই না।"

সাগ্রহ স্মিতমুখে মিঃ ঘোষাল বিদ্যুতের ধৃত হস্ত সবলে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁর সঘন কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "কে বলতে পারে? মানুষের জীবন নিছক মায়া বা স্বপ্ন নয়! তার একটা উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে, গতি এবং স্থিতিও আছে, যেটা আমাদের অলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে, চোখে বা মনে এখনও যার রূপ পূর্ণ ভাবে ধরা পড়েনি। এমন দিনও তো একদিন আসতে পারে যেদিন তুমি, বিদ্যুৎ—"

সুরঞ্জন দ্বারের বাহির হইতেই বলিতে বলিতে আসিলেন, "কি সময়েই ওষুধটা পেয়ে গেছি,—আমি নিজে না গেলে হতো না। মনে হচ্ছে ছেলেটা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরলো।"

মিষ্টার ঘোষাল বিদ্যুতের হাত ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-ভাবে বলিতে চেষ্টা করিলেও একটা অস্বাভাবিকতা তাঁর স্বরে প্রকাশ পাইল, "তুমি বুঝি তলে তলে ডাক্তারীও চালাচ্চো না, কি হে? কা'দের ছেলে বাঁচিয়ে এলে হে? ভিজিট পেলে কত? ঐ টাকাটা টেঁকে না পুরে মিসেস্ চ্যাটার্জীকে একজোড়া হীরের দুল কিনে দাওনা।"

সুরঞ্জন গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া দুজনকার ভাব দেখিয়া ঈষৎ একটু বিস্মিত হইলেও উহাতে আমল দেন নাই, ক্লান্ত ভাবে অন্ধধারের একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া রুমালে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে শ্লথ-স্বরে কহিলেন, "ফ্রি-ওয়ার্কের ভিজিট থাকে না ত প্রিয়!"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন,—"সে ত' করতেই হবে, আজকাল যে ফ্রিওয়ার্কেরই কাল পড়েছে। দেখ যেন শেষটা ফ্রি-লাভে পড়ে যেও না!"

অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে হাসিয়া বিদ্যুতের দিকে চাহিল।

সুরঞ্জন তীক্ষ্ণনেত্রে যুগপৎ উভয়ের দিকেই চাহিয়া দেখিলেন, ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "সে সম্ভাবনাও আছে নাকি?" তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "একটু চা পাবো? না, তোমাদের হয়ে গ্যাছে? —বয়!"

বয় সাড়া দিয়া প্রবেশ করিতেছিল, উত্তর করিল, "জী-হুজুর!"

বিদ্যুতের দিকে চাহিয়া বলিল, "চা পানি তৈয়ার হ্যায়।"

ওদিকে গার্লস্কুলে মহিলা সমিতির সম্মিলনী গৃহে ঠিক এই সময়েই থিয়েটারের রিহার্সেল চলিতেছিল, কয়েকজন বিশিষ্টা মহিলা এবং হেডমিষ্ট্রেস্ প্রভৃতির সম্মুখে রাণী ও অষ্ট-সখী সাজে সজ্জিতা মেয়েরা

অর্ঘ্যপাত্র, পুষ্পমাল্য, দীপাধার, ধূপধুনা, শঙ্খ প্রভৃতি বরণদ্রব্য হস্তে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, বিদ্যুতের বিলম্ব দেখিয়া তার প্রতিনিধির আদেশে সমবেত কণ্ঠে গান ধরিল :—

গীত

"কার আগমনী ধ্বনি, ঘোষে গগনে ?
ও'কি মঙ্গল সঙ্গীত ভাসে পবনে !
আজি যাঁর এ অভিযান, গাহো তাঁরই জয়গান,
আরতির দীপশিখা জ্বালি নয়নে।
পূজ আজি মনোভবে, মন তব ভরা রবে,
চির বিজয়িনী হবে প্রেম সাধনে।"

৩

মেয়েস্কুলের থার্ড টিচারের ছোট্ট একটি কোয়ার্টার। টালির ছাদ দেওয়া একখানি মাত্র ঘর, সামনে একটি বারান্দা, পিছনের সরু বারান্দার একটি পাশ ঘিরিয়া রান্নাঘর করিয়া লওয়া হইয়াছে, সেখানে তাকে ও সিকায় ঝুলানো হাঁড়ি কড়া, উনানের পাশে কাঠকুটা কয়লা ইত্যাদি রাখা আছে। ঘরের মধ্যে তক্তাপোষে পরিচ্ছন্ন শয্যা পাতা বালিশের ওয়াড়ে হাতের কাজ করা, গায়ে দেওয়ার কাঁথাগুলিতেও শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। একধারে কেরোসিনের একটি বড় প্যাকিং বাক্স সুন্দর সূচীকার্য্য করা সাদা কাপড়ে ঢাকা, তার উপর একটি যুবকের মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ, সাম্‌নে তার আধ-শুখনো গুটিকত জুঁই ফুল, একটি টিনের আয়না, চিরুণী, কাঁচের ফুকা দোয়াত, কাঠের সামান্য একটি কলম ও পেনসিল,

কয়েক সিট কানফোঁড়া কাগজ এবং দু' তিনটি মিক্সচারের শিশি। বিছানায় একটি বছর পাঁচেকের শীর্ণ শিশু শুইয়া আছে, মাথার কাছে পাখা হাতে বসিয়া একটি সাত কিম্বা আট বছরের বালক তার গায়ে বসা মাছি তাড়াইতেছিল, সেও প্রায় ইহার মতই শীর্ণ। মা আসিয়া তাদের পাশে দাঁড়াইয়া শয্যালীন ছেলেটিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে একটু যেন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় খোকা! ডাক্তারবাবুকে একবার বলে আয়তো বাবা, ফের যেন খোকার নিশ্বাসটায় টান ধরছে। দয়া করে একবারটি যেন এক্ষুণি চলে আসেন।"

ছেলেটি চাহিয়া দেখিয়া উত্তর করিল, "ও যে ঘুমুচ্চে, ঘুমুলে ঐরকমই তো হয় মা!"

মা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল, "ঘুমুলে ঐরকম হয়! তুই আমার চাইতে বেশী জানিস? যা' বাবা, যা'! ডেকে আন তাঁকে, ঐ দেখ্ কি রকম হাঁপিয়ে উঠলো! ত্রস্তে বসিয়া পড়িয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিল।"

বড় খোকা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "যাচ্চি, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে হয়ত পাবো না মা! উনি কোনদিনই তো এসময়ে বাড়ী থাকেন না—"

মা আকুল হইয়া উঠিল, "তবে কি হবে রে? কোথায় কোথায় যান, কা'দের বাড়ী যান, ডিসপেন্‌সারীতে—"

বড় খোকা বাধা দিল, "কাল ডিসপেন্‌সারীতে ছিলেন না, আর কা'দের বাড়ী যান, কত জায়গায় যান, সে আমি কি করে জানবো মা?"

মিসেস্ সেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, কাঁদিয়া বলিল, "তাহলে কি হবে রে খোকা? বুঁচু কি তা'হলে বাঁচবে না? ওঃ ভগবান! এত করেও কি শেষ রক্ষা করতে পারলুম না? খোকা! বাবা আমার! তুই

যেমন করে পারিস ডাক্তারবাবুকে খুঁজে নে' আয়। যা' বাবা যা'—তোর ভাইটিকে বাঁচা। ওরে আমার যে আর কেউ নেইরে!"

বড় খোকা কাঁদিয়া ফেলিয়া, "মা! মা! তুমি চুপ করো মা! আমি খুব চেষ্টা কর্ব্বো"—বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। মিসেস্ সেন দোরের কাছে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিয়া উঠিল, "ওরে শোন শোন! আঃ কি করলুম! পিছু ডাকলুম!" ফিরিয়া বিছানার পাশে হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িল। "আর পারছি নে'! আর পারছি নে'! খোকা! বাপধন আমার! ওরে, তোদের নিয়ে যে আমি দুঃখের সাগরে ভেলা ভাসিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম তোরা আমার বুক জুড়ে থাকলে অকূল সমুদ্দুরও আমি সাঁতরে পার হয়ে যেতে পার্ব্বো। না, পারলুম না, পারলুম না, পারলুম না গো আমি!" বিবশা হইয়া ছেলের বুকের পাশে মাথা লুটাইয়া দিল।

ঘরে ঢুকিলেন সেকেণ্ড টিচার নীলোকা রায়। চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বড় খোকা কান্‌তে কান্‌তে দৌড়ুচ্চে, ডাকলুম, তা' শুনতে পেলে না। ছোট খোকা একটু ভাল আছে শুনলুম যে, আবার কি হলো, হ্যাঁ মিসেস্ সেন?"

মিসেস্ সেন উঠিয়া বসিয়া ছেলের দিকেও চাহিয়াছিল, ব্যাকুল নেত্রে সাতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখুন! আবার হাঁপাচ্চে! নিশ্চয় কোলাপ্স করছে! নীলাদি! আপনি দয়া করে একটু বসবেন? আমি যেখান থেকে পাই ডাক্তারকে ধরে আনবো, ওকে এমন করে যেতে দেবো না।"

নীলাদি ইতঃস্তত করিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "বসতুম না হয়, ওঁর শরীরটা আজ ভাল নেই বলে—"

মিসেস্ সেন প্রস্থানোদ্যত হইয়া উত্তেজিত আবেগের সহিত কহিয়া উঠিল, "ভাল হয়ে যাবেন, ভাল থাকবেন, পরের ভাল করলে কক্ষণো কারু

মন্দ হয় না। একটু থাকুন, আমি আসছি”—বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। নীলোকা বিরক্তির সহিত স্বগতোক্তি করিল,“ভ্যালা বিপদ রে বাবা! ছোঁয়াচে রোগ বলে ওরা সব্বাই সরে রৈলো নাচ-গানের মহড়া নিয়ে, আমি যেন এতটা পারিনে, তাই বলে, তাতে আবার একটা বাচ্চা রয়েছে ঘরে।”

বড় খোকা বলিতে বলিতে আসিল, “কোথাও ডাক্তারবাবুর পাত্তা পেলুম না মা! সমস্ত জায়গাই খুঁজেছি। কই? মা কোথায় গেল?”

নীলোকা জবাব দিল, “মা ডাক্তার খুঁজতেই গ্যাছে। তুমি ওর কাছে বসো, কপালটা খুব গরম বুঝি? হাত বুলিয়ে দাও—রিলিফ পাবে।”

“মা মিথ্যে গেল, তাঁকে পাবে না,—একজন বল্লে বাইরে গেছেন।”

নীলোকা নীরসকণ্ঠে মন্তব্য করিল,—“তোমার মায়ের যেমন কাণ্ড! নিজেও হয়রান হয়ে মরবেন, আমাকেও ঝঞ্ঝাটে ফেল্লেন।”

৪

ওদিকে সুরঞ্জনের পূর্ব্বোল্লিখিত পশ্চিমের বারান্দায় অস্তগামী সূর্য্যের উত্তাপ বিহীন বর্ণচ্ছটার মধ্যে চায়ের মজলিস বসিয়াছিল। মজলিস বসিলেও মজলিসীরা সকলেই বিরক্ত বা বিমর্ষ মুখে নিঃশব্দে বসিয়া যেন কর্ত্তব্য হিসাবে কার্য্য সমাধা করিতেছিলেন। তবে তিন জনের মধ্যে মিঃ ঘোষালকে তবু কতকটা প্রাণবন্ত দেখাইতেছে। এক পীস কেক ছুরি দিয়া কাটিয়া মুখে ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, “আপনার এই স্পেশাল তৈরি কেকটা আমার ভারি ভাল লাগে।—ডেলিশাস্! এক টুক্‌রো নাও না সুরো! চমৎকার হয়েছে।”

বিদ্যুৎ সাভিমানে কহিয়া উঠিল, “আপনার যা’ ভাল লাগে, ওঁরও

যে তাই ভাল লাগবে, এমন কোন কথা আছে? স্বামীর দিকে ফিরিল, “চা'টা বুঝি তেতো হয়েছে? ভাল লাগছে না? বদলে দেবে?”

সুরঞ্জন যেন চমক ভাঙ্গা হইয়া উঠিলেন, “অ্যাঁ? আমায় বলছো? না না, ভালই তো লাগছে। এক চুমুক পান করিল।”

বিদ্যুৎ ঠোঁট চাপিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর করিল, “যে রকম মুখ করে খাচ্চো, তা' দেখে এমন কথা বিশ্বাস করা খুবই যে শক্ত।”

মিঃ ঘোষাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “আহা আপনি কেন অনর্থক দুঃখিত হচ্চেন, মিসেস্ চ্যাটার্জী! মানুষের চিত্ত যখন স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত থাকে, তখন প্রাচীন কবির ভাষায় ‘চিনি চিটে জ্ঞান থাকে না’, আর সেক্সপীয়রের ভাষায় বলতে গেলে—”

বিদ্যুৎ অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিল, “থামুন দেখি আপনি! টোষ্ট তো মুখেই দিলে না। মনের খবর অবশ্য জানিনে এবং জানবার অধিকারও হয়ত আমার নেই, হয়ত কোনদিনই তা' জন্মাবেও না—তবে শরীরের খবরটাও তো আমার পাওয়া উচিত! শরীর কি ভাল নেই?”

সুরঞ্জন গভীর অন্যমনস্কতার মধ্য হইতেই জবাব দিলেন, “কা'র? আমার? কেন ভালই তো আছে।” চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া চুমুক দিলেন।

মিঃ ঘোষাল অনতি উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন:—

“Fill the cup and fill the can.
Mingle—”

সুরঞ্জন হাত হইতে চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, “কে' যেন ছুটে আসছে না! কে' কথা কইছে! মিসেস্ সেন বলেই তো মনে হচ্ছে, আবার কি হ'ল!”

বিদ্যুৎ দ্বারের দিকে বিরক্ত ভাবে চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কিচ্ছুই হয়নি, তুমি খাও দেখি।"

মিসেস্ সেন দৌড়িয়া প্রবেশ করিয়া কান্না ভাঙ্গা আকুল স্বরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিযা উঠিল, "ওঃ স্যার! আমার খোকা বুঝি আর থাকলো না! আমি কি করি? ডাক্তারবাবুকে যে কোথাও পাওয়া গেল না।"

সুরঞ্জন তড়িৎবেগে উঠিয়া পড়িলেন, কহিলেন—"আমি যাচ্ছি চলুন, আমার চলে আসাটা উচিত হয়নি।"

বিদ্যুৎ মিনতি করিয়া বলিল, "চাটুকু অন্ততঃ খেয়ে যাও, মুখের গ্রাস ফেলে যেতে নেই।" চায়ের কাপটা তুলিয়া হাতে দিতে গেল।

সুরঞ্জন ততক্ষণে উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, বলিলেন, "এখন চা খাবার সময নেই। আহা! আমি যদি চলে না আসতুম, ডাক্তারকে যেতে না দিতুম! আসুন মিসেস্ সেন! সিবিল সার্জ্জনকে নিয়ে যাই।"

উহারা দুজনে চলিযা গেলে মিঃ ঘোষাল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাঃ চমৎকাব অভিনয় করে গেল তো দুটিতে! ঐ মহিলাটি কে বলুন তো? দেখা দেখা মনে হ'ল যেন।"

বিদ্যুৎ চাযের কাপটা ঠুকিয়া নামাইয়া দিয়া সরোষে কহিযা উঠিল, "থাক্! খুব হযেছে! ওকে আর মহিলা বলে নারীজাতির অবমাননা ঘটাবেন না, মিঃ ঘোষাল! ঐ শুঁট্‌কী মাগীটা কোন্ একটা বাজে ইস্কুলের একটা বাজে টিচার না, এমনি কি!"

"আশ্চর্য্য! এঁরই সম্বন্ধে অত বড় একটা ষ্ট্রং রিউমার,—থাক্, থাক্, ও কিছু নয়, স্রেফ বাজে কথা! এত বড় অপদার্থ তা' বলে সুরো নয়, বিশেষ করে আপনাকে লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করবার

পরও যে ঐ কু-শ্রী মাগীটার উপর পূর্ব্বরাগ সে ভুলতে পারেনি, এ সম্পূর্ণ ই অবিশ্বাস্থ !

"কি-ঈ ! ইনি তাহলে আমার বিয়ের পূর্ব্ব হতেই ওঁর—" ক্ষোভে ক্রোধে নীরব হইল।—

মিঃ ঘোষাল একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে অনুচ্চ কণ্ঠে রিসাইট করিলেন ;—

"A betterness of things so swcet ;—
O' broken singing of the ove !
O' loves wings are afer fleet.—
And like a Panther's feet,—
The feet of love."

দেখুন, মানুষের জীবনে ওরকম একটু আধটু স্খলন পতন হয়েই থাকে, ওগুলোকে অত-করে কাউণ্ট করে নিয়ে আমাদের দেনার বোঝাকে আপনারা হামেসা বাড়াতে গেলে আমরা নেহাৎ দেউলে হয়ে পড়বো।. ওর সেই বন্ধুই এর জন্যে অবশ্য দায়ী। সে মরবার সময় নিঃসহায়া পত্নীকে বিধবা বিবাহের অনুমতি সমেত ওর হাতেই দিয়ে গিছলো।—Point counter Point বইটা পড়ছিলেন, কেমন লাগলো ? ও সব যেতে দিন।"

বিদ্যুৎ ক্রোধোত্তেজিত উগ্র স্বরে, "না যাবে না ! সমস্ত কথা খুলে বলুন, চাপবার চেষ্টা করবেন না।" বলিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে উহার দিকে চাহিল।

বিব্রত ভাবে মিঃ ঘোষাল একবার চারিদিকে চাহিলেন, "দেখুনতো কি থেকে কোথায় এসে পড়লম ! সুরো আমার বন্ধু, তার Past সম্বন্ধে সকল কথা আপনি আমার কাছে শুনতে চাইবেন না, সেটা বলা এবং না বলা দুটোই আমার পক্ষে কঠিন নয় কি।"

বিদ্যুৎ তড়িতের মতই উঠিয়া দাঁড়াইল, আগুনে ভরা চোখে ও অশনি

ভরা কণ্ঠে কহিল, "যান্ আপনি যাঁর বন্ধু তাঁর কাছেই চলে যান, আমার সামনে আর কক্ষণো আসবেন না, তা' বলে দিচ্চি! আপনাদের জাত অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক, শয়তান!"

মিঃ ঘোষাল সিগারেট ফেলিয়া দুহাতে বিদ্যুতের দুহাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন! আমার অপরাধ হয়েছে। সব পুরুষই যে বিশ্বাসঘাতক নয়, এর পরিচয় আজ না হোক, একদিন নিশ্চয়ই পাবেন।"

বিদ্যুৎ এবার অভিভূতবৎ বসিয়া পড়িল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "তাহলে সব কথা বলুন! আমার সঙ্গে বিয়ে হ'বার আগে ইনিই ছিলেন, ওঁর,— ওঁর—" দুঃখে অভিমানে অপমানে তার কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

"দু'দুটো ছেলে শুদ্ধুতো আর বিয়ে করতে পারে না তা' নইলে ও যে অন্যায়ের পথে যেত না এটা হলপ করেই বলতে পারি। ছোট ছেলেটা অবশ্য ওর স্বামীর মৃত্যুর পরে জন্মায়।"

"আর সেইটেই মরছে! মরুক! মরুক!—ওঃ মিষ্টার ঘোষাল! আমায় দয়া করে একটুখানি সায়ানাইড অ্যাসিড এনে দিতে পারেন না? আপনার শিকার কর্ব্বার বন্দুকটা আনুন না একবারটি! এঁরটা যে ইনি বাড়ীতে রাখেন না আজকাল।" বলিতে বলিতে সে অবসন্নবৎ ঢলিয়া পড়িল।

মিঃ ঘোষাল ত্রাস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁর চক্ষে কুটিল হাস্য একবার চকিতে খেলিয়া গেল। বক্র দৃষ্টিতে শরাহত বক্ষ বিদ্ধ পাখীর মতই মুহ্যমানা—বিদ্যুতের দিকে শ্লেষের সহিত চাহিলেন, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে কহিলেন, "এ'কি! এত অধীর হচ্চেন কেন বলুন তো? এমন কি ব্যাপার এটা যার জন্যে আপনার এত বড় অমূল্য জীবনটাকেই নষ্ট করে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন! এস্থলে তা'কে খুব বেশী দোষ দেওয়াও তো

যায় না, সে ঐ কুণ্ঠাতেই তো প্রথমটায় আপনাকে বিয়ে করতেই চায় নি।"

বিদ্যুৎ দুহাতে বুক চাপিয়া ধরিল, "হ্যাঁ, আমি—আমি—আমিই আমার এই সর্ব্বনাশ ইচ্ছা করে ঘটিয়েছি! কিন্তু আপনি তো সবই জানতেন মিঃ ঘোষাল! এ সমস্ত জেনেও আপনি কেন এমন করে আমায় ডুবতে দিলেন? একটু দয়াও কি হলো না?"

মিঃ ঘোষাল সবেগে কি বলিতে গিয়া সবলেই তা' ভিতরে চাপিয়া লইলেন, সস্মিত স্বরে আস্তে আস্তে উত্তর করিলেন, "আমার বলাটা কি তখন সঙ্গত হতো? না আমি বল্লেই তা' আপনি বিশ্বাস করতেন? বরং বিপরীত অর্থ গ্রহণ করতেন না কি?"

বিদ্যুৎ অব্যক্ত আর্ত্তধ্বনি করিয়া দুহাতে বুক চাপিয়া ধরিল, "ঠিক! ঠিক! আমি, আমার দুরন্ত রূপ তৃষ্ণাই আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে! কিন্তু আপনি আমায় এমন করে,—বিদ্যুৎ সহসা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, উন্মাদের মত সবলে মিঃ ঘোষালের একটা হাত ধরিয়া জ্বালাময় উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ঠিক হয়েছে! পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে! রূপ তৃষ্ণায় অন্ধ হয়ে আপনাকে আমি অত্যন্ত অপমান করেছিলুম, তার ফল ফলবে না?"

মিঃ ঘোষাল গভীর আবেগের সহিত অন্য হাতে সেই ধৃত হস্ত চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "শান্ত হোন! অনর্থক দুঃখ পাবেন না। আমরা আপনাদের দয়ার অযোগ্য এইটেই নিজেদের হীনতা দিয়ে পদে পদে প্রতিপন্ন করে যাচ্চি!—আসুন ঘরে গিয়ে বসি।"

এই বলিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে আসিল ও একখানা কৌচে বসাইয়া দিল। ফ্যানটা জোরে চালাইয়া দিয়া কাছে আসিতে

না আসিতে দেখিল বিদ্যুৎ স্প্রাংয়ের মত ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। সে সামনের টেবিলে রাখা ফুলদানি হইতে ফুলের তোড়াটা তুলিয়া লইয়া উহার মধ্যস্থিত মস্ত বড় রক্ত গোলাপটা ছিঁড়িয়া দুহাতে মর্দ্দিত করিয়া সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিল, আর্ত্তনাদের মত করিয়া কহিয়া উঠিল, "না, না, সহ্য হচ্চে না! ঘরের হাওয়ায় বিষ ছড়িয়ে দিয়ে গ্যাছে, শ্বাসরোধ হয়ে আসছে, কোথায় যাই? কি করি?"

মিঃ ঘোষাল কাছে আসিয়া গভীর সহানুভূতির মধুমাখা স্বরে, কহিলেন, "কি কর্ব্বেন? চলুন না একটা লম্বা ট্রীপ দিয়ে আসা যাক, যা'তে করে মাথাটা কিছু ঠাণ্ডাও হতে পার্ব্বে, আর মনেও একটুখানি বল পাবেন।—আয়া!"

আয়া প্রবেশ করিয়া সেলাম দিল,—হুজুর!"

ঘোষাল বলিলেন, "মেমসাব্‌কো বাহার যানেকা কোট লে' আও, ঔর জুতা বদল দেও।"

আয়া পুনশ্চ সেলাম দিয়া চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। হাতব্যাগটাও যথাযথ হাতে তুলিয়া দিতে সে ভুল করিল না।

বিদ্যুৎ সহসা সংযত ভাবে প্রশ্ন করিল, "Where is my baby?"

আয়া জিজ্ঞাসা করিল, "May I bring her?"

মিঃ ঘোষাল একথায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ত্রস্তে বাধা দিযা বলিয়া উঠিলেন, "Oh, no, no! not now, মেমসাব, is not feeling well, she is going out."

আয়া প্রকাশ্যে সেলাম দিল, মনে মনে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল; "মন করে ঈ দুষমন শালেকো কান পকড় কর নিকাল দেই।"

মিঃ ঘোষাল বিদ্যুতের হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় টানিয়া লইয়া

চলিলেন, সান্ত্বনার প্রলেপ মাখা স্বরে কহিলেন—"আসুন, খুব খানিক-দূর, অনেক—অনেক—পথ এই স্তব্ধ নীরব নিশীথের ঠাণ্ডা বাতাস ও নক্ষত্রালোকে মোটরে ঝড়ের বেগে ঘুরে এলে নিশ্চয়ই অনেকখানি রিলিফ পাবেন।"

সন্ধ্যা সমাসন্ন, তাহারই ম্লান ছায়ায় চারিদিকও যেন ক্লান্ত বিষণ্ণতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। পথের ধারের বড় গাছগুলায় রাত্রিবাসের জন্য পাখীর দল নিজ নিজ কুলায় খোঁজা ও দখলদারী লইয়া মানুষের চাইতে কোন অংশেই সোরগোল কম বাধায় নাই। মানুষের এটা অবশ্য নৈমিত্তিক, ওদের কিন্তু একার্য্যটি নিত্যকার। যেহেতু এদের অধিকারের চৌহদ্দির তো সীমা থাকে না, যে যেদিন যেখানটা দখল করিয়া লইয়া সুখ-সুবিধা লাভ করিতে পাবে, তারই জন্য প্রাত্যহিক এই লড়াই চলে। এদের কলরবে কান পাতা ভার হয়, নিকটবর্ত্তীরা এ দৃশ্য,—অবশ্য ব্যাপারটি একটুক্ষণ মন দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারে। মেয়েদের স্কুল বাড়ীর ভিতরের দিক হইতেও কলরব হার্ম্মোনিযমে গানের গৎ মধ্যে মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছে, তাবই সাড়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে নূপুর মিশ্রিত চরণ পাতের নৃত্যছন্দও শ্রুত হইতেছিল, কোন একটা আসন্ন উৎসবের সূচনার সূচী তা' জানাই যায়।

এদিকে স্কুল বাড়ী হইতে বেশ খানিকটা দূরে, ওরই পাঁচিল ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যস্থিত এই স্কুলেরই সেই থার্ড টিচার মিসেস্ সেনের সেই কুটীরটির সেই একখানি মাত্র ঘরের মধ্যকার দৃশ্য সেই একই প্রকার অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে। রোগ পীড়িত ছেলেটি তেমনি বিছানায়

পড়িয়া আছে, মধ্যে মধ্যে শরীরে একটা আক্ষেপের মত খেঁচুনী হইতেছে, বড় খোকা আতঙ্কে শিহরিয়া কাতর নেত্রে মুহুর্মুহু দোরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, কখনও ভাইয়ের মাথায় বাতাস দিয়া, কখনও তার ঘর্ম্মাক্ত কপালে ক্ষীণ ও কম্পিত হাতখানি ঘষিয়া, কখনও ক্ষণ পরিবর্ত্তিত মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অস্ফুটস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিয়া অসহায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিল।

নীলোকা রায় যথা পূর্ব্ব দ্বারের বাহিরে একপা এবং ভিতরে একপা রাখিয়া দ্বারের কপাটে দেহভার রক্ষা পূর্ব্বক আলগোছে দাঁড়াইয়া বিরক্তিতে অস্থির হইতেছিল, অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাপ্‌রে বাপ ! মা মাগীর তো ফেরবার নামটি পর্য্যন্ত নেই, জ্বালাতনের একশেষ ! কি কুক্ষণেই যে ভদ্রতা করতে এসে শেয়ালের গর্ত্তে পা বাড়িয়েছিলুম, ওদিকে ওখানে ওরা সব মজা করে রিহার্সেল দেখছেন। না বাপু ! আর পারা যায় না, এইবার আমিও পালাচ্ছি। থাকলে আরও কি ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে হবে !" ফিরিতে উদ্যত হইয়া স্বগতঃ কহিল, "ঐ না কারা এলো ? মোটরের হর্ণটা যেন D. M. এর গাড়ির বলেই তো মনে হচ্চে! এতক্ষণই যখন রইলুম, তখন মিথ্যে মিথ্যে নাম খারাপ করি কেন ? আর একটু থেকেই যাই।"

বড় খোকা কাতর হইয়া ডাকিয়া উঠিল, "মাসিমা ! খোকা কি রকম করছে দেখুন না একবারটি।"

নীলোকা যথা পূর্ব্ব স্থির থাকিয়া উত্তর করিল, "ঐ তো ডাক্তাররা সব আসছেন। আমি ত আর ডাক্তার নই, কি দেখবো বল ?"

মিসেস্ সেন, মিঃ চ্যাটার্জ্জী ও সিবিল সার্জ্জন প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার রোগীকে যথাযথ পরীক্ষান্তে সুরঞ্জনের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিলেন, "It is too late !"

সুরঞ্জন ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, "But you must try."

সিবিল সার্জ্জন সিরিঞ্জ হাতে লইয়া বলিলেন, "Certainly, but I can't give you any hope,—Sorry"—

মিসেস্ সেন ছেলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "খোকা! খোকা! বাপ আমার! ওরে চলে যাস্‌নে, চলে যাসনে,—আমি আরও বেশী করে খাটবো, টিউসনী নেবো, তোকে ত কোন ভাল জিনিষ খেতে দিতে পারিনি, তাই এত দুর্ব্বল হয়ে গেছিস্, একটা রোগের ধাক্কাও সইতে পারলিনে। এবার তোকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াবো। ওরে যাদুমণি আমার! চেয়ে দেখ,—আমি যে তোর মা। একটু সাড়া পেলে কত খুসী হয়ে ছুটে আসিস্, কাজের তাড়ায় কাছে টেনে নিই নে', সরিযে দিই,—ও বাবা! আমি কাজ ছেড়ে দিয়ে দিনরাত,—দিনরাত তোকে বুকে করে বসে থাকবো।"

সিবিল সার্জ্জন নাড়ী ধরিয়া ছিলেন, ছাড়িয়া দিলেন, "All over!"

সুরঞ্জন ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না, না, এত শীগ্‌গির! তা'ও কি হয়? You must try with another injection, please."

সিবিল সার্জ্জন ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ মুখে আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেলেন। সুরঞ্জন আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান! হরিপ্রসাদ! তুমি যাবার সময় আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলে, আমি তো এদের তেমন করে দেখিনি!" তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। মিসেস্ সেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "চলে গেলি? সত্যি চলে গেলি? বাপধনরে আমার!" বলিতে বলিতে সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইল।

এই সময় ডাক্তারবাবু ত্রস্তে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, কহিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ! হঠাৎ এমনটা হ'ল কি করে?"

ডাক্তার ও সুরঞ্জন মিসেস্ সেনের কাছে সরিয়া আসিলেন।

নীলোকা রায় এই অবসরে ধীরে ধীরে নিক্রান্ত হইয়া গেল, মনে মনে বলিল, "ওকে তোয়াক্ক কর্ব্বার লোকাভাব তো একটুও দেখছি নে, আমি থেকে আর কি কর্ব্বো! এরকম প্যাথেটিক সীন বেয়ার কর্ব্বার মত আমার হার্ট মোটেই ষ্ট্রং নয়। আমারই মাথা ঘুরছে, বুক দুড় দুড় করছে।"

৬

ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীর একটি পাশের ঘর। ঘরটি তাঁদের একমাত্র ছোট্ট খুকীর যোগ্য আসবাবপত্র দিয়া যথাযথ ভাবে সজ্জিত। ছোট্ট একটি রেলিং ঘেরা খাট, ইজি চেয়ার ও পোষাকের ছোট্ট আলমারি, টেবিলে শিশুর প্রয়োজনীয় দ্রব্য, মেজেয় গালিচার উপর নানা দেশের নানা জাতীয় খেলনাপত্র বিছাইয়া ক্ষণপ্রভা ও তার আয়া খেলা করিতেছিল। ক্ষণপ্রভার মন কিন্তু খেলার দিকে নিবদ্ধ নয়, সে হঠাৎ কান্নার সুর ধরিল।—

"আইয়া আই গো তু মামা।"

আয়া ভঙ্গীভরে হাসিল,—"Oh, no no, naughty baby! No, she is with her lover, does not want you."

ক্ষণপ্রভা আর একটু জোরে সুর তুলিল, "আই গো তু মামা ইয়েৎ।" খেলনা ফেলিয়া উঠিতে গেল।

আয়া উহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া বিদ্রূপের সুরে গাহিল,

"You must not go to her, Oh deary!
She is like a fairy, will fly from you.

You naughty girl, I' ll slap you! মামা বাহার চলা গিয়া তোম কাঁহা যাওগে, এই বডমাস!"

ক্ষণপ্রভা কাঁদিয়া উঠিল, "আইয়া! ইউ নতী গেল! মামা! মামা!" বলিয়া কান্না ধরিল।

সুরঞ্জন প্রবেশ করিতেই ছুটিয়া আসিয়া সে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, "পাপা! দিয়ালী!"

সুরঞ্জন মেয়েকে কোলে লইয়া আয়ার দিকে ফিরিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "নার্স! তোমায় আমি বলে দিয়েছি—ওকে বাবা বলতে শেখাবে।"

আয়া সেলাম করিয়া সবিনয়ে উত্তর করিল, "লেকিন মেমসাব হুকুম দিয়া—

সুরঞ্জন তিক্তকণ্ঠে বাধা দিলেন, "ব্যস্! ক্ষনু! তুমি আমায় বাবা বলবে, কেমন?" রুমাল দিয়া তার অশ্রু-ভেজা মুখখানা মুছিয়া দিলেন।

বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষণপ্রভা প্রশ্ন করিল, "পাপা! মামী কঁ্যহা?"

সুরঞ্জন উহাকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমায় বাবা বল্লে না ত? বাবা শুনতে আমি খুব ভালবাসি।"

ক্ষণপ্রভা বাপের বুকে লগ্ন থাকিয়া দুষ্টামীরঃহাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "ঈ নতি পাপা! নতি পাপা!"

সুরঞ্জন মৃদু হাসিয়া আত্মগতই কহিলেন, "ফরেণ-বিধ জন্ম থেকে ইনজেক্ট করা হচ্ছে, তার ফল ফলবে না! দেশে থাকতে দেশকে তেমন করে তো চিনিনি, চিনতে পারলুম বিদেশে গিয়ে তাদের দেশ-প্রাণতা দেখে। তারা বিদেশের ঠাকুরকেও সইতে পারে না, দেশের কুকুরগুলোও তাদের কাছে তার চাইতে ঢের বড়। আর আমাদের ঠিক এর উল্টো! এমন মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষা যার তুলনা পৃথিবীর

কোথাও নেই, তার মধ্যে থেকেও আমাদের পারিবারিক কথাবার্ত্তা কওয়া চলে না, কচি প্রাণে গরল ঢেলে দিয়ে তাদের ······”

ক্ষণপ্রভা বাপের মুখ ধরিয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিয়া উঠিল,—“পাপা! এ কেয়া হোতা হ্যায়?”

সুরঞ্জন কহিলেন, “তুমি আমায় বাবা বলোনি, ‘নটী’ বলেছ, তাই আমি রাগ করেছি।”

সসব্যস্তে পিতার মুখ চুম্বন করিতে করিতে মেয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “পাপা নতি নত্ বেবী নতি।”

সুরঞ্জন কন্যাকে প্রতি চুম্বন করিলেন, সস্নেহে কহিলেন, “না, না, ক্ষনু আমার লক্ষ্মী মেয়ে।”

ক্ষণপ্রভা সবিস্ময়ে বাপের মুখের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া মাথা ঝাঁকাইল, “বেবী নত্তি’না গুড্।”

সুরঞ্জন মনে কহিলেন, “হায়রে! লক্ষ্মী শব্দটাই ওর অপরিচিত! হাফ্ খৃষ্টান, অর্দ্ধ বর্ব্বর, না বাঙ্গালী, না হিন্দুস্থানী, আধা ইউরেসিয়ান বেশ সব ছেলেমেয়ে আমরা তৈরি করছি। এরাই হবে আমাদের নেতাদের সর্ব্বস্ব পণে আকাঙ্ক্ষিত সারা ভারতের ভবিষ্য নাগরিক? কি আদর্শ নিয়ে দেশে ফিরেছিলাম, আর কি করছি? মন আমার দুর্ব্বল? এছাড়া আজ আমার কর্ব্বার কিইবা আছে? এ সংসার তো আমার নয়! প্রতিকারের চেষ্টা অসম্ভব! বাইরের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে ঘরের মধ্যে লড়াই,—যাক্ ও নিয়ে ভেবে কোন উপায় নেই!” প্রকাশ্যে কহিলেন, “ক্ষনু আমার সোনা! যাওতো মা-মণি! তোমার নার্সের কাছে!”

আয়া মধুরকণ্ঠে ডাকিল, “Come darling!” বলিয়া হাত বাড়াইল।

পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া ক্ষণপ্রভা কান্না জুড়িল,…"নো, নো, বেবী দোন্‌ত গো তু নতী আইয়া !"

আয়া চেষ্টা ছাড়ে নাই, আদরে গলাইয়া ডাকিল—"Come sweet ! মেরা হনি ! মেরা দুলারুয়া খোঁকি ! I will give you some sweets and many very nice things to eat and play."

"বেবী দোন্‌ত ! আইয়া বদ্‌মাত !"

সুরঞ্জন কহিলেন,—"থাক, থাক, ওকে ছেড়ে দাও। এস ক্ষনু ! আমার ঘরে যাই।"

আয়া কুণ্ঠিত হইয়া জানাইল, "Madam will be very angry with me sir ! If she—"

বয় দ্বারের ওপার হইতে নিবেদন জানাইল, "হুজুর !"

সুরঞ্জন উত্ত্যক্ত ভাবে ফিরিলেন,—"কি আবার ! কেউ এসেছেন ?"

"ঘোষাল সাব্‌কো ডারেবার খবর লে আয়া, কে' মেমসাব ঔর ঘোষাল সাব সারি আট বাজে কি টেরেণ মে কোই জুরুরী কাম কি ওয়াস্তে বাহার চলা গিয়া। কারমে মেমসাব্‌কো হ্যান্‌বেগ পড়িথি, উ আপস্‌ লে আয়া।"

সুরঞ্জন এক মুহূর্ত্ত পরেই সুস্থির স্বরে কহিলেন, "রেখে দাও গে।" আয়ার প্রতি ফিরিয়া তেমনি শান্ত অনুদ্বিগ্ন কণ্ঠেই অনুজ্ঞা করিলেন, "একে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আধঘণ্টা পরে তুমি গিয়ে নিয়ে এসো।" সহজ স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপেই মেয়ে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তখন আয়া গালে হাত দিয়া সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল,—Oh my God ! হঁ হোবে করেগা উ ত ম্যয় জান্‌তা হুঁ, but so soon ! O, my poor master ! So very kind and so very good hearted gentleman ! God ! bless him !"

মেয়েস্কুলের মাঝখানকার হল ঘরে নারী সমিতির সদস্যরা প্রায় সকলেই একত্রিত হইয়াছেন। হেডমিষ্ট্রেস্, সহকারী হেডমিষ্ট্রেস্ এবং টিচারদেরও অনেকেই উপস্থিত। ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে অবশ্য অন্যত্র, এখানের কলেজ বাড়ীতে, এখানে বিরাট জনসমাগম কল্পনায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ পত্নী প্রিন্সিপালকে বলিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে ড্রেস-রিহার্সালের জন্য আজ রাজোদ্যানে-বসন্তোৎসবের যে সীনটি বহু যত্নে তিনি আঁকাইয়াছেন, সেটি এখানেই টাঙ্গানো হইয়াছে। ইলেকট্রিকের আলোর অপ্রচুরতার জন্য কয়েকটি বড় বড় 'ডেলাইট্' উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অভিনয়কারিণী ছাত্রীর দল অধিকাংশই অফিসারদের অবিবাহিতা মেয়েরা বসন্তোৎসবের পুষ্প সজ্জায় সুভূষিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যা হয়, হয়, অভিনয়ে অনাবশ্যক ছাত্রীর দল বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে, শেষ ট্রীপ দিয়া ড্রাইভার স্কুল-যানখানা পাশ করিয়া দাঁড় করাইতে গেলে গর্জ্জন স্বরে তর্জ্জন করিয়াই সে বোবা বনিয়া থামিয়া গেল। ঘরের মধ্যে সকলেই বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া উঠিতে ছিল। মস্ত বড় বই, প্রায় অর্দ্ধেকটাই বাকি, কত রাত হইবে! ঘরকরণা তো সকলেরই আছে, আর পরের মেয়েরা? তাছাড়া তাদের সারাদিনের ক্লান্তির পর দিনের পর দিন ধরিয়া এই নাচা-কোঁদার কসরৎ, বিবেচনা বলিয়া কি কিছু নাই? ডেপুটি গিন্নি সুরমা পথ খুলিয়া দিলেন, বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকা ক্লান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি মুস্কিল! মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর যে দেখাই নেই! কি ব্যাপার? তাঁর তো কখনও এমন হয় না। পাঁচ মিনিট কারু দেরী হয়েছে ত—"

ডেপুটি পুলিশ সুপারের স্ত্রী যামিনী কহিলেন, "তিনি এই এলেন

বলে! আমাদের কর্ত্তারাই হয়ত কেউ গিয়ে তাঁকে দিয়ে আতিথ্য করিয়ে নিচ্চেন! যাহোক, তোমরা আরম্ভ করিয়ে দাওনা, নাহলে আটটার মধ্যে শেষ হবে কি করে?"

হেড মিষ্ট্রেসের কণ্ঠে সংশয়িত স্বর প্রকাশ পাইল, "উনি এসে যদি রাগ করেন!" মৃদুতর স্বরে আত্মগতই কহিল, "একটু টাচী" আছেন ত!"

যামিনী কহিলেন, "সে দায় আমার রৈলো, আপনারা আরম্ভ তো করে দিন।"

গীতি-নাট্যের চতুর্থ অঙ্ক হইতে অভিনয় আরম্ভ হইল। রাজা-রাণীকে বেষ্টন করিয়া সেই অষ্ট-সখীর বহু মাঙ্গল্য দ্রব্য, পুষ্প মাল্য ও আবীর-কুঙ্কুম হস্তে নৃত্য ও গীত—

গীত

"হে বিজয়িনি! বিজয় গৌরবে এসো সাজি!
চ্যুত মুকুলে, মালতি, করবী, চামেলী ফুলে,
ভরে নাও, ভরে নাও, ভরে নাও, তোমার ও কনক সাজি।
মুঠি, মুঠি, মুঠি, মুঠি—লাল আবীরে
লালে লাল, লালে লাল, লালে লাল করে দাও ধরণীরে,
রঙ্গীন হয়ে যাক্ কানকীকা, কানন-কুসুম রাজি।"

রাণী-সাজা মেয়েটি আরম্ভ করিল,—

"হে রাজেন্দ্র! বল শুনি, কি হেতু নীরব?
গীতধ্বনি, নৃত্যরস, মৃদঙ্গের রব, কিছু কি লাগেনি ভাল?
জাগি অর্দ্ধ যামী, তোমারে করিতে তৃপ্ত, শিখায়েছি আমি;—
সব বৃথা?"

নকল রাজা কহিলেন, "হে অভিমানিনি! কিছু ব্যর্থ নয়, শিক্ষা তব অতুলনা, ইথে কিছু নাহিক সংশয়।

মৃদঙ্গ, মুরজ, বীণা, সুধা-স্রাবী ইহাদের তান,
নৃত্যরসে কণ্ঠ-গীতে সুনিপুণা সখীবৃন্দ,—
মেঘালোকে ময়ূরী সমান।
কিন্তু দেবি!"—

রাণী, "থাক ও শঙ্কিত-কুণ্ঠা আজি সখা! ডাকিও না তারে,—
আজি শুধু হাস্যে-লাস্যে ভেসে যাও সঙ্গীত-ঝঙ্কারে।
ভুলে যাও সংশয়ের ক্ষুদ্র হীন তুচ্ছ দ্বেষাদ্বেষী—
বিবাদের কল-কলি, জিঘাংসার তীব্র রেষারেষী,
প্রেমের বিজয়-মাল্য পরো সখা! আজ গলে পরো,
যুদ্ধের বিজয়মাল্য—কালিকার লাগি তুলে ধরো;—
—সে মালাও গাঁথিব এ করে!"

রাজাকে রাণী মাল্য পরাইল, সখীরাও প্রত্যেকে মাল্যদান করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। রাজা তখন সখীদের প্রতি আদেশ দিলেন;—

"ঢালো গীত ধারা,—
নিশ্চিন্ত বিলাস-রসে কেটে যাক্ নিশা। ভাঙ্গি বক্ষকারা,—
যদি ছুটে বাহিরায় নৃপতির কর্ত্তব্যের অমোঘ শাসন,—
পশিতে দিব না কর্ণে; রহিব বধির হয়ে।"—

রাণী, (সহর্ষে) বিছাও আসন!
"গ্রীষ্মতাপ দূর করো চন্দনার্দ্র চামর-বীজনে,
অন্তর ভরিয়া দাও সঙ্গীতের সুর-ঝরা কল-স্রাবী তটিনী-স্বননে।

তোরা স্বপ্ননগরীর স্বপ্ন সহচরী, স্বপ্নভরা কল্পনার দেশে,
সখারে লইয়া যাও আজিকার মত, ছেয়ে রাখো পুলকে আবেশে।"

দ্বারের বাহির হইতে একজন উর্দ্দিপরা চাপরাসী হেডমিষ্ট্রেস্‌কে খবর পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিয়া পত্র দিলে সসব্যস্ত হেডমিষ্ট্রেস্ গভীর বিস্ময় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "এ'কি !—এ'কি কাণ্ড !!—অ্যাঁ !!!"

অনেকেই একসঙ্গে কেহ বসিয়া থাকিয়া কেহ হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া আসিয়া সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন তুলিলেন, "কি ? কি ? কী হয়েছে ?"

হেডমিষ্ট্রেস্ নির্ব্বাক ও বিস্ময়াভিহত থাকিয়াই যামিনীদেবীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন।

যামিনী মনে মনে পত্র পাঠ করিয়া কিছু বিমূঢ় ভাবেই সে পত্রের মর্ম্মোদঘাটন করিলেন, "ডি. এম. লিখছেন, তাঁর স্ত্রীর হঠাৎ শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বাইরে পাঠাতে হয়েছে। অভিনয়ের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আমরা যেন সুষ্ঠুভাবে এটিকে সম্পন্ন করে তুলি। তাঁর দ্বারা যতদূর সাহায্য হতে পারে তা' তিনি অকুণ্ঠিত-ভাবেই করতে প্রস্তুত আছেন।"

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন-পত্নী অনুসূয়া সবিস্ময়ে কহিল,—"কি আশ্চর্য্য ! আজ ষ্টেজ রিহার্সেল, কাল অভিনয় আর তিনি আজই সরে পড়লেন !"

হেডমিষ্ট্রেস্ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "এখন আমি করি কি ? অত বড় অভিনয় প্রায় ন'দশটা গান, সমস্তই তো তিনি নিজেই চালিয়েছেন, কেউ এপর্য্যন্ত সত্যিকার দায়িত্ব নিতে পায় নি,—এখন উপায় !"

যামিনী ও সুরমা দুজনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "কি আর করা যাবে ! খামখেয়ালী-পানাই তো ডি. এম. গিন্নিদের ক্যারেক্‌টারেক্‌টিকস্‌!

হয় সমস্ত নিজে কর্ব্বো, না হয় বেগতিক বুঝলে ছুটে পালাবো, এই যদি ক্ষমতা তো অতবড় গীতি-নাট্য লেখাই বা কেন কচুপোড়ার? যাক্ ও যা' হয় করে নেওয়া যাবে'খন। গানটানগুলো তো একরকম হয়েই গ্যাছে। নাও,—নাও আরম্ভ করে দাও—।"

মুন্সেফ পত্নী অনীতা সেন একটু বাঁকা হাসি হাসিলেন;—কিন্তু এমন কি হ'ল, যে একেবারে দেশ ছেড়ে ছুটতে হয়?

গবর্ণমেণ্ট প্লীডারের স্ত্রী মন্তব্য করিলেন, "কালও তো এসেছিলেন, বহাল তবিয়তে, খোস মেজাজে!"

অপর এক মহিলা মন্তব্য করিলেন, "খোস মেজাজ আবার ওঁর কোথায় দেখতে পেলে দিদি? আমি ত মেজাজের মধ্যে খুসীর আমেজও কখন ওঁর দেখিনি। সর্ব্বদাই যেন ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চাসনে পাল্লা ধরে বসে আছেন!"

ডাক্তারের স্ত্রী শান্তিময়ী এতক্ষণে মুখ খুলিলেন, মন্তব্য করিলেন, "তা' যা বলেছ ভাই! না হয় বি-এ. পাশই করেছেন, আই সি এসের স্ত্রীই হয়েছেন, তা' বলে মানুষকে মশা মাছির চোকে দেখবেন এই বা কি রকম সভ্যতা!"

এই কঠোর সমালোচনায় একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল, অপর এক মহিলা ত্রস্তে কহিলেন, "চুপ্! এঁরা সব রয়েছেন!"

শান্তিময়ী ভ্রূভঙ্গী করিয়া জবাব দিলেন, "এঁরা বি-এ. পাশও ন'ন, এঁদের কর্ত্তারা বিলাত তীর্থেও যান্‌নি, ওঁরা তো আর হাজী ন'ন।"

"সে আবার কি?"

একজন মুসলমান মহিলা হাসিয়া শান্তির জবানীতে কহিলেন, "বুঝলেন না কথাটা? মক্কায় গিয়ে হজ করে ফিরলে যেমন হাজী হয়, বিলাত ফের্ত্তা-রাও তেমনি বিলিতি হাজী ওখানে যেয়ে হ'ন, এই কথাই বলতে চাইছেন

হয়ত ? তা' বড় মিথ্যেও বলেন নি !" সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, অনীতা আরও একটু কামড় দিল, "অথচ যাঁর তা' হ'বার কথা তাঁ'র মত অমায়িক ভদ্রলোক নাকি সংসারে দুর্লভ !"

অন্যদিকে সুরঞ্জনের পত্রোত্তর দেওয়া হইয়া গিয়া যামিনী ও সুরমা মিত্র পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

রাজার পাঠ-লওয়া মেয়েটি তিক্ত ও নীরস কণ্ঠে আরম্ভ করিল,—

"শুনলো সুন্দরিবৃন্দ ! কলকণ্ঠ কোকিলের সঙ্গীত লহর,

তোমাদের কণ্ঠমাঝে,

শুনিয়া ও গীতরব আপনা লুকাতে চাহে লাজে।

আহা মরিমরি !

স্বর্গের অপ্সরীবৃন্দ, অথবা কিন্নরী—; আবির্ভূ'তা ধরাতলে !—

ধন্য আমি প্রিয়ে—! তোমার —"

মেয়েটি হঠাৎ আবৃত্তি বন্ধ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাবারে ! গলা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ! গাড়ির তাড়ায় বাড়ী থেকে কিচ্ছুই খেয়ে আসতে পারিনি, আর কি পারা যায় ? বড়দি' মণি ! এক ভাঁড় চা অন্ততঃ না দিলে আমার গলা থেকে আর ওই নাচুনী ছন্দে বাঁধুনী-টাঁধুনী কিচ্ছুই থাকবে না, তা' বলে দিচ্চি কিন্তু।"

"মেন্তি ! তুই খেয়ে আসিস্‌নি ? আহা রে !—বলিস্‌নি কেন এতক্ষণ ?"

"মেন্তি ঠোঁটে জিহ্বা বুলাইয়া লইয়া উত্তর দিল, "আপনাদের মিসেস্ চ্যাটার্জীর ভয়ে। এতটুকু ত্রুটি হলেই তো মুণ্ডপাত করে দেবেন ! যাক্ উনি ত আর আসছেন না, তা'হলে মিথ্যে-মিথ্যি শুকিয়ে মরি কেন ? এতো আর সেবারের মতন পার্ব্বতীর তপস্যা হচ্ছে না, যে রুক্ষু চুল করে শুকনো মুখে পঞ্চতপা হচ্চি দেখাতে হবে।"

হেডমিষ্ট্রেস্ উঠিয়া পড়িয়া সস্নেহে ডাকিলেন, "আয়, মা! আয়।"

শুনিয়া সমস্ত মেয়েরাই একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিল, "আমাদেরও খাদ্য-পানীয় চাই, আমরাও কিচ্ছু কম চেঁচাই নি, শুধু আপনার মেন্তি-পেন্তির হলেই হ'বে না।"

যামিনী প্রমাদ গণিলেন। এই সব মোন মুখে যে এত শীঘ্র এমন চড়বড়ে ভাষায় খৈ ফুটিবে তা' তিনি ভাবেন নাই! হতাশভাবে কহিয়া উঠিলেন, "এই মাটি করেছে! তবেই আমরা তোমাদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছি।"

মেয়েরা তাঁর কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত না করিয়াই হেডমিষ্ট্রেসের সহযাত্রিনী হইল, যামিনী অন্য মহিলাদের দিকে ফিরিয়া হতাশাঙ্কিত ললাটে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "দেখছেন ত ব্যাপার! এই জন্যেই বলে 'শত্তুর তিনকুল মুক্ত'!"

নিজের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রিয়ব্রত ঘোষালের বুইকখানায় চাপার পর কি যে ঘটিয়াছিল বিদ্যুতের তা' মনে পড়ে না, শুধু এইটুকু মনে আছে তার সর্ব্ব শরীরের ভিতর দিয়া মাথা হইতে পদ নখ পর্য্যন্ত এবং পায়ের পাতার নীচে দিয়াও একটা উদ্দাম জ্বালা-ভরা বিদ্যুৎ-প্রবাহ তীব্র আক্রোশে সৃষ্টি ধ্বংসকারী সামর্থ্য লইয়া ছুটিয়া ফিরিতেছিল। এই গাড়িখানা তাকে কোথা দিয়া কোথায় এবং কতক্ষণ ধরিয়াই যে তার তড়িৎ গতি দ্বারা ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে, সে তা' জানিতেও পারে নাই। ষ্টেশনে আসিয়া যখন মোটর হইতে নামিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিল, তখনও তার মনে কোন অনুভূতিই ছিল না। প্রিয়ব্রত যখন তার মুখে একটা পানীয়ের গ্লাস ধরিয়া বলিলেন, "খেয়ে ফেলুন" এবং সে দুইহাতে কাঁচের গ্লাসটা চাপিয়া ধরিয়া উগ্র আকুল তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে সেটা পান করিয়া ফেলিল তখনও সে বুঝিতে পারিল না সে যেটা পান

করিল সে পানীয়টা কি পদার্থ ? সেটা লেমোনেড ? লেমন-সোডা ? অথবা উহাদেরই কাহারও সহিত মিশ্রিত অন্য কোন পদার্থ,—কোন বিশেষ ভেষজ-যুক্ত কোন কিছু ? তারপরই ধীরে ধীরে তার সর্ব্ব শরীরের সমস্ত শিরা ধমনীর প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় রক্ত-বিন্দুটি পর্য্যন্ত শান্ত-শীতল হইতে হইতে অবশেষে অবসাদের চরমে পৌছিয়া শিথিল শরীরে ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের গদি মোড়া শয্যাহীন বেঞ্চিটার উপর ঢলিয়া পড়িয়া গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া গেল। উপাধান বিহীন তার মাথাটাকে মিঃ ঘোষাল যে নিজের কোলের উপর সযত্নে তুলিয়া লইলেন ইহাও সে জানিতে পারিল না, জানিবার মত সংজ্ঞা তার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না। মধ্যরাত্রে কোন একটা বড় ষ্টেশনে ট্রেন থামিলে তাহাকে নাড়া দিয়া মুখ হাঁ করিয়া আরও কোন পানীয় কি পান করানো হইয়াছিল ? ঈশ্বর জানেন ! তার কোন কথাই মনে নাই।

বেশ খানিকটা সংজ্ঞা ফিরিল শিলিগুড়িতে ট্রেন হইতে নামার সময়। শরীরের রক্তে তখন আর তড়িৎ প্রবাহের সেই বিষাক্ত অগ্নিনাগেরা উন্মাদ নৃত্যে ছুটিয়া বেড়াইতে ছিল না, হিমালয় চূড়ার বিচ্যুত-বরফ কণিকারাও গলিয়া গিয়াছে, আছে শুধু সমস্ত শরীর মন ভরিয়া গভীর অবসন্নতা ও নিদ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের ক্লান্ত ঝিমানি। বারেক চোক মেলিয়া বলিয়াছিল, "এ কোথায় এলুম ?"

মিঃ ঘোষাল উত্তর দিয়াছিলেন, "চিনতে পারছেন না ? আপনার অতি প্রিয় হিমাচলকে ? আমরা দার্জ্জিলিং যাচ্চি যে।"

বিদ্যুৎ কহিয়াছিল, "দার্জ্জিলিং ? না, না, যাবো না।"

হাত ধরিয়া মোটরে তুলিয়া বসাইয়া দিয়া ইঙ্গিতে ড্রাইভারকে মোটরে ষ্টার্ট দিতে বলিয়া প্রিয়ব্রত উত্তর করিলেন, "শরীরটা যে ক'দিনে ভেঙ্গে চূর্ণ করেছেন ! ওখানে পৌছিয়ে সুরোকে একটা টেলি

দেবো, নিশ্চয়ই সে পরশু নাগাত এসে পড়বে। ওকে ধরে করে হপ্তা কয়েকের ছুটি নেওয়াবো, ব্যস্! সব ঠিক হয়ে যাবে!" "আচ্ছা।"—বলিয়াই নিদ্রাচ্ছন্নতায় মোটরের কুসনে মাথা দিয়া বিদ্যুৎ আবার গভীর নিদ্রামগ্ন হইয়া গেল।

পার্ব্বত্য পথের শোভা সম্ভার ইতিপূর্ব্বে আসা-যাওয়ার এই পথে দুটি চোক ভরিয়া তার কাব্য-রস-সিক্ত ভাব-প্রবণ-চিত্তে সে গভীর ও একাগ্র বিস্ময়ে সানন্দে ভরিয়া লইত, আজ সে সমস্তই তার কাছে অজানিত অনাদৃত অবজ্ঞাত হইয়া ঢাকা দেওয়াই রহিল। চারিদিকে ক্রমোচ্চ বিরাট বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী, ঝরণার ঝরঝর শব্দের সঙ্গে প্রাতঃ সূর্য্যের স্বর্ণ রশ্মি প্রতিফলিত অনৈসর্গিক ছুটন্ত জলধারা, আলোকরা অজস্র বরাসফুলের কোথাও রক্তাভ কোথাও স্থলপদ্ম সন্নিভ গোলাপী রং এর গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পাভরণে বিভূষিতা পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব বাসকসজ্জা এবং পাহাড়ের গায়ে মাথায় হাতে পায়ে অজস্র পুষ্পসজ্জার অফুরন্ত রূপ যা' দেখিয়া তার তৃপ্তি ও অতৃপ্তির এক সঙ্গে সীমা নির্দ্দেশ করা যাইত না, সে সবই আজ তার নিদ্রালু বন্ধ-চোখের মুদিত দৃষ্টি হইতে সরিয়া থাকিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। দার্জ্জিলিং, কারসিয়াং ও মংপুর এই যাত্রা পথটাকেই সে বড় বেশী ভালবাসিত। দু-চোক ভরিয়া দেখিত, দুহাত ভরিয়া তুলিয়া লইত। যখন উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিত, ফুলরাণীর মতই ফুলসম্ভারের অন্তর্ব্বর্ত্তিনীকে দেখিতে প্রশংসমান বিস্ফারিত নেত্রে বহু পথচারী ও চারিণী তার চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। আজ অর্দ্ধ-মৃতার মতই তার সেই দেহটাকে কি নিরাড়ম্বরেই কে' যেন শ্মশান যাত্রা করাইয়াছে!

এ অবস্থায় বেশী উপরে না উঠিয়া বাঙ্গালী পরিচালিত হোটেলটাতেই প্রিয়ব্রত বিদ্যুৎকে লইয়া আসিল। সে জানিত এ অঞ্চলটায় সে ইতিপূর্ব্বে

বড় একটা আসে নাই, দার্জ্জিলিং আসিলে সাহেবী হোটেলেই উঠিয়াছে,—এখানে অপরিচিতাই হইবে। ম্যানেজারটি অতি ভদ্র লোক ও প্রবীণ, সবিনয়ে কহিলেন, "সীজন্ অবশ্য নয়, তবু এ বছর লোক বেশীই হয়েছে। ফার্ষ্ট ক্লাশ কেবিন মাত্র একটাই আন্‌বুকড্ রয়েছে, অবশ্য অন্য ব্লকে আর একটাও দিতে পারি, কিন্তু পাশাপাশি তো হবে না, চলবে ? আর—"

মিঃ ঘোষাল ব্যগ্র হইয়াই কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলবে। অনেক ধন্যবাদ! দুটো ঘর দুটো ব্লকে চলে কখন ? একটাতেই আম্মদের আপাতক চালিয়ে নিতেই হবে। যা' নেই তা' দেবেন কোত্থেকে ?"

মিঃ ঘোষালকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া বিদ্যুৎ,—ঝিম্‌ধরা, টলিয়া পড়া বিদ্যুৎ অকস্মাৎ বিদ্যুতের ছটার মত ছিটকাইয়া পড়িল, চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি বলছেন আপনি মিঃ ঘোষাল! একটা ঘরে চলবে! আপনি তা' হলে যাবেন কোথায় ? অন্য হোটেলে নাকি ? সে অবশ্য মন্দ হবে না, ভালই হবে।" বলিতে বলিতে শেষের দিকের সম্ভাবনায় তার উত্তেজিত কণ্ঠ স্বর কিছুটা মোলায়েম হইয়া আসিল।

মিঃ ঘোষাল কাছে সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া প্রায় কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "কি করছো ? একটা কেলেঙ্কারী করে বসো না। তুমি কি বুঝতে পারছো না, এরপর পরিচয়ের আর কোন পথ নেই, তোমার পক্ষে ? যে পথে ইচ্ছে-সাধে এসে পড়েছ, তাকেই এখন সহজ ও সরল করে নিয়ে নাও। লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুল্লে সেটা কি খুবই সুবিধের হবে মনে ভাবছো ? ছি ছি পড়ে যাবে না এক্ষুণি !"

ম্যানেজারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখুন ঐ একটা রুমই

আপনি ঠিক করে দিন, দিন দুইয়ের মতন। তার পর ভেবে রেখেছি একটা ভাল দেখে বাড়ীই নিয়ে নেব।"

ম্যানেজার খাতাপত্র বাহির করিতে করিতে কহিলেন, "ঘরটা অবশ্য। আপনাদের পছন্দ হবে। দুটো বেডেরই ঘর। দোর খুল্লেই সাম্‌নে কাঞ্চনজঙ্ঘা, হ্যাঁ, রসিদটা সই করে দিন, খাতায় কি লিখবো? মিষ্টার এণ্ড মিসেস্ ঘোষাল? পুরো নামটা কি—"

বিদ্যুৎ ক্ষিপ্ত স্বরে উচ্চ চিৎকারে কহিয়া উঠিল, "না, না, না, আপনি কি বলছেন? আমি মিসেস্ ঘোষাল নই,—আমি মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী।"

মিঃ ঘোষাল ম্যানেজারকে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কাইণ্ডলী কোন রকম আপত্তি-টাপত্তি কর্ব্বেন না, যা' বলেন অপ্রতিবাদে শুনে যাবেন। কথার উপর কথা বল্লেই মহা বিপদ।" বিদ্যুতের কাঁধ ধরিয়া বাহিরের দিকে আকর্ষণ করিতে করিতে মৃদু হাসিয়া সস্নেহে কহিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়ই তুমি মিসেস সরকার বা সামথিং অন্য কিছু। আহা! যেতে দাও, উনি তো তা' জানতেন না, তাই এই ভুল করে ফেলেছেন, তার জন্যে অত রাগ করে কি? এবার থেকে যা' বলে উল্লেখ করলে তুমি খুসী হবে, উনি তাই কর্ব্বেন। এখন এসো, বড্ড ক্লান্ত হয়েছ, একেবারেই নিরাহারে রয়েছ, হাত মুখ ধুয়ে চা'টা খেয়ে একটু রিফ্রেস্‌ড্ হও, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।" বিদ্যুৎতের হাত ধরিতেই সে একটা ঝট্‌কায় ধৃত হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া অগ্নিবর্ষী তীব্র দৃষ্টি হানিয়া সবেগে বাহির হইয়া গেলে মিঃ ঘোষাল পুনশ্চ চাপা গলায় স্বর খাটো করিয়া অথচ বিদ্যুৎ শুনিতে পায় এমন করিয়াই ম্যানেজারকে বলিলেন।

"দেখছেন না? মাথার কি কিচ্ছু ঠিক আছে? হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে ট্রেনে চেপে বসে আছেন। খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখি না এই কাণ্ড! কিছুতেই ট্রেন থেকে নামানো গেল না, অগত্যাই নিজেও চেপে

বসলুম। পথে একটা টেলি' পাঠাই, বাড়ীতে বুড়োমা, কচি বাচ্ছা-টাচ্ছা সব রয়েছে ত, ভেবে খুন হবে তো আবার। আচ্ছা, ঘরটা দেখিয়ে দিতে বলুন, আর কাইণ্ডলী গরম জল-টল আর চা-টাগুলো,— অ্যাজ স্যুন্ অ্যাজ পসিবল্, পাঠাবার ব্যবস্থাটা করে দিন।"

বিদ্যুৎ বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, তার পা টলিতেছিল, চোখে তখনও ঘুমের জড়তা বা আর কিছুর মত্ততাও হইতে পারে,—একটা নেশার ভাব লাগিয়া আছে,—সে উহাকে দেখিয়া ছিট্‌কাইয়া দূরে সরিয়া গেল, সমস্ত শরীর তার প্রচণ্ড রাগে কাঁপিতেছিল।

মিঃ ঘোষাল দ্রুত আসিয়া শক্ত মুঠিতে তার হাত ধরিলেন, অনুচ্চ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "এসো বিদ্যুৎ!—আঃ! দেখ দেখ, কি মহান ও অনৈসর্গিক হয়ে উঠেছে সূর্য্যাস্ত-কিরণ স্নাত কাঞ্চনজঙ্ঘা! সার্থক নাম দিয়েছিল বটে! সাধ করে কি আর কালিদাস লিখেছিলেন,—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা,
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ॥"

বিদ্যুৎ দুহাতে কান ঢাকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "কুহকী! কুহকী! চুপ্! চুপ্! তোমার ওই সব মায়ামন্ত্রই আমায় এত বড় সর্ব্বনাশের পথে টেনে এনেছে। বিশ্বাসঘাতক! সয়তান! রাক্ষস!"

মিঃ ঘোষাল বিদ্যুতের মুক্তহস্ত ধরিয়া ফেলিয়া আকর্ষণ করিলেন; একান্ত কোমল স্নিগ্ধ স্বরেই কহিলেন, "সর্ব্বনাশ তুমি কা'কে বলছো ডারলিং। সেই হীন-সঙ্গী বিশ্বাসঘাতক লোকটার জন্যে তুমি সত্যি সত্যিই অনুতপ্ত হচ্চো নাকি? আজকের তারিখ পর্য্যন্ত কি তুমি তার কাছ থেকে পেয়েছ হিসেব করে দেখতো? আর আমার কাছে আজ থেকে কোন খেতাবী লেডী, কোন নেটিভ কুইনের চাইতে তুমি কিচ্ছুটি

কম পাবে না,—সেটা আজ থেকেই দেখতে পাবে। তারপর শীঘ্রই ইসলাম নিয়ে আমরা বিয়ে করবো, তারপর চাও যদি তো শুদ্ধি নেওয়া যাবে, না. চাও জগজ্জ্যোতি নূরজাহানের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে তুমি হবে আমহাটীর—বেগম সাহেবা, আমি নে'বো নবাব অথবা রাজা বাহাদুর উপাধি, সে তোমার যেমন রুচি।"

বিদ্যুৎ গভীর ঘৃণাভরে কয়েক পদ পিছাইয়া গেল, "আমার উপযুক্ত! যাকে প্রথম দর্শনেই অন্তরাত্মা আমার ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল, সেই তারই ফাঁদে কিনা শেষ পর্য্যন্ত ঘুরে ফিরে এসে পড়লুম!"

মিঃ ঘোষাল সহাস্যে কহিলেন, "আগুনের পাশে পাশে আকৃষ্ট-পতঙ্গ যেমন করে ঘুরে বেড়ায়, তোমার পিছনে এই চার বৎসর ধরে তেমনি করেই যে আমি ফিরেছি! তোমায় ফিরে পাবার আশা তো আমার কিছুই ছিল না, শুধু চোখের দেখা, দুটো কথা, একটুখানি হস্ত স্পর্শ! সত্যি বল, এতবড় সৌভাগ্য তুমিই কি আমায় নিজে থেকে এনে দাওনি?"

বিদ্যুৎ শিহরিয়া মুখ তুলিল, সবেগে কিছু বলিতে গিয়া অকস্মাৎ নীরব হইয়া গেল। মিঃ ঘোষালের যুক্তি একেবারে তো উড়াইয়া দেওয়াও যায় না!

মিঃ ঘোষাল স্বপ্নাভিভূতের মতই, সুদূর হইলেও মনে হয় যেন অদূরেরই সূর্য্যাস্ত কিরণে আপ্রান্ত অনুরঞ্জিত সুমেরু-প্রতিম কষিত কাঞ্চনে গঠিত স্বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতি ভাবাবেশে বিহ্বল-প্রায় দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া আপনমনেই কহিয়া চলিলেন, "জানোনা তো বিদ্যুৎ! কতদিন কত রাত্রি কত মাস কত বৎসর আমার তোমার চিন্তায় অনাহারে অনিদ্রায় কেটে গেছে! বুকের মধ্যে তোমার বিদ্যুতের মত রূপ, আর তার সঙ্গে দারুণ অপমানের বৈদ্যুতিক-কষা সমান বেগেই আঘাত করে করে আমায় উন্মাদ করে তুলেছিল। তারপর সুরো যখন

চাকরীতে গেল, জ্বালা-ভরা যন্ত্রণাময় দুঃসহ জীবন আর একা একা সহ্য করতে না পেরে তার সঙ্গ নিলেম। যেখানে গেছে, নানা ছলে তোমাদের দুজনের জন্মদিনে, বিয়ের তারিখে, মেয়ের জন্ম তারিখগুলিতে নির্ভুল হিসেব রেখে রেখে, কখনও নিমন্ত্রিত, আবার কখন অনিমন্ত্রিত গেষ্ট হিসেবে এসে পড়েছি, রাশি রাশি উপহার নিয়ে। অত "বেশী" উপহৃত হয়ে তোমরা লজ্জা পেযেছ, রাগ করেছ, জানোনা তো আরও কত বেশী, কত মূল্যবান বস্তু দেবার জন্য প্রবল ভাবে প্রলুব্ধ হলেও প্রাণ ভরে, বাসনাপূর্ণ করে দিতে পারিনি। পারলে আমার সর্ব্বস্বই যে আমি এর বহুপূর্ব্বে তোমার পায়ে উজাড় করে দিয়ে হাসিমুখে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারতুম। এবার চেঞ্জের ছুতোয় একটা বাসা করে এখানে রয়েই গেলাম, আঃ! ভাগ্যে ছিলাম! তাই না প্রসন্ন ভাগ্য-বিধাতা আমার অপহৃত রত্ন আমার হাতে নিজে হ'তে তুলে ফিরিয়ে দিলেন! ওকি! কিছুই খেলে না যে! চা'ও তো মুখে তোলোনি! ছিঃ, নাঃ, ওরকম করলে চলবে না ডিয়ার! অমন করলে আমি ভয়ানক রাগ করবো! নাও,—ধরো,—খাও—"

বিদ্যুৎ অপ্রতিবাদে পানপাত্র গ্রহণ করিয়া এক চুমুক পান করিয়াই নামাইয়া রাখিল, মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বিশ্রী! থাকগে!—আচ্ছা মিঃ ঘোষাল! সত্যিই কি আপনি আগাগোড়া প্ল্যান করেই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন? এর মধ্যে সবটাই কি আপনার প্রতিহিংসা? সমস্তটাই কি ঘৃণ্য স্বার্থ? বন্ধুত্বের এতটুকু গন্ধ পর্য্যন্ত কি এর মধ্যে কোন দিনই ছিল না?"

মিঃ ঘোষাল পরম পরিতোষের হাসি হাসিলেন, "হেলায় হারাতে পারি এমন রত্ন তো তুমি নও বিদ্যুৎ! নিজে যখন তুমি আমার পাতা ফাঁদে এসে অতি সহজে পা দিলে, তখনও তোমার মনোভঙ্গ করে তোমার

জীবন অতিষ্ঠ করে তোলবার কল্পনা ভিন্ন আর কোন মহৎ লাভের আশা আমার স্বপ্নের ভিতরেও ছিল না, কিন্তু কাল রাত্রে তোমার ঐ আকুল মিনতিভরা শব্দবাণ একমুহূর্ত্তে আমার মনের ঝড়ের হাওয়ায় দুরাকাঙ্ক্ষার তুফান তুলে দিলে, 'তাই আমায় নিয়ে চলুন, তাই নিয়ে চলুন, তাই নিয়ে চলুন। এমন কি কোন জায়গা নেই; যেখানে গেলে আর এ সংসারে ফিরে আসতে হ'বেনা!'—আমি ছাড়াও যে কেউই হতো এতবড় সুযোগ, যৌবনের তপ্তরক্ত গায়ে থাকতে ছাড়তে পারতো কি? কিন্তু, এ'কি করছো? কিছু একটু মুখে দাও, আমায় যে এক্ষুণি কাপড়-চোপড় বিছানা-পত্র সমস্ত কিছু কিনে ফেলতে হবে।"

বিদ্যুৎ এক টুক্‌রা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া হাতে লইল, বলিল, "খাচ্চি, আপনি যাননা, আমার দেরী হবে।"

সানন্দে বিদ্যুতের বাহুমূল নাড়িয়া দিয়া পরিতৃপ্তির হাসি হাসিয়া ঘোষাল সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "এইতো, এইতো তোমার মত বুদ্ধিমতীর উপযুক্ত কথা! যাক্, পরশু ভোরে খোঁজ-খবর করে রেখে কোন ছোট সহরে বা গাঁয়ে গিয়ে ইসলামী মতে বিয়েটা সেরে নেবো, তা'র পর ড্যাং ড্যাং করে কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে হবে আমার গৃহলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা। My Sweet heart! My love! My love! May I take one keesy?"

বিদ্যুৎ তীব্র দৃষ্টি হানিয়া সম্পূর্ণ মুখ ফিরাইয়া লইয়া চেয়ারশুদ্ধ দূরে সরিয়া গেল। সে দৃষ্টির আঘাতে বেত্রাহত কুকুরের মতই নত মস্তকে মিঃ ঘোষাল বাহির হইয়া গেলেন।

৯

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গিরি-নগরীর আ-মস্তক পাদ-প্রান্ত অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোকে ঝলমল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গিরি দুর্গের অপরাজিত অজেয় প্রহরীরা নিঃশঙ্ক সতর্কতায় তাদের উন্নত মস্তক ও উদ্যত বাহু বিস্তৃত করিয়া বিশ্বস্ত প্রহরা কার্য্যে সতর্ক হইয়াই দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য হাতের প্রহরণ বা তাদের অঙ্গের পরিচ্ছদ কিছুই আর দৃশ্যমান হইতে ছিল না। অন্ধকারের অন্তরালে সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

সেই ঘরে সেই একই অবস্থায় স্থির অনির্দ্দেশ্য চক্ষে চাহিয়া বিদ্যুৎপ্রভা ঠিক তেমনি বসিয়া আছে। তার সম্মুখে সেই প্লেট ভরা অভুক্ত খাদ্য যথাপূর্ব্ব সাজানোই আছে, মায় হাতের আঙ্গুলে ধরা সন্দেশের সেই টুক্‌রাটুকু পর্য্যন্ত! হোটেলের একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী গলা খাঁকারী দিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তার সঙ্গে একটি ফিটফাট সাজা-গোজা লেপ্‌চা মেয়ে। লোকটি বলিল, "ঘোষাল সাহেব বলে গেলেন, তাই একটি আয়া আপনার জন্যে কর্ত্তা পাঠিয়ে দিলেন। মেয়েটি ইংরেজী বোঝে, অল্প হিন্দিও জানে, খুব বিশ্বাসী।"

বিদ্যুৎ যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে থাকিয়াই যন্ত্রের মত উচ্চারণ করিল, "আজ নয়, কাল আনবেন।" উহারা চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই আসিল দরজী। হাতে তার একগাদা সেলাই-করা কাপড়পত্র। যথারীতি দস্তুরমত সালাম করিয়া সে জানাইল, "ঘোষাল সাব্‌ কো হুকুম মাফিক সিলিপিং-গাউন এণ্ড সিলিক্ 'আনডার উইয়ারস্' সে আনিয়াছে এবং বহোত আচ্ছি আচ্ছি সিলিক্ পিসেস্ সাহাব আপনে হি পসন্ কর্ কর্ কিন-চুকা,—মেহেরবাণী করকে ইস্‌কো ফিটিং দেখলেনা। আজ রাতি কো কাম চালানেকো ওয়াস্তে। ঔর 'নাফি' লেনেকো হুকুম হোয়তো—"

বিদ্যুৎ যথাপূর্ব্ব গ্রামোফোন রেকর্ডের মতই যান্ত্রিক উচ্চারণে বলিয়া গেল, "আজ নেহি, উহোকাল হোগা, আজ যাও—" দরজী চলিয়া গেলে নব নিযুক্ত ভৃত্য নেপালী রামবাহাদুর একগাদা সেই সেলাই করা সাদা সিল্কের লেশ লাগানো অন্তর্ব্বাস প্রভৃতি লইয়া প্রবিষ্ট হইল।

"হুজুর! দরজী এহি সব রাখ গিয়া, কাম চলে তো দেখ লিজিয়ে, ঘোষাল সাব সাড়ে আট তক আবেঙ্গী।" জিনিষগুলি যে খাটের উপর রাখিল, "কুছ কাম হ্যায়? এক কাপ ফেরেস টি ঔর গরম কফি লে' আঁয়ে ?"

বিদ্যুৎ মাথা নাড়িয়া অপ্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দিল। মুখ ফুটিয়া এদের সঙ্গে কথা বলিতেও তার আর প্রবৃত্তি হইতে ছিল না, অথচ রামবাহাদুর বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং মিঃ ঘোষাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আরও আসিল তাঁর পিছনে পিছনে কয়েকটা পাহাড়ী কুলী, তারা একরাশ মালপত্র লইয়া আসিল। সেই সমস্ত মোটগুলি খোলা হইলে দেখা গেল, তার মধ্যে নাই এমন জিনিষই নাই!—আছে,—বিছানাপত্র, গোটা দুই সুটকেস, অ্যাটাসিকেস, কয়েক বাক্স জুতা, তার মধ্যে গোপনে বিদ্যুতের জুতার মাপ লইয়া কয়েক প্রস্থ জুতা মোজাও আসিয়াছে। এ সমস্ত জিনিষপত্র যতদূর পছন্দসই সৌখীনও মূল্যবান দার্জ্জিলিংয়ের বাজারে পাওয়া যায় তার কোনোখানেই এতটুকু ত্রুটি হয় নাই। ঘরকন্না পাতার অবশ্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই কেনা-কাটা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট টি-সেট, ডিনার সেট, কাঁচের ও রূপার জগ, রৌপ্য ফুলদানী দুইটা কিনিতেও তাঁর ভুল হয় নাই। সস্মিতমুখে ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া মিঃ ঘোষাল ত্বরিৎস্বরে একটা আপ্‌সোসের অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "এ কি! ঠিক তেমনি করেই যে বসে আছ! কাপড়-চোপড় বদলাও নি, কিচ্ছুই না! যাক্,

এখন উঠে পড়ে দেখে শুনে নিয়ে এই দিয়েই আপাতক আমাদের নূতন ঘর-কন্না পাতাই এসো। ভাল তেমন কিছুই তো দেখতে পেলাম না, যা' তোমার যোগ্য, তবে অদূর ভবিষ্যৎ তো আমাদের সাম্‌নেই বাহু মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোন আক্ষেপ সে রাখবে না। তুমি তো ভিনোলিয়া সাবান ইউস্ করো? এখানে কিন্তু পেলাম না ওটা, কালই টেলি করে দেব, এই পিয়ার্স টাতেই এ দুদিন চালিয়ে নাও। পাউডারটা কিন্তু ঠিক পেয়ে গেছি, সেণ্টটাও দেখছো তোমার একেবারে নিজস্ব, মাথার তেলও তাই। তোমার অঙ্গের সৌরভ, চুলের সুবাস, সবই যে আমার বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে আজ পাঁচবছর হতে চল্লো!" গভীর আরামের একটা সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক জিনিষগুলির মোড়ক খুলিতে লাগিলেন। বিদ্যুৎ হাতের সন্দেশের টুক্‌রাটা এতক্ষণে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া গভীর বিস্ময়ে তাঁর হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ঘোষাল তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন না, নিজ ভাবে বিভোর থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন,—

"দরজী বল্লে, তাকে কাল আসতে বলেছ, তাই আজ রাত্রের জন্যে রেডিমেড কয়েকটা আণ্ডার ক্লথ, আর এখন পরবার জন্যে এই কমলা-রংয়ের সুন্দর ডিজাইনওলা শাড়ীটা আমি নিজে পছন্দ করে এনেছি। ঐ রংয়ের শাড়ীতেই তোমায় আমি প্রথম দিন দেখি, মনে আছে কি? যেদিন আমার, একান্ত আমার মনে করে আমার সর্ব্বস্ব ঐ পদপ্রান্তে সঁপে দিতেই তৈরি হয়ে গিয়েছিলুম! আজ আবার এই মধু-মিলনের শুভ তিথিতে সেই অবিস্মৃত স্মৃতিকে—আর ভয়ে ভয়ে নয়, সগৌরবে বিকশিত করে তুলতে চাই সেই পরিস্থিতি দিয়ে। আর এইটি তোমার উপযুক্ত না হলেও আমাদের প্রথম মিলনের মাঙ্গল্য চিহ্ন স্বরূপ এনগেজমেণ্ট রিং হিসেবে এই মার্কুইস প্যাটার্ণ হীরের আংটিটি তোমার

তুষার শুভ্র আঙ্গুলে পরে”—বলিতে বলিতে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন।

রায়বাহাদুর ও কুলীর দল জিনিষপত্র প্রাথমিক ভাবে যথা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাছে সরিয়া আসিয়া নিশ্চেষ্ট নির্ব্বিকার বিদ্যুতের হাত ধরিলেন। আংটি পরাইয়া দিয়া সেই হাতের উপর চুম্বনের পর চুম্বন করিতে করিতে রুদ্ধ আবেগে বলিতে লাগিলেন, “মাই লাভ্! মাই ডারলীং! মাই সুইট! ওঃ! ওঃ! ওঃ! আনন্দে কি আমি পাগল হয়ে যাবো? আমার কি হার্টফেল কর্ব্বে? এত সুখ যে আমি শরীরে মনে বইতে পারছি না!”

বিদ্যুৎ জোর করিয়া হাতখানা ছিনাইয়া লইল, আংটিটা খুলিয়া বহু দূরে নিক্ষেপ করিয়া সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ঘোষালও দ্রুত বাহিরে গিয়া তাহাকে জোর করিয়া ঘরের মধ্যে আবার টানিয়া আনিলেন। জোরের সঙ্গে চেয়ারটার উপর বসাইয়া দিয়া সক্রোধে কহিয়া উঠিলেন, “ভাল কথার লোক তুমি মোটেই নও বিদ্যুৎ? আগাগোড়াই তোমার নভেলী ঢং। তাও অতি বাজে খেলো অভিনয়! যখন যাকে পাও, তাকেই তোমার অরুচি লাগে! দেখ, অত বেশী বাড়াবাড়ি করতে যেও না, তা’তে বিশেষ কোন লাভ হবে না সে কথা স্পষ্টই বলে দিচ্চি। নিজের ইচ্ছেয় তুমি আমার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছ, মনে করেছ কি সমস্ত সহরে সে কথা রাষ্ট্র হতে এতক্ষণে বাকি আছে? কালকার সেই ষ্টেজ রিহার্সালের মুহূর্ত্তেই তো সে খবর দেশের সমগ্র সম্ভ্রান্ত সমাজ জেনেই গিয়েছে। ভেবেছ কি আবার সেই ঘরে ফিরে গিয়ে মহামহিমান্বিতা মিসেস্ চাটার্জ্জি হয়ে চাপরাসী আর্দ্দালীকে দিয়ে হুকুম খাটাবে? জানো নাকি তুমি, তুমি কি কচি খুকি? যা তুমি করেছ তারপর সে বাড়ীতে তোমার মুখ দেখা-

বার পথ আর খোলা নেই ? তুমি কি ভাবো সুরঞ্জন এরপর তোমায় স্ত্রী বলে গ্রহণ কর্ব্বে ? সে প্রিয়ব্রত ঘোষাল নয় ! তোমার এত বড় বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়েও তাকে তোমার জুতোর তলায় নামাতে পেরেছিলে কি ? সে মহারাজা রামচন্দ্র ! 'মৃদুণি কুসুমাদপি' হলেও 'বজ্রাদপি কঠোর'। অসতী সংশয়িতা স্ত্রীকে সে কিছুতেই ঘরে নেবে না। তখন তুমি যাবে কোথায় ? কর্ব্বে কি ? খেটে খাবে ? তার মতন হয়ে তো তুমি তৈরি হও নি, বিদ্যু ! তোমার ঐ বিলাস-অলসিত সুকুমার তনু-দেহে সে কি সইবে ?"

বিদ্যুৎ প্রিয়ব্রতর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে ক্ষণমাত্র অভিভূত থাকিয়া প্রাণহীন ভাবে প্রশ্ন করিল, "মিসেস্ সেনের কাহিনীটা তা'হলে আপনারই তৈরি করা ?"

মিঃ ঘোষাল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "সবটা নয় ! ওর সহপাঠীর স্ত্রী এবং ওদের সাহায্যও সে করে, এই পর্য্যন্ত নির্ভুল সত্য, তবে বাকিটা, সে তুমি এখন যেরকম ধরে নাও, তখন তো অন্তরের সঙ্গেই সেটা মেনে নিয়েছিলে,—অতবড় কুশ্রী চেহারা ও হীন অবস্থা চোখে দেখেও।"

বিদ্যুৎ ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলা আংটিটা কুড়াইয়া আনিয়া মিঃ ঘোষালের হাতে দিতে দিতে বলিল, "মাপটা বড় হয়েছে, এক যব ছোট দেখে কাল একটা বদলে আনবেন।" শাড়ীখানা হাতে তুলিয়া সহজ গলায় বলিল, "এর ডিজাইনটা বড্ড সেকেলে আমার একটুও পছন্দ হচ্ছে না।"

মিঃ ঘোষাল আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন, "তুমি আসবে ? নিজে এসে পছন্দ করে নেবে এস না ? ঐ সঙ্গে কানের দুটি হীরের কানবালা বা অন্য যা পছন্দ হয়, একটা হীরে সেটিং নেকলেসও ?"

বিদ্যুৎ সেই রকম দাঁড়াইয়া থাকিয়া শান্তস্বরে উত্তর করিল, "আজ নয়, কাল। আজ তো এসব বদলাবোনা, কাল সকালে খুলে একেবারে দরজীকে দিয়ে দোব। গায়ের মাপ তো আমি নিতে দিই নে'।"

"কিন্তু এগুলো সেই কাল থেকে পরে আছ যে, ও পরে ঘুম হবে কেন?"

বিদ্যুৎ অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ধপ করিয়া চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "সে তখন দেখা যাবে। এখন আমি একটু ঘুমাবো, বড্ড ঘুম পাচ্চে।"

মিঃ ঘোষাল গভীর উল্লাসে শিশুর মত হাসিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ লক্ষ্মী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, শরীর মন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে একটু—বলিতে বলিতে একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। বিদ্যুৎ চকিতে পিছনে সরিয়া গিয়া মুখের কাছে হাত আড়াল দিল, "আজ নয়, কাল।"

মিঃ ঘোষাল ঈষৎ পিছাইয়া আশা হত ভাবে আত্মগত কহিলেন, "কাল? সে যে যুগান্তর! বেশ, তাই হোক, আমি এতকালই যখন পেরেছি, আরও একটা মাত্র 'কালের' জন্যেই অপেক্ষা করে থাকবো। সন্ধ্যা হয়ে গ্যাছে; কুয়াসায় চারিদিক ঝাপ্‌সা হয়ে উঠেছে, বাতাসটাও তেম্‌নি ঠাণ্ডা! তুষার পড়ছে শুনলুম জলা পাহাড় পর্য্যন্ত। যাই একটু ঘুরে আসি। আমি খেয়েই আসবো, তোমার খাবার সময় হলে রামবাহাদুরকে যা' খাবে বলে দিও, গরম গরম দিয়ে যাবে। খেও কিন্তু লক্ষ্মীটি! বলে যাচ্চি কেউ যেন ডিস্‌টার্ব্ব না করে। সাড়ে আটটায় আমি ফিরবো। একবার সতৃষ্ণ চক্ষে চাহিয়া চলিয়া গেলেন।

হোটেলের একধার হইতে কে' একজন ভাঙ্গা সুরে গাহিয়া উঠিল;—

সামাল মাঝি এই পারাবারে,—বান ডেকেছে সাগরে।

"তরি আমার তাহলে এখনও ডোবে নি, না ?" বিদ্যুৎ চকিতে উঠিয়া ছুটিয়া দোর খুলিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নিবীড় ঘন কালো, চারিদিক—মায় উর্দ্ধ অধ ব্যাপিয়া কোয়াসার ঘনজাল পাতা। সে নিবীড় স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া বৈদ্যুতিক আলোক প্রবাহে বিভূষিত এই পার্ব্বত্য গন্ধর্ব্ব নগরীর আলোকমালাও আত্ম-প্রভাব বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয় নাই, অতি নিকটে দু' একটা মাত্র ঘষা কাঁচের মধ্যস্থ নিষ্প্রভ দীপ শিখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বিদ্যুতের দৃঢ় সংসক্ত সূক্ষ্ম অধরপ্রান্তে সাফল্যের স্নিগ্ধ হাস্য রেখা সহসাই স্ফুরিত হইয়া উঠিল। "এই অন্ধকারে ভরা বিজনরাত্রি আমার পথ নির্দ্দেশ করে দিচ্চে, এ'কে ব্যর্থ হ'তে দিতে পার্ব্বো না !—ক'টা বাজলো ? পৌনে আটটা। আমার প্রাণাধিক ! তুমি আমায় হয়ত ক্ষমা করতে পার্ব্বে না, তুমি যে বিচারক ! ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখা ? না, সে নভেলিয়ানা আমি কর্ব্বো না, সে শক্তিও আমার শরীর মনে নেই, কিন্তু তুমি ? হে ভগবান ! তুমি তো সবই জানো ? এই প্রচণ্ড অভিমান, এই দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কার, যার জন্যে আমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, শত তপস্যার ফলকে এমন করে নষ্ট করলুম, বড় অভাগিনী বলে তুমি আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা কর্ব্বে।"

বাথরুমের দরজা খুলিয়া সে হোটেলের পিছন দিককার সঙ্কীর্ণ পথে বাহির হইয়া দাঁড়াইল। "উঃ কি ভীষণ অন্ধকার ! কিছুই দেখা যাচ্চে না যে !"—

কিছুক্ষণ পরে অতি অস্পষ্টভাবে দেখা গেল উপরের দিকে অনেকখানি উঠিয়া সে তখন সজোরে হাঁফাইতেছে। আবারও বেশ কিছুক্ষণ পরে পরে সেই ছায়া মূর্ত্তিকে ক্রমশই উপরে উঠিতে ও স্খলিত পদে ছুটিয়া চলিতেও দেখা যাইতে লাগিল। তার পর এক সময়—একটা আলোক পোষ্টের পায়ের কাছে ছড়াইয়া পড়া অস্ফুট আলোকে

দেখা গেল, সেই মূর্ত্তি তার দুই হাত উর্দ্ধে তুলিল এবং তাহারই পদপ্রান্তবর্ত্তী একটা খাদের মধ্যে সবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

গায়ে গরম কাপড়ের বোঝা, মোটা অলষ্টার, গলায় পশমী মাফলার যতই জড়ানো থাক, উপরের পাহাড়ে যখন তুষার বৃষ্টি চলিতেছে, তখন তাঁরই সংশ্লিষ্ট পার্ব্বত্য নগরে হিমবাহের সেই অস্থি জমানো মহাশৈত্য যে বায়ুপ্রবাহে মিশিয়া ইহার নাগরিকদের উষ্ণ শরীরের রক্তকে বরফের তীক্ষ্ণ ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া কূলপী বরফে পরিণত করিতে চেষ্টাও করিবে না এমন ভরসা কেমন করিয়া করা যায়? মিঃ ঘোষাল বাহিরে যাইবার সময় এতটা ভাবিয়া দেখেন নাই, এতক্ষণ হোটেলের ভোজন কক্ষের গরম ঘরে বসিয়া গরম গরম খাদ্য পানীয় ও সুখসেব্য সিগারের প'র সিগার ভস্ম করিতে করিতে নিশ্চিন্ত আরামে মনের মধ্যের যে কল্পনা বিজাম্ভিত স্বর্গ-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে বহির্দুর্য্যোগের ক্রম বর্দ্ধমানতার সংবাদ রাখা কিম্বা তার মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের দুশ্চিন্তার স্বপ্নমাত্র ছিল না। ইজী-চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া হাতে ধরা সুগন্ধি সিগারেটায় মৃদু টান দিতে দিতে ভাবিতেছিলেন, 'কাল? না কাল নয়, আজ,—আজই আমার পক্ষে বিশেষ শুভরাত্রি, একে আমি ব্যর্থ হ'তে দিতে পারি না, আজই আমাদের শুভ-সম্মিলন সম্পূর্ণ হবে। হাতের কাছে এসে যে ফিরে গিয়েছিলো, সে আজ আমার হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছে, মুঠো আল্‌গা করে রাখলে আবারও যদি হারিয়ে যায়? সে আমার আর সইবে না। সে আমারই ট্রু মেট, আমার জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে, আমারই হবে।'

গরম টুপীতে কান ঢাকিয়া টর্চ্চের আলো ফেলিয়া মিঃ ঘোষাল শীস্ দিতে দিতে হোটেল-কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। শীস্ দিলে নাকি শীত পালায়, তবু কিন্তু হিম-হাওয়ায় হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইরা দিতেছে। ঘর অন্ধকার, কোন সাড়া শব্দ নাই। সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিলেন,

"কই ? ঘরে ত নেই ? উঠে হয়ত মুখ ধুতে গেছে !" বাথরুমের দুদিকের দরজাই খোলা যে! উঃ কি জোর বাতাস দিচ্চে, আর এই দারুণ কোয়াসায় নিজের হাত পা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্চে না, অন্যায়! ভারী অন্যায়! এই সময়ে কেউ বাইরে যায় ? তা'ও গায়ে গরম জিনিষ কিছুই নেই। লেডিস্ শালটা সেও তো তেমনি বাঁধাই রয়েছে। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! কোথা তুমি ?" মিঃ ঘোষাল হাত হইতে সিগারটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

সারারাত্রির সব খবর বলা শক্ত,—তবে ভোরের বেলা উষালোকের যে অরুণিমা সমতলবাসীরা দেখিতে পায়, তদপেক্ষা শতগুণে বিমুগ্ধকারিণী মূর্ত্তি লইয়া এই পূর্ব্ব-ভারতীয় পর্ব্বতশৃঙ্গে তাঁর অভ্যুদয় ঘটিল। কোথায় গেল রাত্রের সেই ঘন কোয়াসার মোটা চাদরে ঢাকা সন্দেহজনক মূর্ত্তি, বরফে ভেজা বিভ্রান্তকারী এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া। কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রাভাতিক সূর্য্যের স্নিগ্ধচ্ছটায় অপূর্ব্ব দৈবী মূর্ত্তিতে পর্ব্বতবাসীর সম্মুখীন হইলেন। মনে হইল অতি সহসা সোনার তারের সঙ্গে বসোরা গোলাপের রংয়ের রেশমী সূত্রে বোনা একখানা অঙ্গাবরণ তাড়াতাড়ি আনিয়া কে যেন তাঁর আ-নীল-গগনপ্রান্ত চুম্বিত হীরার মুকুট পরা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিল তথাপি সেই অপূর্ব্ব তুষার কিরীট সে আচ্ছাদনীর মধ্য দিয়াও তার হীরক দ্যুতি বিচ্ছুরিত করিতে বাধা পাইল না।

কিন্তু সেই অনৈসর্গিক রূপ শোভা চোখ ভরিয়া তখন দেখিবে কে ? অন্ততঃ মিঃ ঘোষাল এবং তাঁর সঙ্গে হোটেলের কর্ত্তা ও স্থানীয় পুলিশের কর্ম্মচারী-বৃন্দের তো সে অবসর বা অবস্থাই ছিল না। সেই দুর্য্যোগময়ী শীতার্ত্ত নিশীথে সারারাত ধরিয়াই ইঁহারা অনুসন্ধান চালাইয়াছেন। মশাল এ বাতাসে থাকে নাই, টর্চ্চের দোকান নিঃশেষিত প্রায়, পেট্রোম্যাক্সেরও কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

মিঃ ঘোষাল উন্মাদের মতই উদ্‌ভ্রান্ত, হোটেলের কর্ত্তা তাঁর হাত ধরিয়া বারে বারেই খাদের অতি সান্নিধ্য হইতে টানিয়া আনিতেছিলেন নহিলে হয়ত পড়িযাই মরিতেন। উষালোকে ঈষদ্দৃষ্ট একটা খাদের মধ্যে কি যেন দেখিতে পাইযা তিনি আকুল আর্ত্তরব করিয়া উঠিলেন, "ঐ, ঐ, খাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সে—"

১০

দার্জ্জিলিংয়ের সরকারী হাঁসপাতালের একখানি সুপরিচ্ছন্ন ও যথোপযুক্তভাবে সজ্জিত প্রাইভেট কেবিনে বিদ্যুৎ শুইয়া আছে। মাথায় তার ব্যাণ্ডেজ করা, হাতে পাযে এখানে সেখানে যত্র তত্র কোথাও ষ্টিকিন্‌-প্ল্যাস্‌টার পটি, কোথাও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, পাশে দুজন প্রাইভেট নার্স। একজন হেড নার্সের সঙ্গে ডাক্তার ও মিঃ ঘোষাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার নিম্নস্বরে ঘোষালকে বলিলেন, "দূর থেকে দেখে বাইরে চলে যান। এখন পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরেছে হঠাৎ যেন উনি আপনাকে দেখে না ফেলেন। কোন রকম মানসিক ষ্ট্রেন সহ্য কর্ব্বার মত ওঁর নার্ভের অবস্থা নয়।"

মিঃ ঘোষালের গলার মধ্যে একটা উদ্‌গত অশ্রুর ঘন চাপ তাঁর কণ্ঠরোধ করিতে উদ্যত হইয়া উঠিতেছিল, গাঢ়স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "বাঁচবেন ত?"

ডাক্তার অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত উত্তর করিলেন, "বিলক্ষণ! অতবড় ক্রিটিক্যাল অবস্থাই যখন কাটিয়ে উঠেছেন, তখন এসব তো সামান্যই! তবে এখনও বহুদিন ধরে অশেষ যত্নসহকারে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রপার ট্রীটমেণ্ট করে যেতে হবে।—কি ফিজ্রিক্যালী কি মেণ্টালী—"

মিঃ ঘোষাল একটা ঢোক গিলিয়া নিজের অদম্য উচ্ছ্বাসটাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া লইয়া কহিলেন, "অনেক ধন্যবাদ! আমি তা'হলে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি?"

বিদ্যুতের দিকে ক্ষণকাল সজলনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অনিচ্ছুক শ্লথ পদে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার নার্সের প্রতি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"ঘুমুচ্ছেন?"

বিদ্যুৎ চোখ মেলিল, "ওঃ আপনি! সেই সয়তানটার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম না?"

ডাক্তার রোগীর হাতের নাড়ী ধরিয়া তৃপ্ত স্বরে কহিলেন, "কা'র কথা বলছেন? সয়তান এখানে কোথায় পেলেন? আপনার স্বামী ঘোষাল সাহেব আপনাকে দেখতে এসেছিলেন তো। তিনি আজ দুমাস ধরে এইখানেই তো আড্ডা গেড়েছেন, দিনের মধ্যে কতবারই যে আসেন, নিঃশব্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার পায়ের তলায় বসে কাটান। আহা! বড্ডই কাতর হয়েছেন।"

বিদ্যুৎ কতক্ষণ চোখ বুজিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল, তারপর বলিল,— আপনাদের একটু ভুল হয়েছে।"

ডাঃ বলিলেন, "কি বলুন তো?"

"ও ভিলেনটা আমার স্বামী নয়।"

ডাক্তার তাঁর ষ্টেথস্কোপটা গলা হইতে খুলিয়া হাতে লইতেছিলেন, হাল্কাভাবেই জবাব দিলেন,—"তাই নাকি? আচ্ছা এসব কথা পরে হবে, আপাততঃ আপনার হার্টটা একবার দেখে নিই। সিস্টার! ড্রেসটা ঠিকমত করা হয়েছে ত? থাক খুলতে হবে না,—" সমভিব্যাহারিণী সিস্টারকে গোপনে উপদেশ দিলেন, "সব কথাই মিঃ ঘোষালের কাছে আমি শুনেছি। এঁর কোন কথার প্রতিবাদ কেউ যেন না করে।

অতবড় মাথার আঘাতে হয়ত বা একটা রিঅ্যাকসোনারী টার্ন নেবে আশা করা গেছলো, তা' হ'ল না। থ্যাঙ্ক গড্‌! আর ও যে ব্যাড্‌ টার্ন নেয়নি সেইটেই ওঁদের সৌভাগ্য!"—আবশ্যকীয় দু একটি ব্যবস্থা দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

বিদ্যুৎ ক্ষীণ স্বরে ডাকিল, "সিস্‌টার জোন্‌স! উনি বুঝি আপনাকে বোঝাচ্ছিলেন আমার মাথা খারাপ? আমার কথার প্রতিবাদ করা বৃথা? বেশ! ভদ্রলোক আমার সকল দিক দিয়েই যথেষ্ট উপকার করে রেখেছেন!"

বর্ষীয়সী স্নেহময়ী ইউরোপীয়ান সিস্‌টার রোগিণীর পাশের চেয়ারে বসিয়া তার চাদর ঢাকা পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইযা মিষ্ট স্বরে কহিতে লাগিলেন, "আপনার জন্যে কি সুন্দর বাড়ী নেওয়া হয়েছে দেখে এলাম। আর দু হপ্তা পরেই আপনাকে আমরা ছেড়ে দিতে পার্ব্বো। কলকাতা থেকে দুজন ওয়েল-ট্রেন্‌ড্‌ নার্স আপনার জন্যে আনবার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছে।"

বিদ্যুৎ ব্যগ্র ভাবে সিস্‌টারের হাত চাপিয়া ধরিল, "আমি এইখানেই থাকবো, আপনার কাছেই থাকবো, আপনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন না।"

সিস্‌টার মিষ্ট ভাবে হাসিলেন, "নো, নো, মাই চাইল্ড! এক্ষুণি আবার যাবেন কোথায়? এখনও বহুদিন সেবা-যত্ন করে আপনাকে রীতিমত ষ্ট্রাউট এণ্ড ষ্ট্রং করে তুলবো না? সে রকম অবস্থা না হ'লে আপনার হজ্‌ব্যাণ্ড এই হাঁসপাতালের দোরে মাথা কুটে মাথা ফাটিয়ে ফেল্লেও ছেড়ে দেবো না কি? কেমন? খুসী তো?" হাসিমুখে গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বিদ্যুৎ সকৃতজ্ঞ নেত্র সিস্‌টারের মুখে তুলিয়া ধরিল, "হ্যাঁ। যাতে গায়ে বল না পাই তাই আমি করবো, আমি খাবো না।"

সিস্টার প্রস্থানোদ্যতা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সহাস্যে কহিলেন, "দুষ্টু মেয়ে! তোমার সব দুষ্টুমী আমি ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করে দেবো। তিনি যদি তখন তোমায় গ্লুকোজ ইনজেকসন দেন, রাগ করতে পাবে না।"

দারুণ হতাশার সহিত ক্লান্তভাবে বিদ্যুৎ চোখ মুদিল, ক্লিষ্ট স্বরে কহিল, "আমায় একটু পাশ ফিরিয়ে দিতে বলুন, আমি ঘুমবো।" অকূল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সহিত শেষ যুদ্ধে পরাভূত মজ্জনোন্মুখ ব্যক্তির শেষ আশা সূত্রটুকু ছাড়িয়া দিয়া মনে মনে বলিল, "উঃ কি কঠিন প্রাণ আমার! পাথরে আছড়েও ওকে ভাঙ্গতে পারলুম না, এত যন্ত্রণাতেও হার্টফেল করলোনা, কি দিয়ে তৈরি হয়েছিল এরা?"

দৈবজ্ঞের দিব্যদৃষ্টি হয়ত বিচক্ষণ ডাক্তারদের অভিজ্ঞতার মধ্যেও মিশ্রিত আছে। তারাও যা' ভবিষ্যদ্বাণী করে বহু স্থলেই তা' সত্য হইতে দেখা যায়। শেষ দুটি হপ্তার ভিতরেই অশেষ বাধা দানের প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ হাঁসপাতালের গণ্ডি কাটাইবার মত শক্তি অর্জ্জন করিল। কিন্তু দৈবজ্ঞদের সূক্ষ্ম বিচারেও কখনও কখনও কোন অদৃশ্য শক্তি দৈবপথকেও ঝাপ্‌সা করিয়া দেয়, জন্মলগ্নের দুচার সেকেণ্ডের কাঁটা,—বিশেষ যাদের সন্ধি-লগ্নে জন্ম, তাদের ভাগ্যদেবতার ফন্দি-ফিকির বুঝিতে বড় বড় দৈবজ্ঞেরাও মুহ্যমান হইয়া পড়েন, বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও ডাক্তারের অভিজ্ঞতা সেইভাবেই মার খাইল। সে যখন দেখিল, কিছুতেই তার চির সুস্থ দেহকে হৃত স্বাস্থ্য পাওয়া হইতে দাবাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, তখন একদিন একলা হইতে পাওয়া মাত্র সবেগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া বাথরুমে ঢুকিল। বালতী ভরা কনকনে ঠাণ্ডা জল মগে করিয়া তুলিয়া তুলিয়া সত্যকার উন্মাদের মতই গায়ে মাথায় অনবরত ঢালিতে লাগিল,—তারপরই জল ফুরাইয়া গেলে

অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া সেইখানের মেঝেতেই সে সংজ্ঞা হারাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

তারপর? যেমন হওয়া উচিত, সে যে রকমটা চাহিতেছিল তার কিছুই ব্যতিক্রম ঘটিল না। প্রবল জ্বরের সঙ্গে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ার প্রচণ্ড আক্রমণে সে আরও একটি পুরা মাস হাঁসপাতালের আশ্রয় স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই লাভ করিতে সমর্থ হইল। তার কাজের কৈফিয়ৎ দাখিল করিবার কোন প্রয়োজনই তো ছিল না, যেহেতু পাগলের পাগলামীর আবার সঙ্গত অসঙ্গততা কিসের? মাঝে হইতে কর্ত্তব্যে অবহেলার অভিযোগে অ্যাটেণ্ডিং নার্স টির চাকরীটি খোয়া গেল এবং আড়াইমাস একাদিক্রমে সঙ্গ করিয়া বিদ্যুতের প্রতি আকৃষ্ট ও সখ্য ভাবাপন্না সমবয়সী শান্ত মেয়েটির পরিবর্ত্তে যিনি আসিলেন, তিনি অনেক পোড় খাওয়া কড়া মেজাজের কঠিন কর্ত্তব্যপরায়ণা বর্ষীয়সী একজন। পাহারা খুবই সতর্ক হইয়া উঠিল। ভিতরের কথা কেহই বুঝিল না, যে একজনই শুধু এই ব্যাপারের অন্তর্নিহিত মূল রহস্যটি অবগত ছিলেন, তাঁর তো আর সে কথা প্রকাশ করিবার নয়! তিনি মিঃ ঘোষাল।

সেদিনের সকালটি মেঘ কোয়াসা পরিমুক্ত সমুজ্জ্বল সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত ও উল্লসিত। উদয়ের সূর্য্য তাঁর সমুদয় কনকরশ্মি যেন উজাড় করিয়া তাঁরই সম্মুখবর্ত্তী কাঞ্চনজঙ্ঘার অঙ্গে ঢালিয়া দিয়া তাহাকে সমধিক কিরণোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। চোখ রাখিতে গেলে চোখে ধাঁধা লাগে। আশে-পাশের নানা নামধেয় সপ্ত-চূড় পাহাড়গুলি এবং তাদের গায়ে পায়ে নীল ধূসর সবুজ বর্ণের পাহাড়েরা মাথায় শাদা পাগড়ী পরিয়া হিরন্ময়ীকে সমধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়াছে। তুষার-হীন নিচু পাহাড়ে তেমনি অপরূপ পুষ্প সমাবেশ। শ্যামলিমার গায়ে গায়ে কোথাও রডোড্রেন ড্রমের আরক্ত পুষ্প সম্ভারের অপর্য্যাপ্ততা, কোথাও আরণ্য গোলাপের শ্বেত-

হরিদ্রা ও গোলাপী ফুলের সুপ্রাচুর্য্য, জানা অজানা নামের নানা জাতীয় রক্ত পীত শুভ্র গোলাপী নীল ও বেগুনী ফুলের বর্ণাঢ্য অজ তায় দর্শকের বিস্ময় মুগ্ধ দৃষ্টি দিশাহারা হইয়া গিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথ হারাইয়া ফেলিতে ছিল। ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মৌমাছিদের গুঞ্জন ধ্বনি স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। পার্ব্বত্য কোকিলের স্বর যদিও মাধুর্য্যে সমতলবাসী স্বজাতীয়ের সমকক্ষ ন", তথাপি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া নিতান্ত বিসদৃশ কানে ঠেকিতে ছিল না। বিচিত্র বর্ণের পাখা নাড়া দিয়া প্রজাপতি এবং সুন্দর সুদৃশ্য চেহারার নানা জাতীয় পাখীদের ব্যস্ততার ও সঙ্গীত সাধনার অন্ত ছিল না। প্রকৃতি যেন সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী অপরূপা রূপে প্রকটিতা হইয়াছেন, হয় ত এইরূপই তাঁর স্বরূপ!

হাঁসপাতালের সেই প্রাইভেট কেবিনের সুপরিচ্ছন্ন গৃহের প্রশস্ত শয্যায় বিদ্যুৎ আজিও শয্যালীনা। আজ তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা নাই। কর্ত্তিত কুন্তলা শীর্ণমুখী বিদ্যুতের সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন একান্ত অপরিচিত মনে হইতে ছিল। কপালের একটা দিকে গভীর একটা ক্ষত চিহ্ন। গ্রীসীয়ান কাটের সে মুখ লম্বাটে সরু হইয়া গিয়াছে। বর্ণের সেই গোলাপের আভা সংযুক্ত তুষার ধবলতাও আর বর্ত্তমান নাই। হাতে পায়ে সর্ব্বত্রই ছোট বড় পুরাতন ক্ষতের নানা আকারের চিহ্নে খচিত কিন্তু সে সবই কোমল স্পর্শ মূল্যবান সাদা চাদর দিয়া ঢাকা।

হেড নার্সের সহিত মিঃ ঘোষাল আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, তা' দেখিয়া বিদ্যুৎ পিছন ফিরিয়া শুইল।

সিস্টার বলিলেন, "আপনি বসুন, আমি একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি, দরকার হলে বেল টিপবেন, নার্স পাশের ঘরেই আছে, আধঘণ্টা পর্য্যন্ত আপনি থাকতে পারেন। মিসেস্ ঘোষাল খুব

ভালই আছেন। অনেকটা ষ্ট্রেংথও ও রিগেন করেছেন। মোট সাড়ে তিন মাসে এর চাইতে বেশী আশা করা যায় না, কি বলেন ?”

মিঃ ঘোষাল কহিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! আপনারা যা’ করেছেন তার জন্যে আপনাদের কাছে আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তা’ মুখে বলে প্রকাশ করবার ভাষা আমার জানা নেই।”

সিস্‌টার সহাস্যে উত্তর করিলেন, “মুখে না বলেও যে আপনি অনেকখানি প্রকাশ করতে জানেন, তার পরিচয় তো এই কতক্ষণই হ’ল প্রদান করেছেন! কিছুতেই তো শুনলেন না।” আঙ্গুলে পরা হীরক অঙ্গুরী প্রদর্শন করিলেন। “এর দাম তো কম হবে না।”

মিঃ ঘোষাল কুন্ঠিত বিনয়ে অপ্রস্তুত ভাবে কহিলেন, “কি তুচ্ছ সামান্য একটা জিনিসের কথা তুলে আমায় লজ্জা দিচ্ছেন সিস্‌টার! আপনারা আমায় যে অমূল্য রত্ন ফিরিয়ে দিলেন—”

বিদ্যুৎ সবেগে সাম্‌নে ফিরিল, “দেখুন! অভিনয় করতে হয় বাইরে গিয়ে করুন, এটা সরকারী হস্‌পিটালের রোগীর ঘর।”

সিস্‌টার লজ্জিত ভাবে ক্ষমা চাহিয়া বাহির হইয়া গেলেন, মিঃ ঘোষাল বিছানার পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া ঘেঁষিয়া বসিয়া বিদ্যুতের বিছানায় রাখা হাতটা ধরিলেন, কাতরকণ্ঠে কহিলেন, “পাষাণি! তুমি কি মানুষ নও? সত্যিকারেরই কি আকাশের বিদ্যুৎ শিখা? তেমনি দগ্ধকারী তেমনিই কঠোর? কি নিষ্ঠুর তুমি? কেন এমন করে নিজেকে ধ্বংস করতে গেলে? আর আমাকেও সেই সঙ্গে ভস্ম করে ফেল্লে? ভগবান দয়া করে যদি তোমায় না বাঁচাতেন, তা’হলে আমিই কি বেঁচে থাকতে পারতুম!”

বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ শ্লেষে তীব্রস্বরে এত বড় মর্ম্মচ্ছেদী অভিব্যক্তির জবাব দিল, “আপনি না বাঁচলেও ভগবানের রাজ্য লোকাভাবে রসাতলে

যেত না। তবে হ্যাঁ, আমায় হয়ত সেখানে গিয়েও আপনার তাড়না থেকে মুক্তি পাবার উপায় খুঁজে অস্থির হ'তে হতো! যান্, আপনি—বেরিয়ে যান্! যথেষ্টই তো করেছেন, এখনও কি আমার পিছনে রাহুর মতন লেগে থাকবেন?"

মিঃ ঘোষাল অশ্রুজল ভরা প্রগাঢ় স্বরে আর্ত্তনাদের মতই উচ্চারণ করিলেন, "বিদ্যুৎ!"

বিদ্যুৎ নিজের ঝোঁকে অধৈর্য্য ভাবে বলিয়া চলিল,—"কিসের লোভে? আমার রূপ যৌবন সবই তো ফুরিয়ে গ্যাছে,—কি আছে আর এই ভাঙ্গা-চোরা আমার মধ্যে? আপনারও প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হয়েছে, এখন নিশ্চিন্তে ফিরে যান। আপনার বয়স আছে, স্বাস্থ্য আছে, ফন্দি-ফিকির, কুহক-মন্ত্র অতি চমৎকার চমৎকার জানা আছে, যান্,—নতুন নতুন ফাঁদ পাতুন গিয়ে, কত শত রূপসী বিদুষী দলে দলে ছুটে এসে সেই ফাঁদে পা গলাবে। আমার এই হতশ্রী চেহারা ভগ্ন স্বাস্থ্য তার চাইতেও শতগুণে ভাঙ্গা প্রাণ এ নিয়ে আপনি করবেন কি? যার জন্যে আমায় সর্ব্বহারা করে আছড়ে ভাঙ্গলেন সে ত আজ নিঃশেষ হয়েই গ্যাছে। আর কেন? যান্!"

মিঃ ঘোষাল একটা আকুল আর্ত্তরব করিয়া উঠিলেন,—"বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! আমায় তুমি যত পাপিষ্ঠ ভেবেছ ততটা হয়ত আমি নই। শুধু তোমার জন্যেই আজ আমার এই দশা! তোমার রূপই হয়ত প্রথম দেখার দিনেই আমায় ভুলিয়ে ছিল, তার উপর অপ্রত্যাশিত অপমানের আঘাতে আমি সত্যই পাগল হয়ে গেছলাম, কিন্তু তোমাকে হারাতে বসে পলে পলে বুঝতে পারলেম তোমার রূপকে শুধু নয়, আমি অন্তরের অন্তর থেকে তোমাকেই চেয়েছি,—আমৃত্যু, আজীবন! তোমার রূপের জ্যোতি বাইরে নিষ্প্রভ হ'তে পারে,—কিন্তু আমার মনে তার আলো

একটুও কমে নি বরং আরও জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে।” বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর জল ভারাকুল হইয়া একেবারেই তাহা নিরুদ্ধ হইয়া গেল, চোখের পাতা দুইটা ভিজিয়া উঠিল।

বিদ্যুৎ বিস্ময়ের সহিত তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত অনুত্তেজিত ভাবে নরম গলায় বলিল, “কিন্তু আমি তো আপনাকে কোনদিনই একটুও ভালবাসিনি, মিঃ ঘোষাল! আমার স্বামী—আমার স্বামীই যে আমার সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে রয়েছেন। সেখানের সূচ্যগ্র ভূমি তো কাউকে আমি দিতে পার্ব্বো না।”

প্রিয়ব্রত ঘোষালের সমস্ত চেহারাই যেন একটি মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল। অসহ্য ঈর্ষার তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁর সেই জল ভরা বর্ষণ প্রয়াসী কণ্ঠ পতনোদ্যত বজ্রের মতই গর্জ্জিয়া উঠিল। দৃপ্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “সে কি তোমার একটা '' খোঁজ করেছে? চেষ্টা সত্বেও এই অ্যাকসিডেণ্টের খবর তো আর রিপোর্টারদের হাত থেকে ঢেকে রাখা যায়নি,—অবশ্য তারা মিসেস্ ঘোষাল বলেই তোমায় উল্লেখ করেছে, লিখেছে ‘ওঁর স্বামী পুলিশের কাছে বলেছেন, ওঁর মাথা খারাপ তাই খেয়াল বশে বেরিয়ে গিযে অজানা পথে অন্ধকারে পড়ে গেছেন।’ হোটেলের মালিক সাক্ষ্য দিয়েছেন, ‘মাথা তাঁর সত্যই খারাপ। তাঁর প্রধান খেয়াল তিনি মিসেস্ ঘোষাল ন’ন, স্বামীর সঙ্গে একটুও তাঁর সদ্ভাব নেই।’ এ সমস্ত থেকে সে কি প্রকৃত ঘটনা ধরতে পারেনি বলতে চাও? যদি তোমায় চায় তো তখনি কি ছুটে আসতো না? খবর নিতো না?”

পাশের টেবিলে রাখা কলিংবেল টিপিয়া বিদ্যুৎ ডাকিল, “নার্স! আমায় একটু জল দিয়ে যাও।” নার্স প্রবেশ করিলে বলিল, “ওঁকে এখন যেতে বলো, বকে বকে আমার মাথা ধরে গেছে।”

মিঃ ঘোষাল ঘোর বিরক্তির সহিত উঠিযা দাঁড়াইলেন, "আচ্ছা আমি যাচ্চি। বলতে তোমায় ভুলে গেছি, ডাক্তারেব অনুমতি পেযেছি কাল সকালেই তোমায় বাড়ী নিয়ে যাবো, এখানে ওঁরা আর নাকি কিছুতেই রাখতে পারেন না। নার্স ! কাপড়গুলো ওঁকে দেখাবেন, ওঁর যেমন পছন্দ হয় পবিযে তৈরি করে রাখবেন, সকালে আটটা সাড়ে আটটায আমি আসবো। টিল টো-মরো !" ঘোষাল চলিয়া গেলেন। বিদ্যুৎ কহিল, "সিস্‌টারকে ডাকো তো একবার।" সিস্‌টার আসিলে তাঁহাকে অনুযোগের ভাবে কহিল, "তা'হলে আপনারা নির্ঘাত কাল আমায় বিদায করে দিচ্চেন ?"

সিস্‌টার সস্নেহে আদর মাখা স্বরে কহিলেন, "ওঃ, নো, নো, মাই হনি ! অমন কথা বলবেন না। আপনার সৌভাগ্যে আমি ও আমরা যে কত সুখী তা' বলতে পারি না। আপনার স্বামী একটি জুযেল অফ্ হজব্যাণ্ডস্ ! এখন শান্তিতে নিদ্রা যান।" একটু আদব দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। নার্সটিও একটু এদিক ওদিক গোছগাছ করিয়া দিয়া রাত্রের মত বিদায লইল ও একটু পরে দ্বিতীয় নার্স রাত্রের আহার্য্য লইয়া আসিল।

বিদ্যুৎ বলিল, "আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, ও সমস্ত নিয়ে যাও।"

নার্স একটু হাসিল, "কেন বলুন তো ? কাল বাড়ী যাবেন সেই আনন্দে ?"

বিদ্যুৎও হাসিয়া জবাব দিল, "উহুঁ,—তোমাদের ছেড়ে যাবো সেই বিষাদে। না, সত্যি, একেবারে ক্ষিধে নেই ;—আচ্ছা দাও, ওই ফ্রুট জুসটাই খাই, আর কিচ্ছু না।" গ্লাসটা তুলিযা লইয়া পান করিলে সে বাকি সমস্ত লইয়া গেল, কিছু পরে আসিযা ঔষধ খাওয়াইয়া মশারী

ফেলিয়া দিয়া রাত্রের মত বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া চলিয়া গেল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল, পাশের ঘরে থাকিবে, এখন আর সারারাত্রি জাগিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না।

১১

বারোটা বাজিয়া গেল, কর্ম্মতৎপর সুবৃহৎ বাড়ীখানি ক্রমে ক্রমে নীরব হইয়া আসিয়াছিল, এখন একেবারেই নিঝুম হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ উঠিয়া বসিল।

"অসহায়ের মতন পড়ে থাকলে তো আমার চলবে না। ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ কিছুতেই আমি কর্ব্বো না! জীবনের মহা ভুল প্রায়শ্চিত্ত করেই শোধরাবো। বর্ব্বর শক্তির কাছে আত্ম নিবেদন করে চরম অবমাননা কখনই কিনে নে'ব না। বাইরের কোন সাহায্য পাবার উপায় আমার নেই। পাপিষ্ঠ আমায় পাগল সাব্যস্ত করে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে। আমার এই জরা জর্জ্জরিত শ্রীহীন দেহটাকে ছেড়ে যে দেবেন সে আশাও তো ফুরিয়ে গেল, এখন একমাত্র আত্মশক্তিই আমার সহায়। বেশ! তাই হোক—"

উঠিয়া আসিয়া এক বাণ্ডিল কাপড়, যাহা মিঃ ঘোষাল পাঠাইয়াছিলেন, তারই মধ্য হইতে একখানা সাদা সিল্কের শাড়ী বাছিয়া লইয়া পরিল। তারপর বিছানার সাদা মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া গায়ে মাথায় জড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া অতি সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। প্রাইভেট কেবিনে বিশেষ কেহ থাকে না, তাই এ-দিকটা প্রায় নির্জ্জন। ঘুমন্ত পুরী নিঃশব্দ পদে অতিক্রম করিয়া সহজেই খিড়কির দরজার কাছে আসিয়া পৌছিতে তাকে বিশেষ কোন বাধা পাইতে হইল না।

দার্জ্জিলিংএর সুপ্তিমগ্ন লেবং রোড ধরিয়া স্খলিত পদে ও বিস্রস্ত বেশে বিদ্যুৎ যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিয়াছে। কখনও দাঁড়াইয়া কখনও বসিয়া কখনও টলিয়া পড়িতে পড়িতে প্রাণপণে সামলাইয়া লইয়া ক্রমশই উপরের দিকে উঠিয়া অনেকখানি রাস্তাই সে অতিক্রম করিল, কিন্তু আর যেন শক্তিতে তার কুলাইতে ছিল না, পরাভবের ঘৃণায় ও গভীর আতঙ্কে তার শ্রম-শ্রান্ত দুর্ব্বল দেহ শিহরিয়া কাঁপিযা উঠিতেছিল, ঘামে সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া জল ঝরিতেছে, হাত পায়ের তলা ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে, এইবার বুঝি সে সংজ্ঞা হারাইযা পথের পরেই লুটাইয়া পড়ে,—একখানা মোটর গাড়িবও দেখা নাই যে তার তলায় মাথাটা পাতিয়া দেয়!"

আকাশে নিকষ কালো ঘন মেঘ জমাট হইযা রহিয়াছে। হিম কুহেলিকায সকালবেলার সেই মনমুগ্ধকর সুরম্য পর্ব্বত উপত্যকা, দূরের ও অদূরেব পর্ব্বতমালা সমস্তটাই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, যেন বিশ্ব পৃথিবীর আগাগোড়াই তার অবস্থার ও অন্তরের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা হইয়া সীমাহীন নৈরাশ্যের অন্তহীন অন্ধকার সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

পাশেই ঘোড়ার খুরের খুটখুট শব্দ পাওয়া গেল, বিদ্যুৎ চকিতে চমকিয়া উঠিয়া বিস্ফারিত সভয় চক্ষে চাহিয়া দেখিল,—না! একজন আলখেল্লা পরা লোক, মনে হইল প্রবীণ এবং লামা শ্রেণীরই যেন। বিদ্যুতের অস্পষ্ট আর্ত্ত-আহ্বানে তিনি সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া তার কাছে আসিলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে উহাকে প্রশ্ন করিলেন, "ক্যা হুয়া?"

বিদ্যুৎ দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, কাঁদিয়া তাঁর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আপ মেরা পিতা, মুঝে আপ আশ্রয় দি' জিয়ে।"

লোকটি তাহাকে সহানুভূতির সহিত হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন, পুনশ্চ সেই প্রশ্নই করিলেন, "হুয়া কেয়া ?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিদ্যুৎ বলিল, "পিছে বোলেঙ্গী, কোই দুষমন হামকো বন্‌করকে রাখাথা, হাম ভাগ আয়া, ম্যয়কো ছিপায়কে রাখ দেনা। হাম আপকা বেটী হো চুকা, আপিকো হাতমে মেরা ইজ্জত হাম দে দিয়া।" অঝোরঝরে সে কাঁদিতে লাগিল। কতকাল, কতকাল, হয়ত জীবনে কখনও সে এমন করিয়া কোনদিনই কাঁদে নাই!—অভিমানের কান্না হয়ত কচিৎ কখন কাঁদিয়া থাকিতে পারে, তা'ও বড় একটা নয়। তার দৃপ্ত বলিষ্ঠ স্বভাবে কান্না তো সহজে আসে না। কান্নাতেও এত সুখ নিহিত থাকে ?—আশ্চর্য্য !"

লামা,—হয়ত তিনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন লামাই হইবেন ; তিনি সেই মেঘ স্তম্ভিত নিরন্ধ্র নিকষ-কালো আকাশের দিকে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া গভীর স্বরে উচ্চারণ করিলেন, "ঈশ্বর সাথ্‌ সী রহো !" সেই হস্তই বিদ্যুতের দিকে প্রসারিত করিয়া প্রগাঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "বেটী ! ডরো মাৎ ! মেরা সাথ আ যাও।"

উহাকে ধরিয়া নিজের টাট্টু ঘোড়াটায় তুলিয়া দিয়া নিজের গাযে চাপানো গরম জোব্বাটা দিয়া তার সর্ব্বাঙ্গ বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিলেন, তারপর ঘোড়ার মুখ ধরিয়া উহাকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। জন্তুটিও তার অবস্থা বুঝিয়াই যেন যথাসাধ্য জোর কদমে চলিতে লাগিল। অনেকখানি পথ চলিয়া একটি বেগবান ঝরণার ধারে পৌঁছিলে ঘোড়া থামাইয়া একটি পাত্রে জল আনিয়া উহাকে পান করাইলেন, নিজের ঝুলি হইতে বাহির করিয়া একটি অর্দ্ধ মলিন মোটা খদ্দরের ধুতি বিদ্যুৎকে পরিতে বলিয়া তার রেশমী শাড়ী ও গায়ের চাদরটা ঐ ঝরণা নিঃসৃত জলধারার মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধমগ্ন গুল্ম পাদপ বিজড়িত একটা অনতি উচ্চ প্রস্তর স্তূপের উপর

নিক্ষেপ করিলেন। ঝরণা হইতে নামিয়া একটি অনতি প্রশস্ত জলধারা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া নীচের দিকের গভীর খাদে নামিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে মৃদু মৃদু কুলু কুলু ধ্বনির সঙ্গে নিম্নাবতরণের অনিচ্ছুক আর্ত্তরব এই মধ্যরাত্রির নীরব স্তব্ধতায় আহত হইয়া পর্ব্বত কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, যেন একটা ভয়ার্ত্ত করুণ বিলাপেরই মত।

বিদ্যুতের জুতা জোড়াও সেইখানে ফেলিয়া দিয়া পুনশ্চ তাহাকে ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া দিলেন, তারপর তিনি সোজা পথ ছাড়িয়া বিপথে, গভীর ঘন গুল্ম পাদপ আচ্ছাদিত জঙ্গলের মধ্যস্থিত পায়ে চলা একটি সঙ্কীর্ণ পথ-রেখা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই পাকদণ্ডীর চড়াই-উৎরাইয়ের পদে পদে পদস্খলনের শঙ্কাযুক্ত সে আঁকা বাঁকা কঠিন-বর্ত্মটি কোন্ সীমারেখার উদ্দেশ্যে, কত দূরে গিয়া শেষ হইয়াছে, কে জানে! হয়ত এই একান্ত এলোমেলো সন্দেহে ও শঙ্কায আশঙ্কিত বন্ধুর পন্থার শেষ তখনও কোন নির্দ্ধারিত সীমানায় গিযা পৌছায়ই নাই। সেই অজানা অচেনা বিপথে অগ্রসর হইয়া কোন অনির্দ্দেশ্য ভাগ্যের ঘুর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িতে চলিল সে কথা সে একবার ভাবিয়া পর্য্যন্ত দেখিল না।

অশ্ব ও অশ্বচালক আরোহী সমেত ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর নিবিড় ও নিচ্ছিদ্র জঙ্গলের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। তাঁদের আর দেখা গেল না।

১২

সুরঞ্জনের বাংলোর সাম্‌নেকার লম্বা বারান্দায সুরঞ্জন ও ক্ষণপ্রভা খেলনার বল লইয়া বল খেলিতেছিল। ক্ষণ বলিয়া উঠিল, "বাব্বি হেলে ভালো, বেবি দোল!"

—সেটাকে হাসি না বলিলেও ক্ষতি হয় না, সে একটা অন্তর্নিহিত মনো

ভাবের চকিতপ্রভা বিকাশ মাত্র! সুরঞ্জন সেই ভাবে ঈষৎ হাসিলেন, "তাই তো মায়ি তোর বাবাটা শুধু হারতেই আছে, না?"

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জোয়ারদার প্রবেশ করিলেন, একমিনিট ওদের খেলা দেখিতে না দেখিতেই বলিলেন, "বেরুবার যে কথা ছিল।"

সুরঞ্জন সচকিত হইয়া উঠিলেন, "ওঃ হ্যাঁ, তাইতো! আচ্ছা আমি এক্ষণি আসছি। ক্ষণু! তুমি তোমার ঝির কাছে যাও তো মায়ি!"—

ক্ষণপ্রভা বাপকে জড়াইয়া ধরিল, "ঝি, না, বাবি, বাবি—"

সুরঞ্জন মেয়েকে কোলে লইয়াই ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং অল্প পরেই বেশ পরিবর্ত্তনান্তে ফিরিয়া আসিলেন। মোটর দাঁড়াইয়াছিল, দুজনেই কথা কহিতে কহিতে আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। ভিতর হইতে ক্ষণপ্রভার কান্না শোনা যাইতেছিল, "বাবি দাবে বাবি! বাবি!"

কিছুক্ষণ পরে ক্ষণপ্রভার নতুনঝি শান্তমণি অনেক ভূজং দিয়া তার কান্না থামাইয়া কোলে করিয়া উহাকে বাহিরে আনিল। বেলা শেষের রাঙ্গা রোদে তখন চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই কমলা-রাঙ্গা রোদের খানিকটা আভা বাংলোর বারান্দাতেও ঠিকরাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর সামনে ও দুপাশে বিদ্যুতের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রচিত হইয়াছিল পূর্ব্ববর্ত্তীর অযত্ন অরক্ষিত উদ্যানের নব কলেবর। মরশুমী ফুলের বেডগুলি সযত্ন সম্বর্দ্ধনায় এখনও সতেজ ও অজস্র পুষ্প-স্রাবী হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ ধারে লনটার চারপাশ বেড়িয়া ক্যানার উজ্জ্বল সোণালী, আরক্ত লোহিত, কষিত কাঞ্চন সন্নিভ, হরিদ্রা এবং ঝকঝকে গোলাপী ফুলেরা সেই তার মতই গর্ব্বিত মহিমায় মাথা খাড়া করিয়া আছে। সাম্নের এবং বাঁ ধারের ফ্লাওয়ার বেডগুলি ডালিয়া, কসমিয়া, লাক্স, পিঙ্ক, ক্যানডিটফ ট, ক্রিশেনথিমম, অ্যাষ্টার, সুইটপি, ভায়োলেট,

হ্যাষ্টেসিয়া ইত্যাদিতে অপরূপ হইয়া রহিয়াছে। বাতাসের মৃদু দোলা আর শান্ত সূর্য্যের বিচিত্র আলোয় তারা আরও অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। এমনই সময় এমনই দৃশ্য বিদ্যুৎ এই বারান্দায় বসিয়া অথবা ওদের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুটি চোখ ভরিয়া ভরিয়া দেখিয়া লইত, হয়ত প্রাণের মধ্যেও তার ভাবপ্রবণ সৌন্দর্য্য পিয়াসী চিত্ত খানিকটা ছাপিয়া লইয়া কোন স্বপ্ন রাজ্যই বা রচনা করিত, শুধু অভাব ঘটিত পাশে তাঁর বর্ত্তমানতা, যাঁকে সে একান্তচিত্তে কামনা করিত যাঁকে ইচ্ছামত পাইত না বলিয়া অভিমানে গুমরিয়া মরিত! এদের রূপের কথা, বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রতার বিষয়ে কা'র সঙ্গে কথা কওয়া যায়? আলোচনা কার সঙ্গে করে?—

আজও সবই যেমন ছিল তেমনি আছে, শুধু যে তাদের এই অনবদ্য রূপের নেশায় পাগল ছিল, যার চিত্ত প্রসাদনার্থে এদের এত উন্নতি সেই-ই এদের এই পূর্ণ পরিণতি দেখিতে অপেক্ষা করিল না, এই ক্ষণপ্রভার মতই তাদেরও শৈশব জাবনে ছাড়িয়া চলিয়া গেল!

বাগানের লোহার বেঞ্চে বসিয়া ও মেয়েকে বসাইয়া শান্তমণি বলিল, "বস তো ধন! আমি তোমায় পানের খিলি বানিয়ে দেই।"

ক্ষণপ্রভা দুহাত নাড়িয়া প্রবল আপত্তির সঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল, "পাতা পান না,—নৌতো তলে দাও—"

শান্ত কহিল, "আমি ত নৌকো করতে জানিনে মণি! সে বাবা দেবে'খন,—"

ক্ষণপ্রভা বাবার নামে তৎক্ষণাৎ পোষা বিড়ালের মতই শান্ত হইয়া গেল, হাসিয়া উঠিয়া হাতে তালি দিয়া কহিয়া উঠিল, "বাবা দেবে! বাবি দেবে! বাবি আতবে।"

শান্ত কহিল, "ঐ হুথাকে ও গুলান্ কি ফুল ফুটলো গো? চলো চলো দেক্ষে আসি।"

কিছুক্ষণ বাগানে বেড়াইয়া একগাদা ফুল ছিঁড়িয়া ওরা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সেই কমলা-রঙ্গা সূর্য্যকিরণ পশ্চিম দিগন্ত হইতে মুছিয়া গিয়াছে, ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে মিশ্রবর্ণ সাদা সাদা মেঘ আকাশের নিজস্ব রংয়ের গায়ে গায়ে দাগ কাটিতেছিল। সুরঞ্জন ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, বারান্দায় ছোট টিপয়ের উপর তাঁর এক পেয়ালা গরম চা এবং ক্ষণপ্রভার জন্য ছোট্ট পেয়ালায় গরম দুধে ধোঁয়া উড়িতেছিল।

সুরঞ্জন ডাকিলেন, "ক্ষণুমা! বাবিকে দুধ খাওয়াবে এসো, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।"

ক্ষণপ্রভা ছুটিয়া আসিয়া তার ছোট্ট চেয়ারটায় বসিযা পড়িল এবং দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া ডাকিল, "বয়! ক্ষুণু তা' খাবে, বাবি দুদু খাবে, বদল দেও।"

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

একখানা পুরাতন খবরের কাগজ কোথা হইতে আনিয়া ক্ষণপ্রভা আব্দার ধরিল, "নৌত কলে দাও তো বাব্বি! গুড্ বাব্বি! ছোনা বাব্বি!" গলা জড়াইয়া ধরিয়া বাপকে চুমু খাইল।

বাপ মেয়েকে বুকে জড়াইযা প্রতি চুম্বনান্তে কোলে বসাইয়া লইলেন,—খবরের কাগজখানা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "নৌক ভাসাবি কোথা? জল কই? আচ্ছা তুমি একটু তোমার চেয়ারে গিয়ে বসো, আমি নৌক করি।"

শান্তমণি পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, "উত্তর দিল, "ওমা! তা' বুঝি জানেন নি, বাবা? সে মালির সঙ্গে সব ঠিক হয়ে গ্যাছে যে। ওর গাছে জল দে'বার চৌবাচ্ছায় নৌক ভাসানো হবে। মেয়েটি কি আপনার কম স্যায়না! হতো ব্যাটাছেলে আপনার নাম রাখতো।"

সুরঞ্জনের বক্ষ মথিত করিয়া একটা চাপা সুদীর্ঘ শ্বাস স্বতোত্থিত

হইল। তাঁর নাম? ওতো জানে না, কতখানি শক্তির উৎস হইতে এর সৃষ্টি!

কাগজখানা ভাঁজ করিতে গিয়া তাঁর চোখে পড়িল সেখানার তারিখ সেই ঘটনার মাত্র একদিন পরের এবং দৃষ্টি পড়িল একটি সংবাদের উপরে। সাধারণ টানা খবর নয়, বড় অক্ষরে ছাপা দার্জ্জিলিং সংবাদ বলিয়া ওঁদের ষ্টাফ রিপোর্টারের প্রেরিত।

"গত পরশু অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত্রে এখানে একটা আকস্মিক ভীষণ দুর্ঘটনায় সারা সহরেই একটা গভীর দুঃখের প্রগাঢ় ছায়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মহলে। সেইদিন অপরাহ্নেই মিষ্টার ও মিসেস্ ঘোষাল এখানে আসিয়া পৌছান। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা বিশেষ ধনী ব্যক্তি। প্রথম রাত্রেই ঘন কুয়াশায় চরিদিক আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মিসেস্ ঘোষাল সে অবস্থায় কেন যে হোটেলের কাহাকেও না জানাইয়া একা পথে বাহির হইয়া ছিলেন কিছুই বুঝা যায় না! বহু পথ অতিক্রম করিয়া··· একটা খাদে,—খুব সম্ভব পদস্খলিত হইয়াই পড়িয়া যান। পরদিন প্রভাতে তাঁহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করা হয়। অবস্থা খুবই সাঙ্ঘাতিক হইলেও এখন পর্য্যন্ত তিনি জীবিতা আছেন। মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যই নাকি মহিলাটি খেয়ালবশতঃ অজানা পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এইভাবে বিপন্না হইয়াছেন। হোটেলের ম্যানেজারের সাক্ষ্যে জানা গেল ঐ মহিলাটি যে সম্পূর্ণরূপেই বিকৃত মস্তিষ্কা তাহাতে কোন সংশয় নাই। 'মিসেস্ ঘোষাল' বলিলেই তিনি একেবারেই ক্ষেপিয়া উঠেন। স্বামীর সহিত তাঁহার যে আদৌ সদ্ভাব নাই সেকথাও তিনি পুলিসের নিকট সাক্ষ্যে বলিয়াছেন। এমন কি, একঘরে বাস করিতে পর্য্যন্ত সম্মত হ'ন নাই। মহিলাটি নাকি অনবদ্য রূপসী ও বিশেষরূপেই শিক্ষিতা। যে ক'জন তাঁহাকে দেখিয়াছে সকলেই হায় হায় করিতেছে। যাহা হৌক হাঁসপাতালে

রাখিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা ও চিকিৎসা চলিতেছে। মিঃ ঘোষাল মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।"

সুরঞ্জন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। খবরের কাগজখানা তাঁর হাত হইতে খসিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। ক্ষণপ্রভা কোন খেয়ালে বাগানে নামিয়া গিয়াছিল তাই তাঁর সে অবস্থা সে জানিতে পারে নাই—বাধাও দেয় নাই। বহুক্ষণ পরে সসংজ্ঞ হইয়া উঠিয়া কাগজখানি তুলিয়া লইয়া তারিখটা দেখিয়া লইলেন, সেই রাত্রেরই পরের রাত্রের ঘটনা ঐ সংবাদদাতার সংবাদে উল্লিখিত হইয়া ছিল, তারপর সুদীর্ঘ তিনটি মাস চলিয়া গিয়াছে! সুরঞ্জন কি এতকাল নিদ্রিত ছিলেন? তাঁর বুকখানা তীব্র আক্ষোভে আকস্মিক জোয়ার লাগা জলস্রোতের মতই সবেগে ফুলিয়া উঠিল, এবং প্রচণ্ড একটা শ্বাসরোধকারী অন্তর্ব্বায়ু তাঁর নিরুদ্ধ প্রায় শ্বাস যন্ত্রটাকে ঠেলিয়া তীব্র বেগে বাহির হইয়া আসিল। সঘন কম্পিত ঠোঁট দুটাকে কঠিন বলে স্ফুটনোন্মুত চাপিয়া ধরিয়া তিনি তখন দাঁত দিয়া আকুল আর্ত্তনাদটাকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া রাখিতে চাহিতে ছিলেন, যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের একমাত্র স্ফুট-ধ্বনি—

বিদ্যুৎ!—বিদ্যুৎ!! বিদ্যু!!!

১৩

দার্জ্জিলিং হাঁসপাতালের ভিজিটিং ঘরে সুরঞ্জনের সহিত সেই পূর্ব্বো-লিখিত অ্যাটেণ্ডিং ডাক্তারটির কথা হইতেছিল। ডাক্তার একান্ত সহানুভূতি-পূর্ণ ম্লান ভাবেই কথা কহিতেছিলেন, কহিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় মিঃ চ্যাটার্জ্জী! অতবড় ডেনজার কাটিয়ে উঠে মেয়েটি শুধু শুধু কিনা জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন! আর তো কিছু উন্মাদ লক্ষণ আমি তাঁর মধ্যে দেখতে

পাইনি, শুধু স্বামীর প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড বিরাগ এবং তীব্র বিদ্বেষ। তাঁর নাম করলেই যেন উদ্দাম হয়ে উঠতেন, বাড়ী যাবার সময় আসাতে একদিন একা হতেই বাথরুমে গিয়ে বাসী ঠাণ্ডা জলে স্নান করে ভিজে কাপড়ে মাটিতে পড়ে থাকেন, অবশ্য দারুণ দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছিত হয়েই পড়েছিলেন, তা'তেই ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হয়ে যায়। সেও একমাস লাগে সামলাতে। কিন্তু শেষটায় হলো কি, আর তো এখানে ধরে রাখা যায় না, আর সেই হলো তাঁর কাল! যেদিন সকালে বাড়ী ফের্ব্বার কথা, তার পূর্ব্ব রাত্রে কি করে যে সেই দুর্ব্বল শরীরে অতখানি চড়াই উৎরাই উঠে নেমে, অতখানি পথ গিয়ে ওখানে পৌছলেন, সে যেন এক হেঁয়ালি বলেই আমাদের মনে হয়! দার্জ্জিলিং তাঁর না'কি অচেনা জায়গা নয়, পথ ঘাট সবই তিনি চিনতেন। ওঁর প্রথম বারের পতনটাকেও আমি মনে করি, আকস্মিক নয় স্বেচ্ছাকৃত।"

সুরঞ্জন বহুক্ষণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ থাকিলেন, তারপর বহুকষ্টে উচ্চারণ করিলেন।

"মৃত্যুই নিশ্চিত?"

ডাক্তার উত্তর দিলেন, "তা ছাড়া আর কি বলবেন? ঝর্ণার জলটা যেখান থেকে অতলস্পর্শ গভীর গহ্বরে নেমে গেছে ঠিক তারই পাশে ওঁর স্যাণ্ডেল জোড়া পড়ে ছিল, একটা চাদর এখান থেকে গায়ে জড়িয়ে গেছলেন, সেটাও ঠিক পাশের কাঁটাঝোঁপে ঝুলছিল। ঝর্ণার ধারে জুতোর দাগও দেখা যায়। আহা! মিঃ ঘোষালের সে কি প্রাণফাটা কান্না! ঐ খড়েই লাফিয়ে পড়তে যান আর কি, ধরে রাখা যায় না। বহু অনুসন্ধানে এ খবরও তো চার দিন পরে জানা গেল। সে এক বিশ্রী ব্যাপার! এইতো সবে দিন পাঁচ ছয় আগেই ভাড়া নেওয়া বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে ভাল ভাল ফার্নিচারগুলো যা' তা' করে বেচে বা বিলিয়ে দিয়ে

বহু জিনিষ আমাদের এই হাঁসপাতালে দান করে ফিরে গেলেন ঘোষাল ভদ্রলোক। বেচারীর বুক যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গ্যাছে। মেয়েটিও তো ছিলেন সকল দিক দিয়েই অসাধারণ!—আপনাদের এত বড় শোকে সান্ত্বনা দে'বার সাধ্য আমার নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাব তিনিই আপনাদের, আর সেই দুর্ভাগিনীকে যেন শান্তি দেন।"

সুরঞ্জন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত স্তব্ধ থাকিয়া সহসা যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন, নিদ্রালু স্বরে স্খলিতকণ্ঠে কহিলেন, "তাই কর্ব্বেন! আমার হয়ত সে অধিকারও নেই। আপনি তার সব চেয়ে দুঃসময়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, আমি কিছুই করি নি,—হয়ত তেমন কোন চেষ্টাও করিনি। ভগবান আপনারও আপনাদের মঙ্গল করুন। বিদায় ডাক্তারবাবু! যাই—"

সুরঞ্জন চলিয়া গেলেন, ধীর মন্থর পদেই বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার নিঃশব্দে গভীর বিস্ময় ভরে তাঁর গমন পথের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। প্রবীণ চিকিৎসকের মনে হইল, তাঁর বাহিরের স্থৈর্য্য তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়! এই সুদৃঢ় সংযমের সৃষ্টি হইয়াছে আজন্মের তপস্যার ফলে, সহজে এ জিনিষকে আয়ত্ত করা যায় না। আত্মগতই কহিলেন, "কিছুই বুঝলাম না। ব্যাপারটা যেন ঘোর একটা রহস্যের মত। মেয়েটি কি সত্যি পাগল ছিল? মিঃ ঘোষাল তবে কি ওঁর স্বামী ন'ন? কিন্তু সে কেমন করে হবে? অত ভদ্র, ওই অগাধ ভালবাসা,—কিন্তু ইনি কে? ওঁদের সঙ্গে এঁর কি সম্পর্ক তা'ও তো কিছুই বল্লেন না। মনে মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েছেন, সেও তো স্পষ্টই দেখতে পেলাম। বোন বা কোন নিকট আত্মীয়া হ'লে সেকথা না বলবার কি ছিল? বল্লেন, এতদিন পরে একটা পুরনো খবরের কাগজের খবর থেকে সম্প্রতি মাত্র জানতে পেরেছেন। হয়ত মেয়েটি আসলে পাগল

ছিল না, মিঃ ঘোষালও হয়ত তাঁর স্বামী ছিল না, কোন গভীর ষড়যন্ত্র করে—”

ডাক্তার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, বার কতক ঘরের মধ্যেই পাইচারী করিয়া আসিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “নাঃ! মীমাংসা কিছুই করা গেল না। আর করেই বা কি হবে? যা হ’বার সেতো হয়েই গ্যাছে! ঐ সংবাদপত্রখানা যদি সময় মতন ওঁর হাতে পড়তো হয়ত একটা সুমীমাংসা হতেও পারতো। হবে না বলেই এত বিলম্বে উনি জানতে পারলেন।”

একটি ছোকরা ডাক্তার অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একখানা খোলা দৈনিক সংবাদপত্র হাতে ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল ও প্রায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘দেখেছেন স্যর! কি অদ্ভুত কাণ্ড! কাগজে বেরিয়েছে, সেই প্রিয়ব্রত ঘোষাল তাঁর কলকাতার ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের ও চৌরঙ্গী রোডের বাড়ী, দেশের যাবতীয় সম্পত্তি সমস্তই চ্যারিটির জন্যে ট্রষ্ট করে দিয়ে পিস্তলের গুলিতে গত সন্ধ্যায় আত্মহত্যা করেছেন। স্ত্রীকে ভালবাসার কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত !!”

পশ্চিম প্রদেশের একটি জেলায় জিলা-জজের বাড়ীখানি বিরাট বা বিশাল নয় এবং পিছনে তার ঐতিহাসিক গৌরবের দাবী-দাওয়া না থাকায় অনতি-বৃহৎ এবং রুচি-সম্মত ভাবে বর্ত্তমান শতাব্দিতে নির্ম্মিত ছিমছাম একটি সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সেটিকে সুরম্যই মনে হইত। দূরে দূরে ছোট একটা পর্ব্বতশ্রেণী বাংলোর বারান্দায় বসিয়াই দেখা যায়। পাহাড়টা বেশ একটু দূরে বলিয়া তা গায়ের উপরকার শ্যামল বৃক্ষ গুল্ম লতাজালের সঙ্গে সুপরিচিত হইবার উপায় কিছু নাই। নীল মেঘের কোল ঘেঁসিয়া একটা আ-নীল উচ্চাবচ সমান্তরাল রেখা কোথা হইতে আসিয়া কোন ধারে চলিয়া গিয়াছে এইটাই শুধু বোঝা যায়। পাহাড়ের উচ্চতা বেশী নয়, তবে তার দুটো একটা চূড়া এক গর্ব্বোদ্ধত ভাবে মাথা তুলিয়া তাদের সঙ্গে নামিয়া আসা শুক্তি শুভ্র মেঘপুঞ্জের ক্রীড়া-সহচর হইয়া নাগরিকদের কৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। অস্ত-সূর্য্যের কমলালেবু ও বস্‌রাই গোলাপের রংয়ের সংহত রশ্মি বর্ণলেখা যখন সেই সাদা বরফের মত মেঘগুলাকে রঞ্জিত করিয়া দিত, তখন নীলাম্বুধী নীলাকাশ তলে তার সৌন্দর্য্য নয়ন লোভন না হইয়া পারিত না।

এ নদী নামকরা বড় কোন নদী নয়। ঝুরু ঝুরু ঝরিয়া পড়া কুলু কুলু গান গাওয়া একটি প্রশান্ত পার্ব্বত্য তটিনী মাত্র। হয়ত ঐ পর্ব্বতশ্রেণীরই কোনও এক অজ্ঞাত বক্ষ-পীযূষ হইতে ক্ষীণাঙ্গী ঝরণা রূপে নামিয়া আসিয়া উহারই কোলে কোলে চলিতে চলিতে হঠাৎ বাঁক ঘুরিয়া পথ

ভুলিয়া এই বাংলোর অনতি দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। অন্য সময় এ নদীতে এক বুক জল থাকে কি না থাকে, বর্ষা আসিয়া যখন অকৃপণ হস্তে তার জলের অফুরন্ত স্বর্ণ ভৃঙ্গারের সঞ্চিত সলিল পৃথিবীর তপ্ত বক্ষে মাতৃস্নেহের মত অজস্র ধারে ঢালিতে থাকে, ছোট বলিয়া এ'ও তার সেই স্তন্য সুধা হইতে বঞ্চিত হয় না। দুকূল ছাপাইয়া এই বাংলো বাড়ীর বাগানের ঠিক নীচে প্রচীরটির তলায় আসিয়া ছলছলাৎ ছলছলাৎ শব্দে যেন করুণ মিনতি ভরিয়াই তার গমন পথের বাধা অপসারণের জন্য অনুরোধ জানাইতে থাকে। জজ-দুহিতার তত্ত্বাবধানে রচিত বাগানটি,—যার মধ্যে গোলাপের সঙ্গে অনেক জাতি গোত্রের ফুল ফুটিয়া আছে, ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় মাথা উঁচু করিয়া রজনীগন্ধারা যেখানে দোল খায়, বৃষ্টির দাপটে শুচি-শুভ্র কোমল সাদা দোপাটী তার বহু দল পাপড়ীহারা হইয়া খসিয়া পড়ে, চাঁদের আলোয় গৈরিক জলকে যখন স্বর্ণসূত্রের টানা দেওয়া টিস্যু শাড়ী বলিয়া ভ্রম জন্মে, গাছের শ্যামল ছায়াগুলি তার গায়ে গায়ে প্যাটার্ন তৈরি করিয়া দেয়, আবার ভোরবেলার শিশিরে ভেজা সেফালিকা ধারার মতন বর্ষিত হইয়া উগ্র বাদল বায়ুকে গৌরব মন্থর করিয়া তোলে, তখন সেখানে প্রবিষ্ট হইবার লোভ তো জড়-চেতন সবাকারই থাকার কথাই।

এখানের বাড়ীর পিছন দিক্‌কার নদী মুখান্ এই বারান্দাটিই এই বাংলো বাড়ীর অধিবাসিনী জজের মেয়ের সমধিক প্রিয় স্থান। এখানে বসিয়া সে জল-তরঙ্গের দৃশ্য, খেলা ও প্রকৃতি ঠাকুরাণীর লাস্য-লীলা সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া অনুভব করে—উপভোগ করে। অস্তসূর্য্যের অঙ্গ হইতে ঠিকরাইয়া পড়িয়া উজ্জ্বল লাল আলো সমস্ত প্রকৃতিকে নববধূর মতই লাজ রক্তিম করিয়া দেয়, গাছের পাতার সবুজ রং আকাশের প্রগাঢ় নীল, নদীর কখন আ-পীত, কখন সু-স্বচ্ছ জল-রেখা সব কিছুই সেই অপূর্ব্ব কান্তিময় রক্তিমাতলে লোহিতাভ হইয়া

যায়, আবার আস্তে আস্তে সেই অপর্য্যাপ্ত রঙের খেলা সেই অপূর্ব্ব আবিরোৎসব সন্ধ্যার সাবধানী আঁচলের তলায় আত্মগোপন করে। দূরের পাহাড় অনতি দূরের বনশ্রী অদূরের কুঙ্কুমরাঙা বালুতট সব কিছুকে চাপা দিয়া নিজ কৃতকার্য্যের জন্যই যেন সরম কুণ্ঠিতা সন্ধ্যা-বধূ সন্তর্পণে,—মনে হয় যেন তুলসী মূলে দীপ জ্বালিবার কথাটিই উহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! স্বপ্ন সম্মোহিতার মোহময় চিত্ত বিভ্রম সহসাই কাটিয়া যায়, সে তখন তার নতুন পড়া পাঠের মতই নতুন পাওয়া সান্ধ্য-কর্ত্তব্য সমাধা করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়া পড়ে।

ইতিমধ্যে সুদীর্ঘ পনেরোটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অনাদি অনন্ত কাল প্রবাহের কাছে এই পঞ্চদশ বর্ষ হয়ত কিছুই নয়, কিন্তু সীমাবদ্ধ মানব জীবনে এই কাল্টুকুই যে যথেষ্ট দীর্ঘ এবং বহুতর সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় চলিতে চলিতে স্খলিত জড়িত ব্যথিত চরণ ও শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহমন লইয়া এই কালকে অতিক্রম করিতে করিতে রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং কালেক্টার সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যাঁর সম্বন্ধে শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া বলা চলে,—

"জনানাং যঃ প্রশংসন্তি যঃ প্রশংসন্তি পণ্ডিতা,
রাজানং যঃ প্রশংসন্তি সঃ পার্থ! পুরুষোত্তম।"

সেই সর্ব্বত্র প্রশংসিত জেলার পর জেলা সমাহর্ত্তা তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবন মধ্যাহ্নে রাহুগ্রস্ত রবির মতই অকস্মাৎ স্তিমিত হইয়া গেলেন। বৈদেশিক ও পরম পক্ষপাতপূর্ণ কড়া শাসনের দিনেও যে সময় তাঁহাকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর পদ প্রদানের জল্পনা-কল্পনা সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্টে

চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই কর্তৃপক্ষকে পরম বিস্মিত এবং হয়ত বা ঈষৎ দুঃখিত করিয়াই অকস্মাৎ তিনি অ্যাকটিভ-লাইন পরিত্যাগ করিয়া সিবিল লাইনে স্বীয় কার্য্য পরিবর্ত্তিত করার জন্য দরখাস্ত পেশ করিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কাছেও ইহা আশ্চর্য্যতর ঠেকিল, এবং তখনকার চীফ সেক্রেটারী তাঁহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আদেশ দিলেন। তারপর তাঁর শরীর মনের অবস্থা দেখিয়া এবং ইহার মূল কারণ শুনিয়া তিনি তাঁহাকে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করা সমীচীন বোধ করিলেন না। বোর্ড অব রেভেনিউ-এর সেক্রেটারী থাকার সময় তিনি একবার একটি টি পার্টিতে বিদ্যুৎকে দেখিয়া ছিলেন; তার গান ও বীণ্ বাজানো শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। তার অ্যাক্সিডেণ্টাল মৃত্যুর সংবাদে আন্তরিক ভাবেই দুঃখিত হইয়া তাঁহার এই মর্ম্মান্তিক অবস্থায় কর্ম্মবহুল সার্ভিস তাঁর পক্ষে সঙ্গত হইবে না বুঝিয়া জজিয়তীতেই বাহাল হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। উপরন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে বাংলাদেশের চেয়ে উত্তর পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী হইবে বলিয়া তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বিদ্যুতের মৃত্যুর পর ফিরিয়া আসিয়া সুরঞ্জন তিন মাসের ছুটী লইয়া তাঁর একমাত্র সহোদরা গোলাপ সুন্দরীর কাছে কাশ্মীরে চলিয়া গিয়াছিলেন। একখানা মাত্র বাংলা দৈনিকের রিপোর্টারের দেওয়া খবরটা কেইবা পড়িয়াছে, আর পড়িলেই বা ভিতরকার সংবাদ জানা না থাকিলে কি করিয়াই বা কে কি বুঝিবে! সুরঞ্জনের দার্জ্জিলিং হইতে ফেরার পর,—অর্থাৎ তিন মাস পরে সকলেই জানিল, মিসেস্ চ্যাটার্জীর মাথার একটু গোলমাল ঘটিয়াছিল, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

মহিলা সমিতির সভ্যারা সমস্বরে মন্তব্য করিলেন, "আহারে! আমরা কত নিন্দে করেছি, আসলে ছিল ঐ মাথার গোল! মধ্যে মধ্যে অত

যে চটে যেতেন, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতেন, অত সখের অভিনয় ফেলে ছুটে চলে গেলেন ও সবই পাগলামীর ঝোঁক!”

কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা ঘুরিয়া হৃতস্বাস্থ্য অকাল প্রৌঢ় সুরঞ্জন প্রায় পাঁচ বৎসর পরে তাঁর পদোন্নতির সম্ভাবনার সংবাদে নিজের শরীর মনের অক্ষমতা বুঝিয়াই সার্ভিস বদলাইয়া লইলেন। অতিরিক্ত খাটুনী তাঁর শরীরে সইতে ছিল না, অথচ কাজই তো তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং ঐ মাতৃহীনাকে অনাথিনী করিয়া অনুতাপ দগ্ধ জ্বালাময় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ যাহাতে এত শীঘ্র না করিতে হয়, সে চেষ্টাও তো তাঁহাকে করিতে হইবে,—একমাত্র পিতা ভিন্ন এ জগতে এর যে দ্বিতীয় কেহ নাই।

গোলাপ অবশ্য তার পালন ভার লইতে আগ্রহ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু সুরঞ্জন কি লইয়া থাকিবেন? তাঁর বাঁচিয়া থাকিবার এ সংসারে এই তো একটি মাত্রই উপলক্ষ্য।

পশ্চিম প্রদেশের এই যে জেলা জজের বাংলোর কথা বলা হইতেছিল সে বাংলোটীতে সুরঞ্জন বাস করেন, তিনি এবং ক্ষণপ্রভা—কিন্তু সে এখন আর ক্ষণপ্রভা নাই, সে এখন সর্ব্বাণী। তার জন্মপত্রিকা বাহির করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার সময় নিজে পছন্দ করিয়া তার নাক্ষত্রিক নাম সর্ব্বাণীই সে স্কুল-রেজিষ্টারে লিখাইয়া আসিল এবং বাবাকে জানাইয়া দিল, “আজ থেকে আমায় আর ক্ষণ্ বলো না বাবা! ও কেমন যেন ভাল লাগে না, সবু বলে ডেকো, আমি সর্ব্বাণী।”

বাবা তাকে কোলে বসাইয়া কপালে চুমা খাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “তাই তো মা! তুমি ক্ষণপ্রভা কেন হতে যাবে, আমার সর্ব্বময়ী মা জননী সর্ব্বাণীই তো তুমি।”

সেই হইতে ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎপ্রভার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে,

সুবঞ্জনের ঘর জুড়িয়া বুক জুড়িয়া অধিষ্ঠিতা হইয়া আছে যে মেয়ে, সে তার সর্ব্বে-সর্ব্বময়ী মা জননী সর্ব্বাণী দেবী।

সর্ব্বাণী বাপের অপর্য্যাপ্ত আদরে এবং প্রচুরতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হইযাও বিগড়াইয়া যায নাই। মায়েব একরোখা জিদী স্বভাব পাইলেও বাপের বহু সুখ্যাত বিনয নম্রতারও তাব মধ্যে অভাব নাই। পদ প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্যের অহঙ্কার ও অহমিকা তার ছিল না, এদিক দিয়া সে হইয়াছিল বাপেব মত, তাই যখন যেখানে থাকিয়াছে ছোট বড় সকলেরই তাহাকে ভালবাসিতে ও তার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাইতে বাধে নাই। এখানে আসিয়া তার প্রথম দিকে নিঃসঙ্গতার জন্য একটু কষ্ট-বোধ হইয়াছিল। মাথার উপর দিগন্তবিসারী নীল আকাশ, দিগন্তে বিলীযমান-প্রায নীলাভ-ধূসর পর্ব্বতমালার রেখা, ছোট্ট নদীটির মাধ্যাহ্নিক খব রৌদ্রের ধবল আভা, প্রভাত রবির রক্তোজ্জ্বলচ্ছটা, সাযাহ্ন তপনের স্বর্ণদীপ্ত তরঙ্গের লীলা বিলাস এবং লতাগুল্মদের শ্যাম শোভা এসবই বেশ, মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে উন্মুক্ত চিত্তমন লইযা ডুবিয়া গিয়া তদাত্ম হইতে তাদের আন্তরিক ভাবে অনুভব ও উপভোগ করিতে সর্ব্বাণীর ভালই লাগে, কিন্তু তাই বলিয়াই তো সে আর সাগর-সৈকত বিচারিণী সংসার ও সমাজের বহির্ভূতা কপালকুণ্ডলা নয অথবা আশ্রমপালিতা শকুন্তলাও নহে যে, নব-পুষ্পিতা বনমল্লিকা ও কর্ণিকার বালাদের প্রেমে মজিয়া মানব সঙ্গ লিপ্সা ত্যাগ করিবে! তাই বা কেন? বনবাসিনী শকুন্তলার কি প্রিয়ম্বদা অনাসূযার মত দুইটি প্রিয় সখী ছিল না? পিসি-গৌতমী কি তার রোগশয্যার তত্ত্বাবধানে শান্তি জলের ঘট হস্তে আসিতেন না? অনেক সময় সর্ব্বাণী নিকটস্থ গাঢ় সবুজরংয়ের কাঁঠালী চাঁপার ঝোপের দিকে চাহিয়া কখনও বা ম্যাগনোলিয়া-গ্রাণ্ডি-ফ্লোরার অপর্য্যাপ্ত মধু-গন্ধী সুবাস আঘ্রাণ করিতে করিতে আনমনে

ঐসব কথাই চিন্তা করিয়াছে। দুজন নাই হোক একজন অনসূয়া অথবা শুধু একটি প্রিয়দর্শনা প্রিয়ম্বদা থাকিলেও তো তার কাজ চলিত, কিন্তু সে তো আর বাজারের মাল নয়, যে বাবার মাহিনার টাকা হাতে আসিলে মাস কাবারের বাজারের ফর্দ্দে লিখিয়া দিবে আর চাকর বা চাপরাসী কিনিয়া আনিবে!

—না! জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপ্রাপ্য তো নহেই। ঈপ্সিত বস্তু সহসা মিলিয়া গেল তো? সর্ব্বাণী খুব তাড়াতাড়ি বি. এ'টা পর্য্যন্ত পাশ করিয়া লইয়া ছিল। বাপের কাছে যথেষ্ট সাহায্য সে সেজন্য পাইযাছে। লক্ষ্মৌয়ে থাকিতে মিউজিক ক্লাশে সে ক্লাসিক গান এবং সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রবিদ্যা বীণ্ শিখিতে ছিল, মোটামুটি কাজ চালানো শিখিতে না শিখিতেই সেখান ছাড়িযা চলিযা আসিতে হইল। এখানে ভাল কলেজই নাই—তা আবার মেযেদের জন্য! সে এবার ঘরে বসিয়াই সংস্কৃত শিখিতে চায়। আই. এতে একটা পেপার সংস্কৃতের ছিল, তাইতে ভট্টিব দুটি অধ্যায় এবং বি. এ'তে মেঘদুতের উত্তর মেঘ সে পড়িয়াছে, সামান্য সামান্য বাছা বাছা শ্লোক সমষ্টি মন মাতায় মন ভরায় না। একজন প্রাইভেট মাষ্টাব খুঁজিযা মিলিল, সে শিবেশ্বর। সংস্কৃতে এম. এ. এবং এখানের হাই স্কুলে সংস্কৃতের টিচার। সেই শিবেশ্বরকে উপলক্ষ্য করিযা "ফাউ" পাইল, তার এতদিনের অম্বিষ্ট সেই প্রিয়বাদিনী প্রিয়ম্বদাকে। শিবেশ্বরের স্ত্রী মণিকা তার চাইতে বছর কতকের বড়, বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইলে কি হয়, ওদের সেজন্য সখ্যতায় কিছুমাত্র বাধিল না। সেই অসম-বন্ধুত্ব এতটাই জমিয়া উঠিল যে, তারা সামান্য দিন পর হইতেই আপনি ছাড়িয়া তুমি ধরিল এবং ত' একান্ত আগ্রহে মিসেস্ 'সারথেল' ছাড়িয়া মণিকা বলিতে ত করিল।

'মণিকা' নামটি সত্যই ডাকিবার মতন, সর্ব্বাণীর মত এখন খটখটে, এত বিদ্‌কুটে নয়। তা' হইলই বা বয়েসে বড় বা মাষ্টার মশাইএর স্ত্রী, অমন ভাল নাম রাখা কেন, যদি ব্যবহারেই না লাগিল? সর্ব্বজয়া বা জয়ঙ্করী হইলে কি সেই নাম আর সে ধরিত না কি? তার চাইতে মিসেস্ সারখেলও ভাল।

সর্ব্বাণীকে আজকাল আর কর্ম্মাভাবে ক্লান্তি-স্তিমিত করে না, সে সমুৎসাহিত মন লইযা—

"মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃশেষং দিগ্‌বারণ মদাবিলং—
হেমাদ্ভোরুহশস্থান্যাং তদ্‌বাপ্যোধাম সাম্প্রতম্॥"

ইত্যাদি পড়িতে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে প্ল্যান করিতে থাকে কাল ওদের যে নিমন্ত্রণ করিয়াছে মধ্যাহ্ন ভোজনের, তাহাতে নতুন কি কি পদ রান্না করিবে? বলা ভাল যে রান্না খাবাব তৈরি—ভাঁড়ার গুছান তার সঙ্গে দু কাঁটার উলের সেয়েটার ও চার কাঁটার পশমের মোজা সে তার এই এক মাত্র সখী ও সাথী মণিকার কাছেই শিখিতে সুরু করিয়াছে। এতদিন এসব তাহাকে কে' শিখাইবে? সকালে মালিকে দিয়া ফুল আনাইয়া মায়ের ছবিকে মালা পরানো, সন্ধ্যায় তুলসীমূলে দীপ জ্বালাইযা দেওয়া, বাপের বসিবার ঘরটি মহীশূরী চন্দন-ধূপে সুরভিত করা এ সবই তো মণিকার পরিকল্পনা এবং তাহারই অকৃত্রিম-সখ্যতার দান।—ভাগ্যে সে তাহাকে পাইয়াছিল!

ঘট
কাঁঠা

২

সেদিনের আকাশে কোন্ গ্রহ কোথায় ছিল, কে'ই বা তা' পাঁজির পাতা ঘাঁটিয়া দেখিতে গিয়াছে! শনি বা মঙ্গল, পাপযুক্ত রাহু অথবা অপর কোন স্বনামধন্য গ্রহরাজের ক্রূর বক্র দৃষ্টি মানব-ভাগ্য বিধাতার অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাদের জীবনের উপর সুদূর হইতে হানিয়া হাসিতেছিলেন কিনা অসহায় অজ্ঞ মানুষে সে খবরই বা কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইবে?—অনন্যসহায় এই একান্তবাসী নিরীহ পিতা পুত্রী যে উহাদের কোপ কুটিল নেত্রপাতের বিষযীভূত হইতে চলিয়াছেন, তাহা সেদিনেই জানা না গেলেও তারই সূচনা সেই বিশেষ দিনেই বিশিষ্ট ভাবে দেখা দিয়াছিল। শেষ আষাঢ়ের একটা অবিরত বর্ষণ জর্জর মেঘ-মেদুর দিবসান্ত, মেঘ-কুহেলিকায় সারা প্রকৃতিকেই একান্ত বিবর্ণমুখী ক্রন্দন বিবশা ও দারুণ অসুখী দেখাইতেছিল। বৃষ্টি জমা জল শাখা পত্র বিচ্যুত হইয়া বিরহিনীর বেদনাশ্রুর মতই জন-চিত্তকে অশ্রু সজল করিয়া তুলিতেছিল, তারই বুঝি বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বাদলা হাওয়া বহিয়া আনিতেছে? তবে ভালর মধ্যে এইটুকুই যে সারাদিন পরে বিদায়োন্মুখ রক্ত-রবি জোর করিয়া মেঘ ঠেলিয়া বারেক দালানের ইজিচেয়ারে শায়িত পিতা এবং উহারই অন্যপ্রান্তে পঠন-পাঠনশীল শিক্ষক ছাত্রীদের পানে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু সে দৃষ্টিও যেন তাঁর অন্যদিনের মত শুভদৃষ্টি নয়; রোদনা-রক্ত নেত্রের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির মতই তা'—মঙ্গলবার্ত্তা এ দৃষ্টি বহন করে না।

দুপক্ষের মধ্যস্থলে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া মণিকা সুরঞ্জনের জন্য একটা সাদা পশমের সোয়েটার বুনিতেছিল, বোনটা সর্ব্বাণীই ধরিয়াছে তবে ও তার একটু কাজ গুছাইয়া দিতেছিল। মণিকার তিন বছরের ছেলে

মাণিক মাসিমণির দেওয়া টিনের ইঞ্জিনটা সবেগে চালাইয়া মুখে তারই প্রতিনিধিত্বে ধ্বনি করিতেছিল, 'কুউ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্',—আবার কখনও বলিতেছিল, 'যত দিবি ততো নে'বো, যতদিবি ত'তো নে'বো।'—

আজ অন্য পড়া স্থগিদ রাখিয়া সর্ব্বাণী মেঘদূত লইয়া বসিয়াছে, বহু পঠিত এ বই কখন তার কাছে পুরাতন হয় না, বিশেষতঃ এমন অনুকূল পরিবেশের মধ্যে। সে পড়িতেছিল,—

"মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকুলো যথাত্বাং—
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।"—ইত্যাদি

সুরঞ্জন কি একটা বই পড়িতেছিলেন, সচকিত হইয়া বইএর পাতা হইতে মুখ তুলিযা চাহিয়া দেখিলেন, মণিকা তাঁর কাছে পায়ের তলায় সরিয়া আসিয়া মৃদ কণ্ঠে ডাকিতেছে, "কাকাবাবু!" তার মুখে সঙ্কুচিত কুণ্ঠা।

সুরঞ্জন জিজ্ঞাসু চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে মণিকা বলিল, "সর্ব্বাণীর বিয়ের জন্যে একটি ভাল পাত্রের কথা বল্‌ছিলাম। ছেলেটি আমার পিস্‌তুতো দেওর হয়, এম. এস. সি. পাশ করে আলিগড় কলেজে চাকরী পেয়েছে, সর্ব্বাণীর তো প্রফেস্যর, মাষ্টার এদের উপরেই ঝোঁক বেশী, তাই মনে হ'ল, ছেলে আমাদের খুবই চেনা, স্বভাব চরিত্র চমৎকার, মেজাজ খুব নরম, দেখতেও সুশ্রী, আর আমার পিসশ্বশুরের অবস্থাও তো খুব ভাল।"

সুরঞ্জনের মুখে ঔৎসুক্যের চিহ্ন মাত্র ফুটিল না, ফুটিয়া উঠিল যে ভাবটা সেটা চিন্তার। অল্পক্ষণ পরে শান্তস্বরেই কহিলেন, "বিয়ে একদিন তো দিতেই হবে, তবে আরও দু বছর গেলে হতো না?" এটা প্রশ্ন অথবা আত্মোক্তি ভাল বোঝা গেল না। মণিকা একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "ছেলেটি বড্ড চেনা, সবদিকেই ভাল, তাই মনে হ'ল

আপনাকে জানাই। পিসশ্বশুর আপনার ছেলেকে লিখেছেন, 'ছেলে পাশ করা শিক্ষিতা মেয়ে চায়, দূরে চলে যাচ্ছে, বয়েস বড় কম, কোন পাল্লায় পড়ে যাবে, সহ-শিক্ষার গুণে আজকাল যা'তা হচ্চে দেখছ ত? তাই বিয়ে দিয়ে পাঠাতে চাই।"

সুরঞ্জন বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া মনে মনে কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "বড় হয়েছে, ওর মতটাও তো নেওয়া দরকার। তুমিই ওকে বলো।"

তিনি ইতিমধ্যে অনেক কথাই ভাবিতে ছিলেন। তাঁর সেই ভাই, —তাঁদের পরিবারের যিনি কর্ত্তা, মধ্যে মধ্যে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সর্ব্বাণীর বিবাহ লইয়া ইতিপূর্ব্বে রীতিমত মাথা ঘামাইতে সুরু করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বেই তাঁর মেজ শালার ছেলে হিমাংশুর সঙ্গে সর্ব্বাণীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, 'ওঁদের অবস্থার কথা তুমি ত সবই জানো। দিনাজপুরে এ. ডি. এম. ছিলে যখন ওদের জমিদারীর আয় কত এবং এর উপর এদের পাটের ব্যবসা, এসব নিশ্চয়ই জেনেছ? উপরন্তু ছেলেটি বি. এ. পাশও করেছে। খুবই ভাল হবে। মেয়ের বযসও তো তোমার কম হলো না। ওর বয়সে আমার দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবান না করুণ, যদি হঠাৎ তোমার কিছু একটা হয়, এখন থেকে ওর ব্যবস্থাটা তো তোমার করে রাখাই উচিত,' ইত্যাদি সুরঞ্জনের মনে তাঁর এ পর্য্যন্ত না ভাবা অত বড় বিস্মৃত কর্ত্তব্যবোধটা ঐ আকস্মিক 'যদি হঠাৎ তোমার কিছু হয়—' শব্দটির চাবুক খাইয়া ভিতরে ভিতরে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। অবিনাশ প্র্যাকটিক্যাল লোক, সে বহুদর্শীও—সত্য কথাই তো! যদি হঠাৎ তাঁর কিছু,—অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে,—সর্ব্বাণী যে একেবারেই নিরাশ্রিতা অনাথা হইয়া পড়িবে! মনের কাছেও স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক থাকিলে কি হয়, নিজের অবচেতন মনের ছায়ায় এ সত্য যে অনস্বীকার্য্য! তাঁর পরিবারের

মধ্যে সর্ব্বাণী কিছুতেই খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিবে কি তারা না মনের মধ্যে। যতই তাহাকে তিনি উৎকট আধুনিকতার এতটুকু বিলাসিতা বর্জ্জিতা সাধারণ গৃহস্থ কন্যার ধাঁচে তৈরি করিতে করিয়াই থাকুন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে বিষয়ে তাহাকে বা তাঁহাকে একটুও তো সাহায্য করে নাই। তার উপর জন্ম স্বত্বেও পাওয়া এক রোখা স্বভাবকে কেহ কি কখনও পরাভব করিতে সমর্থ হয়?

কিন্তু এ'ও ঠিক যে, ভাইযের শ্যালক পুত্রটিও তাঁর এই কন্যার যোগ্য পাত্র নয়। অবস্থা তাদের ভাল সে কথা তিনিও জানেন, তবে এ'ও জানেন অভিজাত জমিদার বাড়ীর সঙ্গে তাঁদের কোনদিক দিয়াও এতটুকু মিল নাই,—মিল হওয়া সম্ভবপরও নয়। সে বাড়ীর এবং পূর্ব্বোত্তর বঙ্গের অনেক জমিদার ঘরের খবরবার্ত্তা তিনি জানিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁরা যেখানে ছিলেন আজও সেইখানেই অবস্থিত, আর সর্ব্বাণী? সে বরং বর্ত্তমানকে ছাড়াইয়া দু চার পা আগাইয়া গিয়াছে বই—পিছাইয়া নাই। লিখিলেন, "হ'লে ভালই হতো, কিন্তু তোমরা তো জানো, সবু আমাদের সাবেকী চালে ঠিক মত চলিতে শেখার সুযোগ পায়নি, আত্মীয়তার ভিতর অনর্থক একটা অশান্তির কারণ ঘটিলেও হয় ত ঘটিতে পারে, তাই ভয় পায়। এখনকার ছেলে মেয়েদের তো দেখিতেই পাইতেছ, তারা কতকটা গান্ধীপন্থী, জমিদারদের এরা তেমন সুনজরে দেখে না।"

তাঁর চাইতে মাত্র পাঁচ মাসের ছোট এই ভাইকে তিনি বেশ একটুখানি সমীহ করিয়া চলেন, যেহেতু পারিবারিক বিধান-সভার সভাপতি তিনিই, সুরঞ্জন নহেন। সুরঞ্জনও তাঁর শৈশব কৈশোর হইতে তাঁর সে দাবী আজ পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন নাই বরং তাঁর লৌহ-কঠিন বিধি-বিধানকে যতটা সম্ভব মানিয়া লইয়াছেন, যে হেতু শৈশবে পিতৃ-মাতৃ

হীন তিনি তাঁর কাকা কাকীমার কাছেই ওদের মধ্যের একজন হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা তাঁর দিক দিয়া আজও তাই অটুট আছে, তথাপি মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এর অন্য কোন সমাধান করাও তো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না! অবিনাশ এই উত্তর পাইয়া নিশ্চয়ই মনে মনে চটিয়া ছিলেন এবং কড়া প্রত্যুত্তর দিতে ও তৎক্ষণাৎ উদ্যত হইয়াও উঠিয়াছিলেন। তাঁর স্ত্রীই তাঁহাকে এ কার্য্যে নিবৃত্ত করিয়া বলেন, "বট্‌ঠাকুর মন্দ কথা তো কিছু বলেন নি। সেই তো দেমাকে আত্ম-সুখী একগুঁয়ে মায়েরই মেয়ে, তায় আবার মেম সায়েবের মতন গায়ে ফুঁ দিয়ে কলেজে পড়ে মানুষ হচ্চে। না বাবু! দরকার নেই, শেষে কি মেজবৌদির কাছে খোঁটা খেয়ে আমার প্রাণ বেরুবে!"

সুরঞ্জন হিসাব করিয়া দেখিলেন মণিকার আনা পাত্রটি সম্বন্ধে এ সব বিষয়ে কোন গণ্ডগোল নাই। বাপ উকিল, ছেলে প্রফেসার, খেটে খাওয়া লোক, শিক্ষিত বাড়ী। তবে সমস্যা রহিয়াছে সর্ব্বাণীকে লইয়া,-- সর্ব্বাণী কি এখনই বিবাহ করিতে রাজী হইবে? বাপকে ছাড়িয়া সে একটি পা'ও যে এদিক ওদিক নড়িতে চায় না। পিসিমা তার কতবারই তো ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, সে তা' গ্রাহ্যও করে নাই।

পরদিন যখন মণিকা আসিয়া জানাইল, সর্ব্বাণীর বিবাহে অনিচ্ছা নাই—এবং এদের বাড়ী বিবাহ করিতে সে সম্মতি দিয়াছে, তখন তিনি যেন আকাশ হইতেই পড়িয়া গেলেন। যে পথকে গিরিসঙ্কটের মত দুর্লঙ্ঘ্য বিশ্বাস ছিল, সেই পথের একটি মাত্র বাঁক ঘুরিতেই দেখা গেল, সেটা তাঁর অমূলক ভয়, অতি সরল ও সহজ সে রাস্তা। মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া ভাবিলেন, বাবারা তাঁদের নিজ সন্তান সম্বন্ধে কতই না অজ্ঞ থাকে! তারা যে বড় হইয়াছে, জীবন-যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাদের

মধ্যেও যে স্বভাবের প্রেরণাতেই সঞ্জাত হইবেই এ কথাও কি তারা ভুলিযা যায়? নিজেরও অজ্ঞাতে অবচেতন মনে অতি সূক্ষ্ম এতটুকু একটুখানি আঘাতও কি সেই সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছিল?

কিন্তু সর্ব্বাণীর এই বিবাহ স্বীকারের মধ্যে তার যৌবন ধর্ম্মের কোন বালাই ছিল না। মণিকা চালাক মেয়ে সে তাকে যে মন্ত্রে বশ কবিযাছিল, তার ছন্দ সম্পূর্ণরূপেই বিপরীত। তার ঋষি তারই পিতা এবং দেবতা তার প্রগাঢ় পিতৃভক্তি। সে তাকে সেইখানেই কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। মণিকার প্রস্তাবে সে যখন অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতে গেল, সেই পরম ক্ষণে প্রস্তাবিকা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিয়াছিল, "তোমার মুখেই শুনেছিলুম সেহ জমিদার পাত্রের কথা, সে তোমার মত হবে না জেনেই কাকাবাবু ওঁদের বিরাগভাজন হ'তে হবে জেনেও সে সম্বন্ধটি ছেড়ে দিয়েছেন; কিন্তু ঐ নির্ঘাত শব্দটাকে কিছুতেই তো ভুলতে পারছেন না। বড্ড শক্ত কথাটা কিনা, সেটাকে উনি আবাব মনের মধ্যে বড্ড বড় করেই ধবে নিয়েছেন। তোমার বিয়ে যোগ্য পাত্রে যত শীঘ্র দিতে পারেন ওঁর শরীর মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ততোই ভাল, এ কথাটা কি তুমি নিজে নিজেই বুঝতে পারছো না ভাই? ঐ অলুক্ষুণে চিন্তাটা থেকে ওঁকে রেহাই দিতে না পারলে ওঁর মনের শান্তি তো আর ফিরে আসবে না, এই কথাটা ওঁর স্বভাব থেকেই তুমি একটুখানি ধীর চিত্তে ভেবে দেখলেই তো বুঝতে পারো। আর সেইদিকে লক্ষ্য রাখাই তো তোমার প্রধান কর্ত্তব্য, নিজের ব্যক্তিত্বটাই তো আর তার কাছে বড় কথা নয়! উনি যাতে শান্তি পান, বেশীদিন বেঁচে থাকেন, সে তোমায় ভাবতে হবে না?" এ আঘাত যে তার সব চাইতে দুর্ব্বলতারই ঠিক উপরে।

আক্রমণটা সে ঠিকই করিয়াছিল, তাই মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত আগুনে কে যেন এক ঘটি জল ঢালিয়া দিল, সর্ব্বাণী স্তব্ধ হইয়া গেল। মণিকা তখনও

বলিতে লাগিল, তার মন্ত্র গুঞ্জন বন্ধ করিল না, সুরঞ্জন তো মেয়ের বিয়ে দিতে যথেষ্ট আগ্রহী রহিয়াছেন, বিশেষতঃ সব দিক দিয়া এমন একটি পাত্রে, যেখানে তাঁর এবং সর্ব্বাণীর আদর্শের সহিত কোনদিক দিয়া বিরোধ ঘটিতেছে না। সর্ব্বদা এ সুযোগ কি আর পাওয়া যায়? তার সেজ-ঠাকুরপো কলেজ লাইফে সুভাস বোসের স্বেচ্ছাবাহিনীতে লেফ্‌টেনান্টের পদাধিকার করিয়া কংগ্রেসের সেবা করিয়াছে, তাঁর সঙ্গে বন্যা রিলিফের কাজ করিয়াছে এবং একবার কলেজ জীবনে রাষ্টিকেট হইতে হইতে বাপের বহু চেষ্টায় বাঁচিযা গিয়াছে, ইত্যাদি প্রভৃতি অনেক কাহিনীই সে তাহাকে শুনাইল। সর্ব্বাণী কিছু শুনিল, কিছু হয়ত শুনিলও না, কানে ঢুকিলেও মনে ঢুকিল না, শুধু এ একটা কথাই, বড় সত্য অত্যন্তই নির্ঘাত, সেটা তার মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া দুই কানের তারে অনবরতই ঝঙ্কৃত হইতেছিল, 'উনি যাতে শান্তি পান, বেশীদিন বাঁচেন, সেই কথাটাই তো বড়!'

সুরঞ্জন তাঁর নিভৃত পাঠাগারে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন, মেয়ে আসিয়া পিছন হইতে তাঁর গলা জড়াইয়া ধরিল। এরকমটা সে প্রায়ই করে। সুরঞ্জন বই এর পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিলেন না কিন্তু তাঁর প্রশান্ত সৌম্য মুখে সন্ধ্যা তপনের মত একটি সুস্মিত হাস্যাভাব বিকীরিত হইয়া উঠিল। মেয়ে ঝড়ের বেগে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ বাবা! তুমি নাকি আমার বিয়ের জন্যে বড্ডই ভাবছো? আমি তোমায় কি পই পই করে বলিনি যে তুমি কিছুর জন্যেই কিচ্ছু ভাব্‌বে না, ভাবলে তোমার প্রেসার বেড়ে যাবে।"

সুরঞ্জনের প্রশান্ত মুখচ্ছবি এবার একটুখানি কৌতুক হাস্যে সুরঞ্জিত হইল, ওর দুটি হাতের তাঁর গলায় নামিয়া আসা পাতা দুখানি দুহাতে ধরিয়া স্নেহভরে উত্তর করিলেন,—"তা একটু ভাবতে হচ্চে বই কি রে! বিয়েতো দিতেই হবে একদিন না একদিন—"

সর্ব্বাণী তার বাবার কাছে ঠিক এ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তাই প্রথমটা চকিত হইযা গেল, কিন্তু নিজেকে সামলাইযা লইয়া বিস্ময়ের আমেজে মিশানো ঈষদুচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিযা উঠিল, "বিযে তোমাকে দিতেই হবে, অ্যাঁ বাবা? না দিলেই কি নয়?"

সুরঞ্জনের মুখের সেই প্রসন্ন কৌতুক চিহ্নটুকু মুছিয়া গেল, ধীর শান্তস্বরে কহিলেন, "সেটা তো তোমার বাবার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য মা! তোমার আর তো কেউ নেই, আমি ছাড়া—"

সর্ব্বাণী প্রায় রুদ্ধশ্বাসে চিৎকার করিযা উঠিল, "বাবা! বাবা! ওসব তুমি যা' যা' বলতে যাচ্চো আমি তা' শুনতে চাই না! যদি বিয়ে না দিলে তোমার মনের শান্তি ভঙ্গ হয, তবে যত শীঘ্র পাবো দিয়েই দাও। আমি ওই একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিযে তোমায কিছুতেই ভাবতে দোবো না। মণিকাদি একটা ওদের যেন কা'র ছেলের কথা বলছিল না? সে না কি খুব ভাল, তার সঙ্গেই তুমি আমার বিযের ঠিক করে ফেলো। হ্যাঁ,—শুধু বরপণ দিতে পাবে না। জানো ত আমি এলাহাবাদ নারী সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট হযে প্রতিজ্ঞা করেছি, পণ যারা চাইবে তাদের বাড়ী বিযে করবো না। হ্যাঁ, আজই তুমি ওদের বলে দাও সেই ভাল ছেলেদের চিঠি দিযে দিতে যে তোমার মত আছে।"

সর্ব্বাণী এবার সাম্নে আসিয়া তার বাবার পাশের চৌকিখানায় বসিয়া পড়িল। মুখ দেখিযা মনে হইল জুরীর বিচার সমাধা করিয়া জজসাহেব মস্ত বড় একটা জটিল মামলার রায দিয়া ফেলিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন।

সুরঞ্জন মনে মনে হাসিলেন,—এ যে একেবারেই শিশু! স্মিত-প্রসন্নমুখে উত্তর দিলেন, "না দেখে, না খোঁজ খবর নিয়ে এম্নি এক কথায় বলে দেবো আমার মত আছে? বরং অনুকূলকে লিখি সে

গিযে একবার দেখে শুনে আসুক, ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে ছেলে দেখে যদি তার পছন্দ হয়—"

সর্ব্বাণী সর্ব্বশরীর ঝাঁকাইয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে বাধা দিল, বলিয়া উঠিল,—"তবেই হয়েছে! তবেই তুমি আমার বিয়ে দিয়েছ! মেজকাকাবাবুর শালাদের বাড়ীর ছেলেকে তুমি প্রত্যাখ্যান করো নি? ভেবেছ সেকথা ওঁরা ভুলে গেছেন? আমি তোমায় হলপ করে বলছি, না, তা' তাঁরা ভোলেননি। ওঁকে যদি লেখ, উত্তরে সাতশো কথা শুনবে, যা পড়তে পড়তে তোমার ঐ ১৭০ ব্লাড্ প্রেসার ২৩৫এ পৌছে যাবে। তুমি যতই চাপা দিতে চেষ্টা করো না কেন, আমি যেন কিচ্ছুই টের পাই না ভাবো, না? ও তুমি শিবুদা'দের হাতেই ফেলে দাও। যতই হোক শিবুদা ফার্ষ্ট ক্লাশ এম, এ, আর মেজকাকা ম্যাট্রীক পাশ বই ন'ন। বুদ্ধি ও রুচি দুজনের সমান না হতেই বাধ্য।"

সুরঞ্জন এবার যে স্বরে কথা কহিলেন, তাহাতে সর্ব্বাণীকে লজ্জা দিল। বলিলেন, "গুরুজনের সমালোচনা এভাবে করতে নেই মা! সে তোমার নিজের কাকা।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সর্ব্বাণী উঠিযা দাঁড়াইল, অপ্রস্তুত মুখে ছাড়া ছাড়া ভাবে কহিল, "লিখে দেখো অনর্থক দেরি হবে মাত্র। আর তুমি দুঃখও পাবে মনে মনে।" কিছু আত্মগত, কিছু পরোক্ষে বলিতে বলিতে গেল, "দুর্য্যোধনরাও তো পাণ্ডবদের ভাইই ছিল, অভিমন্যুকে সপ্তরথী ঘিরিয়ে মারে নি?"—

সুরঞ্জন ঈষৎ শিহরিযা উঠিলেন।—

তথাপি প্রবল ন্যায়পরায়ণ কর্ত্তব্যে চির স্থির জজসাহেবের কর্ত্তব্য চ্যুতি ঘটিল না। তবে তাঁর কন্যারও একান্ত ছেলেমানুষী স্বভাবের মধ্য দিয়াও যে মানব প্রকৃতির কূটনৈতিকতার বিষয়ে একটুখানি অভিজ্ঞতা সঞ্জাত

হইয়াছিল তাহাও অস্বীকার্য্য নয়! যথাকালে অনুকুলের নিকট হইতে পত্রোত্তর আসিল, "তোমরা নিজেরা যখন পছন্দ করে নির্ব্বাচন করেছ ও তো ভালই হবে। বেটাছেলের আবার দেখবার কি আছে? আমার জামাই চেনে, সে ছেলেটির কথা শুনে বল্লে, একটু একগুঁয়ে গোঁয়ার গোছের, তা' তোমাদের তো ঐ রকমই পছন্দ! বিয়ে যদি দাও তো লিখ, এদিকের সাহায্য যেটুকু আমাদ্বারা সম্ভব তা' করতে চেষ্টা নিশ্চয়ই কর্ব্বো। আর ঐখান থেকে যদি দাও তো সে খুব ভালই হবে।"

সুরঞ্জন এ পত্র পাঠ করিতে করিতে মনের মধ্যে একটুও যে আহত হ'ন নাই—এমন কথা বলা চলেনা, তবে তাঁর ঘাত-সহ জীবনে এতটুকু ছিটে-ফোঁটা ঢিল পাটকেল কতটুকুই বা কি করিতে পারে? মেয়ের মনঃকল্পিত প্রেসার বৃদ্ধি ইহাতে তাঁর হয়ত হয় নাই, আর হইলেও তা' যৎসামান্য অস্বস্তির মধ্য দিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল, এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ থাকায় সর্ব্বাণী ডাক্তার ডাকিয়া হৈ চৈ করিতে পারে নাই।

৩

শিবেশ্বর ও মণিকার ঘটকালীতে তাদেরই বার্ত্তা-বহনে অষ্টাহের ভিতরেই সর্ব্বাণীর বিবাহ সম্বন্ধটী আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত পাকা হইয়া গেল। শিবেশ্বর খোলাখুলি সব কথাই বর-কর্ত্তাকে জানাইল। এর ভিতরের বরপণের কথাটাও। এইখানেই তার মনে কিন্তু দারুণ খট্‌কা ছিল। হাইকোর্টের ফৌজদারীর উকিল পাত্রের পিতা অতি মোলায়েম ভাবেই কিন্তু পত্রোত্তর দিলেন। লিখিলেন, "এসব তো যুগধর্ম্ম। অনিবার্য্য ভাবেই এরা এ যুগে দেখা তো দেবেই। আমার নিজের ছেলেটীও কি চীজ সে তো জানো! এই বয়সে অনেক কীর্ত্তিই তো

করলেন। ভেবেছিলুম জেল খেটে ডাণ্ডা বেড়ি পরেই জীবনটাকেই হয়ত বা শেষ করবেন, তা' ভগবানের কৃপায় সে ফাঁড়াটা তাঁর ভালয় ভালয় উৎরে গেছে, এখন ঐ রকম একটি কড়া মেয়ের হাতেই ওর পড়া ভাল। মেয়ের ফটো দেখে আমার বাড়ীর কেউই অপছন্দ করে নি। খোকাকে গিয়ে দেখে আসতে বলায়, তিনি সাফ বলে দিলেন, মেয়েরা কি চিড়িয়াখানার জানোয়ার? দেখবো আবার কি? ফটোখানাও একবার চেয়ে দেখলে না। তবে বিয়েটা এই শ্রাবণ মাসেই দিতে হবে, আর কলকাতায় এসে। অতদূরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভয়ানক কাজের চাপও চলছে। হয়ত কোর্ট থেকেই আমায় বরানুগমন করতে হবে।"

শিবেশ্বর ও মণিকা সানন্দ চিত্তে সুসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলে স্বরঞ্জনের ললাটে একটা গভীর চিন্তার কালো ছাপ পড়িল। এত তাড়াতাড়ি করিয়া দুটী খামখেয়ালী উষ্ণ মস্তিষ্ক ছেলে মেয়েকে চির বন্ধনে বদ্ধ করা কি সঙ্গত হইবে? যতদূর পরিচয় পাওয়া গেল, ছেলেটী ভাল হইলেও একটু বেশী ভাল,—অর্থাৎ যাহাকে অন্য ভাষায় বলে Too much! একটু ধীর বুদ্ধি,—স্থির মস্তিষ্ক ছেলের হাতে পড়াই বোধকরি সর্ব্বাণীর পক্ষে ভাল ছিল,—কিন্তু না, না,—এ তিনি কি ভাবিতেছেন? না, সে রকম হয়ত না পড়াই ভাল। হ্যাঁ এইই ঠিক! তাঁর বিংশতি বৎসরের অভিজ্ঞতা দিয়া আজও কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? নিজের এই বিক্ষত চিত্তের অনারোগ্যকর অগ্নিময় ক্ষত জ্বালা সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ ধরিয়া তবে তাঁহাকে কি শিখাইল? কোন্ মহা ভ্রান্তির কোন্ অসম-চরিত্রের মধ্যের অসম্পূর্ণ মিলনের একান্ত শোচনীয় পরিণতির অনির্ব্বাণ স্মৃতি, চরম গ্লানির মধ্য দিয়া আজও কি তাঁহাকে অহোরাত্রই দগ্ধ করিতেছে না? নিয়তই করিতেছে নাকি? অবচেতনার গভীর তলে তাহাকে রাখিবার, নিজের মনের কাছেও সবেগে

শতবার অস্বীকার চেষ্টা করিলেও, সেদিনে তিনি যদি গোপন-লুব্ধতা'ধর শেষ পর্য্যন্ত পরার্থের আবরণ দিয়া স্বার্থকেই উপরে না তুলিয়া নিজের আদর্শে সুদৃঢ় থাকিতে পারিতেন, তবে আজ তাঁর জীবন কাহিনী অন্যরূপই তো ধারণ করিতে পারিত ! একথা কি মিথ্যা ? এ কথা কি ভুলিয়াছেন ?

সমস্ত সংশয় মনের মধ্যে গোপন করিয়া অবিনাশকে বিবাহের যথাযথ আয়োজন করিতে অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিলেন।

সুরঞ্জনের অন্তঃপ্রবহমান গভীর ভালবাসা অনুভব করিবার মত মানসিক তপস্যা ও প্রস্তুতি ছিল না বলিযাই বিদ্যুতের পক্ষে তাঁর অটুট সত্যনিষ্ঠা, উদার সহানুভূতি ও অ-কাল্পনিক ভাবোচ্ছ্বাসের মত্ততা বিহীন বিরাট মনের নাগাল পাওযা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, একথা তাঁর পরিমার্জ্জিত ভদ্রচিত্তের একটা কোনাযও স্থান পায় নাই, তাই অবস্থা-সঙ্কটের সমস্ত দায়ীত্বটাই তিনি নিজের মাথায় চাপাইয়া লইয়া নিরন্তর দুঃখই পাইয়া আসিয়াছেন, অপরকে অপরাধী করিবার মত হীনতা বা দীনতা তাঁর মধ্যে ছিল না। নিজের বিক্ষত চিত্তকে অসীম ধৈর্য্যে কর্ত্তব্যের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দিয়া তারই নির্দ্দেশে চলিযাছেন। তাঁর পক্ষ হইতে এর জন্য অন্য পক্ষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি ও তীব্র বেদনা বোধ ব্যতীত অপর কোন বিরূপতা ভুলিয়াও উদিত হইত না। তাঁর এ অন্তর্ব্যথা যে কত তীব্র, মন তার কত যে নিঃস্ব, এই আত্মসংহত সুরঞ্জনকে যাহারা বাহির হইতে দেখিত, তাহারা অনুভব করিতেও পারিতনা। তাঁর তো এ সংসারে অন্তরঙ্গ বা আত্মার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই, কে' বুঝিবে ? সর্ব্বাণী সবটা তলাইয়া না বুঝিলেও তাঁর শান্ত করুণ মুখের গম্ভীর বিষাদ-প্রচ্ছন্ন ভঙ্গীটুকু তাকে যেন তাঁর ভিতরকার রিক্ততার নিঃস্বতার সংবাদটী জানাইয়া দিতে তো বাধা পায় নাই। তাই সে তার অনেকখানি ছোট বয়স হইতেই অবচেতনার

কর্যঅনুভব করিয়া আসিতেছে, বাবা তার সুখী ন'ন,—না, শুধু তাই যথেষ্ট নয়,—বড় অসুখী।

মণিকার হাতে বরের বাপের লেখা চিঠির খামখানা দেখিয়া তার বুকটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। যদি ওঁরা বরপণ ইত্যাদির ছুতায় এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকেন? সর্ব্বনাশ! তার বাবার মনে খুবই তো আঘাত লাগিবে এবং তার জন্য ব্লাড-প্রেসার কতখানি হাই হইতে হায়ার হইয়া উঠিয়া কি না জানি একটা অঘটনই বা না ঘটাইয়া বসিবে তাই বা কে জানে! পত্র পাঠান্তে সে তার আঠারো বৎসরের সমস্ত ইজ্জত খোয়াইয়া সজোরে হাততালি দিয়া সাহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল, "হুর্‌রে! কি অদ্ভুত ভদ্রলোক রে—মণিকা! যাই বাবার কাছে, এইবার তিনি নিশ্চিন্দি হয়ে সুস্থ থাকতে পার্ব্বেন, কেমন না, রে?—আঃ! এটা যে কতদিনে আবার চুকবে!"

সর্ব্বাণী প্রায় নাচিতে নাচিতে ছুটিল।

এতখানি বয়স পর্য্যন্ত সর্ব্বাণীর বিবাহ বা বরের কথা তার অন্তরের নিভৃত নিলয়েও কোন দিন স্থান পায় নাই বরং মনে তার ইহার বৈপরীত্যই ছিল। সে কখনও সমবয়সী সঙ্গিনীর সঙ্গ পায় নাই। পড়াশোনা করা আর বাবাকে শিশুর মত আগলাইয়া রাখা ইহাই শুধু সে জানিত। বিবাহ ইহার ঠিক উল্টা পক্ষ, সেই হেতু তার আদর্শেরই বিরোধী, তাই ভবিষ্যৎ স্বামীর আদর্শ বা কাল্পনিক রূপ সে তার মনকে দেয় নাই। তার গণ্ডী ঘেরা শিশু জীবনেই নিকটতম রূপে পাইয়াছিল একমাত্র তার বাবাকে, আর তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই তার এ পর্য্যন্তকার জীবনটাকে সে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে। সে রক্তে মাংসে মনে-প্রাণে আদর্শে ও শিক্ষায় তার পিতার মাতা কন্যা সেবিকা ও শিষ্যা। তিনি, একমাত্র তিনিই তার সমস্ত সত্বাটাকেই গভীর ভাবে

আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু শান্ত স্বভাব, অপরিহার্য্য অপ্রতিবিধেয় দুঃখভাব বিনম্র পিতার সহিত তার প্রাণোচ্ছল স্পর্শ-কাতর উত্তেজনা-প্রবণ মাতৃরক্তের অনিবার্য্য ধারা হইতে সে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। তবে তার বাবাকে সে দেবতার চাইতেও ভক্তি করে। অপ্রতিদ্বন্দ অধিকাবের বলে তাঁকে ভালবাসে, অনাবিল পিতৃস্নেহের এতটুকু সন্দেহের অবকাশমাত্র ও তো পায না, তাই তাহা সমধিক পবিত্র। সন্তানকে যেমন মা তার সকল আঘাত সকল দুঃখ হইতে বাঁচাইয়া চলেন, এ মেযের ও তার সর্ব্বহারা পিতার প্রতি সেইরূপই বাৎসল্যপূর্ণ স্নেহ ছিল। তাঁর ললাটে এতটুকু চিন্তা-কুঞ্চনও সে সহিতে পারিত না, তার জন্য কোমর বাঁধিয়া লড়িতেও সে প্রস্তুত থাকিত।

অবিনাশের দ্বিতীয পত্র আরও একটু তিক্ত ও নিষ্ঠুর এবং আরও একটু প্রতিশোধ স্পৃহ চিত্তেব কঠোর ভাষা লইয়া দেখা দিল। তিনি লিখিযাছেন, "কলিকাতায বাসা ভাড়া করিযা বিবাহ দেওয়া মন্দ নয়। এখানের বাড়ীতে সর্ব্বাণীব বিবাহ হইতে পারে না। একে ত বড় বৌদির মৃত্যু সম্বন্ধীয় জল্পনা-কল্পনা এই দীর্ঘকালেও চাপা পড়ে নাই, তারপর গুরু-পুরোহিত বলিতেছেন, বার বৎসব কাটিষা যাওযার পরেও যখন তাঁর পারলৌকিক কার্য্যাদি যথাযথ শাস্ত্র সম্মত ভাবে সম্পন্ন করা হয় নাই, তখন এ বিবাহকে হিন্দু-বিবাহ বলা চলে না। তিনি এই বিবাহ দানের ছেলেখেলা করিতে অক্ষম এবং এ অবস্থায় আমরাই বা কোন ভরসায় সমাজ বিরোধী-ব্যাপারে মাথা গলিয়ে সমাজে ঠ্যালা হয়ে থাকব?

তবে একটা উপায় করতে পারি, অবশ্য যদি তোমার আপত্যি না থাকে,—ওঁকে নিয়ে গিয়ে কালিঘাটে আদি গঙ্গার ধারে শাস্ত্রকৃত্য সব সম্পন্ন না হয় করিয়েই দেবো। তুমি যখন পার্ব্বে না তখন অগত্যাই এ ঝঞ্ঝাট আমাকেই পোয়াতে হবে।"

সুরঞ্জন যেন তাঁর চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ম্মম চিন্তু জ্ঞাতি-ভাইয়ের হাতের মার খাইলেন! ছোটবেলায় মার্ব্বেল খেলিতে হারিয়া গেলে জয়ী সুরঞ্জনকে যেমন দুর্দ্দান্ত বেগে ছুঁটিয়া আসিয়া নির্ম্মম ভাবে মারিয়া বসিত ইহাও যেন তেমনি! চিঠিখানা ছিঁড়িয়া গুটি পাকাইয়া ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটের তলার দিকে চাপা দিয়া দিলেন। মনটা তাঁর একেবারেই যেন নিঃস্ব হইয়া গিযাছে এমনি অনুভব হইল। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কোন অপ্রত্যাশিত অননুভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ব্যাপারের ও কি তিনি মনে মনে প্রত্যাশা করিতেছিলেন, না, কি?

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বাণী দুহাতে বাপকে জড়াইয়া ধরিল, ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—"সবতো চুকেই গেল, তবুও তুমি অমন গম্ভীর হযে বসে বসে ভাবতে থাকবে? তোমায় নিযে কি যে করি বলতো?"

সর্ব্বাণীর পিছন পিছন মণিকাও ঘরে ঢুকিয়াছিল, সে ভৎ'সনা ভরা কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আঃ কি করছিস! কাকাবাবুকে লাগছে যে। বুড়ী-ধাড়ী হয়েছিস্ না কচি খুকীটি আছিস্?—কাকাবাবু!' সময তো বেশী নেই, একটা ফর্দ্দ করে ফেলে জিনিষপত্র গহনা গড়ানো আরম্ভ না করলে তো সময় মত হযে উঠবে না।"

সর্ব্বাণী অপ্রস্তুত মুখে বাপকে ছাড়িয়া দিযা পাশের চেয়ারটায বসিয়া পড়িয়াছিল। মণিকাকে আসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কিসের ফর্দ্দ মণিদি? ওরা তো পণ নে'বে না লিখে দিয়েছে।"

মণিকা সুরঞ্জনের দিকে চাহিয়া কৃপার হাসি হাসিল, "কি মেয়েই আপনার তৈরি হয়েছে! শুনুন কথা!" সর্ব্বাণীকে বলিল, "এই মুর্ত্তিতে ধিং ধিং করে নাচতে নাচতে শ্বশুর বাড়ী যাবি নাকি? বাবার একটা মান সম্মান নেই? গহনা বরাভরণ ও যোলটা দান, নমস্কারী এসব কিছু দিতে হবে না বুঝি?"

এবার খানিকটা লজ্জিত হইয়া পড়িয়া সর্ব্বাণী আস্তে আস্তে মন্তব্য করিল, "ওঃ, ও সব বুঝি বরপণের বাইরে ?"

মণিকাকে কাগজ কলম লইতে দেখিয়া এবার কিন্তু সপ্রতিভ ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, "তুমি তো বরপক্ষের লোক মণিকাদি! ফর্দ্দ আমি নিজে করবো, আর বছর মলিনাদির বিয়েয় গিয়ে ও সমস্তই আমি দেখে এসেছি। সবই জানি।" চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া লঘু পায়ে ছুটিয়া নিজের ঘর হইতে একটা পাতলা খাতা ও ফাউন্টেন পেনটা লইয়া আসিল। বাপের লেখার টেবিলে ঘাড় গুঁজিযা কি খানিকটা দ্রুত হস্তে লিখিয়া গিয়া তারপর পরম গাম্ভীর্য্য পূর্ণভাবে মাথা তুলিল, "বরের রিষ্টব্যাণ্ড চামড়ার হবে না ষ্টীলের ?"

মণিকা সুরঞ্জনের বিপদ ভঞ্জন করিল, হাসিয়া বলিল, "তুই পাগল না, কি, রে সবি! চামড়া না ষ্টীল ? ওটা সোনার হবে।"

সর্ব্বাণী অবাক হইযা গিযা দুচোক কপালে টানিয়া তুলিল, ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, "প্রফেসার সোনার রিষ্ট ব্যাণ্ড পরে কলেজে লেক্চার দেবে ? ওতো কলেজের মেয়েরাও আজকাল পরে না।"

"তোমার মলিনাদির বরকে কি দিয়েছিল ?"

সর্ব্বাণী আবারও দমিয়া গেল, "হ্যাঁ তা' দিয়েছিল, কিন্তু ওতো তখনও প্রফেসার হযনি, পরে হয়েছে। এখনও কি আর পরে।"

মণিকা হাসি চাপিয়া বলিল, "এ'ও না হয় পরবে না, দেওয়া তো হোক।"

সর্ব্বাণী সবেগে মাথা দোলাইল, "আহা গো! আমার বাবার পয়সা অত সস্তা নাকি ? জমিদারী আছে ? কালো-বাজারী ব্যবসা করেন ? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা আনতে হয় না ? দুবার হাইকোর্টের

জজিষতীর অফার ছেড়ে দেন নি? আংটীটা কাঁচ পাথর না হযে সোনার সীল আংটী হলেই ভবিষ্যতে কিন্তু কাজে লাগে।"

"মলিনাদির বরকে তাই দিয়েছিল নাকি?"

"উহুঁঃ! অত বুদ্ধি ও-বাড়ীদের ঘটে নেই! সে একটা সাদা মতন চকচকে পাথর, বল্লে হীরে,—আমি তো হীরে-কাঁচের তফাৎ কিছুই বুঝতে পারিনে। একজিবিসনে তিন পয়সার আংটীতে যে রকম পাথর না, না, কয়েকটা কাঁচ ছিল, সেও তো ওব চাইতে কিছুই কম নয বরং সাইজে বড়। আচ্ছা ওদের বাড়ীর একজন মা আছে না? ওকে একটা গরদ দিতে হয় বুঝি?—"

সুরঞ্জন মেযের অতি তৎপরতায মনের মধ্যে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, সাহস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি পার্ব্বে না, মণিকাকেই ছেড়ে দাও।"

বাপের দিকে হাস্য সংযুক্ত অভিমানী চোখে আহুবে দৃষ্টির অপাঙ্গ হানিযা সে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—"তোমার এখন মন্ত্রী হয়েছে মণিকা! আমি হয়ে গেছি হাবা গোবা! বেশ বাবু! আমিও না, ও, ও, না, যার কর্ম্ম তাকেই সাজুক। আমি এক্ষুণি তোমার জবানীতে মেজ কাকাকে চিঠি লিখে দিচ্চি, মলিনাদির বিয়ের ফর্দ্দ মিলিয়ে সব-কিছু করতে, শুধু নগদ দু হাজারটী একেবারেই বাদ। আজকের ডাকেই চিঠি রওনা করে দিয়ে তবেই নাইবো খাব।" যেমন দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকিয়াছিল, সেই মতই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য এই একান্ত আনাড়ীও দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়শীল খেয়ালী মেয়ের হাত হইতে অভিজ্ঞ লোকের হাতে এতবড় ব্যাপারটা হস্তান্তর হওয়ায় দুজনেই মনে মনে ঈষৎ হাঁফ ছাড়িলেন। মণিকা হাসি হাসি মুখে বলিয়া উঠিল, "মেয়েটা একেবারেই পণ্ডিত-মূর্খ!"

সুরঞ্জনের চিন্তাও ক্ষণপূর্ব্বের পাওয়া নূতন আঘাতের শোক-ক্লিষ্ট অধরে ঈষৎ সকৌতুক স্নেহহাস্য প্রকটিত হইল, মনে মনে একান্ত করুণার সহিত ভাবিলেন, "কি ছেলেমানুষ! ওর জন্য আমার ভয় করে।"—মুখটা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল।

সেই দিনকার ডাকেই একটা মোটা অঙ্কের টাকাও ইন্‌সিওর হইয়া অবিনাশের নামে চলিয়া গেল।

৪

কলিকাতায় বৃহৎ গোষ্ঠির উপযুক্ত বাড়ীও মিলিয়া গেল। এক মাসের ভাড়া ও সেলামী দিয়া সুরঞ্জনের ছুটী মঞ্জুর হইয়া গেলে মণিকা শিবেশ্বর সমেত তাঁরাও সেখানে আসিয়া পৌছিয়া গেলেন। পাত্র আশীর্ব্বাদ সমাধা হইয়া গিয়াছে, কন্যা আশীর্ব্বাদ বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেই হইবে এ নাকি তাঁদের কুলাচার। অবিনাশ বিশেষ প্রসন্ন চিত্তে এ ব্যাপারের সমস্ত দায় ভার ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। পিতাপুত্রী তাঁর হাতেই যখন আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া তাঁরই আশ্রিত রূপে কোণঠাসা হইয়া রহিলেন, তখন রাগ করিয়া থাকিবার আর উপায় কি? কারণও তো নাই। মেজকাকী বলিলেন, "সবু মেয়েটাকে যত মন্দ ভাবতুম তা' তো নয়!—হ'লে ভালই হতো।"

অবিনাশ বলিলেন, "না হয়ে ভালই হয়েছে। তোমার দাদা বৌদি কি এইটুকু পেয়ে থুয়ে খুসী হতেন? এরা হয় ত বৌকে চাকরী করিয়ে লোকসানটা পুষিয়ে নে'বে, ওরাতো তা' পার্ব্বে না।"

আয়োজন উদ্যোগ তেমনই,—যেমন হইতে হয় তা' হইয়াছে। হাট-বাজার দই সন্দেশ দুবেলা ঘাট সত্তরখানা পাতা পড়া, উপরি আসা-

খাওয়া কিছুরই কিছু অভাব নাই। গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসার সময় হইতেই সানাই ও ব্যাগ-পাইপ্ বাজিতে সুরু করিল। কিন্তু এত উদ্যোগ এত আয়োজন এত অজস্র পয়সা খরচ এ সবই যে আর এক দিক দিয়া মাটি হইতে বসিয়াছে, সেখানে ত মানুষের এতটুকু হাত নাই! ধারা-শ্রাবণের অবিরল বর্ষণ ধারা এদিকে যেন পণ করিয়াই অবিশ্রান্তে ঝরিয়া চলিয়াছিল। তুক্-তাক্ তন্ত্র-মন্ত্র কত কিছুই হইল, বৃষ্টির আর ধরণ হইল না, আকাশ-যেন ফুটা হইয়া গিয়াছে! বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জল কি বাষ্প হইয়া এরই জন্য অপেক্ষা করিয়া জমিয়াছিল? অথবা অন্তরীক্ষ লোকের নিবাসিনীরা তাঁদের সমুদয় পুঞ্জীভূত অশ্রুজল এই বিবাহ বাড়ীকে বিন্যস্ত বিধ্বস্ত করিতে ইহার উদ্দেশ্যে ঢালিয়া দিতে ছিলেন? কিন্তু কেন?

দেখিতে দেখিতে সহরতলীর শুষ্ক ডোবা পুকুর ছাড়িয়া সহরের বুকের উপর লালদিঘি, গোলদিঘি উপচাইয়া পথে অথৈ জল দাঁড়াইল। বিবাহ বাড়ীতে সানাই ব্যাগ্‌পাইপ্ বাজিতেছিল হয় ত, কিন্তু কানের তারে তারও চেয়ে উচ্চগ্রামে বাজিতে ছিল উতলা উত্তরে হাওয়ার তর্জ্জন। সে যেন সেই ধ্বনিময় তিরস্কারের মধ্য দিয়া কুষিয়া-ফুঁষিয়া, আর্ত্তনাদ করিয়া কেবলই বলিতে ছিল,—না, না, না,—এবং আহা, হা, হা,—সে কি কোন অপরিবোধ্য আসন্ন প্রায় সঙ্কট মুহূর্ত্তের জন্য সাবধান বাণী? সে কি কোন আধিদৈবিক রুষ্ট দেবতার প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোবৃত্তির প্রতিশোধ স্পৃহ বাসনার চরিতার্থতার নির্ম্মম-প্রচেষ্টা? যাঁরা পূজা পাওয়ার ত্রুটীতে উদ্ধত সওদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা সপ্ত মধুকর সাগর-সলিলে সমাধি দিয়া একদা বক্র হাসি হাসিতেন? কে' বলিবে? মানুষের নিয়তি যে তার ভাগ্যবিধাতা জটিল রহস্যজালে জড়াইয়া অদৃশ্য রাখিয়াছেন, দৈবের পথ দৈবজ্ঞকেও মুহ্যমান করে,—এমন কি, তাহা

দেবতার ও নাকি অগোচর! শুধু সেই বিশেষ একটি কুটিল কুচক্রী কটি বা দেবী ব্যতীত আর কা'রও দৃশ্য নয়।

এ বিবাহে এ বাড়ীতে আসে নাই এমন কোন সম্পর্কীত ব্যক্তি বাকি ছিল না অথচ আসিতে পারিলেন না সর্ব্বাণীর সবচেয়ে আপন জনই, তার নিজের পিসিমা। ঝড় ঝঞ্ঝায় কাশ্মীরের পার্ব্বত্য পথ পথবাহনের একান্তই অনুপযোগী হইয়া রহিয়াছে, কোন উপায় নাই। সুরঞ্জনের সকল দুঃখ তাঁর বুকে চাপা নিশ্বাসের সঙ্গেই মিলিত রহিল। সর্ব্বাণী লুকাইয়া কাঁদিল, পাছে এঁরা কেহ কিছু মনে করেন, সেই ভয়ে প্রকাশ্যে সে একটী কথাও কহিল না। এখানে পা-দিয়াই সে অনেকখানি বড় হইয়া পড়িয়াছে, অনেক কিছুই বুঝিয়াছে, চারিদিকের পিসি কাকী কুটুম্বিনীর দল তার বিনয় নম্রতায় বিমুগ্ধ। তারা পরস্পরে বলাবলি করে, "ওমা। এমন মা গঙ্গার মতন ঠাণ্ডা মেয়ে, একে বলতো সব মেম সাহেব! পায়ে জুতোটা অবধি দেয় না, হাসি-মুখটীতে সব্বার ফাই ফরমাস খেটে বেড়াচ্চে, যেদিকে জল পড়চে সেদিকেই ছাতা ধরচে, আবার অতগুলো পাশও করেচে। হ্যাঁ ক্ষণজন্মা মেয়ে বটে।"

এত বড় সার্টিফিকেটখানা সেকি নিজের হাতেই ছিঁড়িয়া ফেলিবে নাকি?

গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসিয়া ছিল ভালই, তত্ত্ব লইয়া লোক আসিয়াছিল জিনিষের পরিমাণের চাইতে সংখ্যাধিক। কুটুম বাড়ীর লোকেদের আপ্যায়নের ক্রটী অবিনাশ ঘটিতে দিলেন না, বিদায় সম্বন্ধে যদিও সর্ব্বাণীর নির্দ্দেশ ছিল, 'মলিনাদির শ্বশুর-বাড়ীর লোকদের মতই বিদায় দেওয়া—কিন্তু দূরদর্শী অবিনাশ অতটা করিলেন না, সে ছিল পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার আর এ যাহোক একটা কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল-বাড়ীর লোকজন। যাকে যেমন দেওয়া উচিত তেমনই দিলেন। বউ দেখিয়া গিয়া

যাওয়া এতই খ্যাতি ছড়াইল যে, সে-বাড়ীর লোকেরা বউ দেখার জন্য উন্মুখ ও উৎসুক হইয়া উঠিল,—বিশেষতঃ বরের মা,—'ওবাড়ীর মা' বলিয়া —সর্ব্বাণী যাঁর উল্লেখ করিয়াছিল, তিনি তার আসল মা ন'ন, সৎমা। সতীনপো বৌ কেমনটী হইতেছে, সে দেখার আগ্রহ ওঁর আদৎ-মা থাকিলে যা' হইত, তার চাইতে কিছুমাত্র কম হইল না। মার চেয়ে দরদী বলিয়া নয়, নিজের রূপগর্ব্বটা এর কাছে খর্ব্ব হইবে কিনা সেইটা যাচাই করার জন্যই।

যথাকালে সকল বাধা ঠেলিয়া বিবাহের লগ্ন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, বিপত্তি কিন্তু কাটিল না। অস্ত পথে পা বাড়াইয়া সূর্য্যি-ঠাকুর একবারটী রক্তচক্ষু ফিরাইয়া সারা রাত্রি দিনের অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত মলিন ও বিস্রস্ত-বেশিনী প্রকৃতির শোকদীর্ণ মূর্ত্তিটা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তারপর আবার ছিঁড়িয়া পড়া জমাট মেঘের মেরামত করা ম্যারাপের তলায় মুখ লুকাইলেন। পরাজিতা ক্ষুব্ধা প্রকৃতি তখনও সম্পূর্ণরূপে কান্না থামাইতে পারেন নাই, চোক দিয়া তখনও তাঁর জল গড়াইতেছে। বর্ষার হাওয়ায় গভীর ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে তখনও শ্বসিয়া উঠিতেছে। জলকাদায় সাম্‌নের রাস্তাটা একান্ত কদর্য্য এবং ভয়াবহ হইয়া উঠিতে এতটুকু কিন্তু বাকি থাকে নাই। বাঁধা মেরাপের তলায় বৃষ্টির জন্য ফরাস পাতা হয় নাই, বেঞ্চি ও চেয়ার পাতিয়া আসর সাজানো হইয়াছিল। বরের বসিবার জায়গাটা 'থেটারে'র মত করিয়া সাজানো। পিছনে নতুন আঁকা 'সীনে',—মালিনী নদী তীরে সখী-সঙ্গিনী পরিবৃতা শকুন্তলা কলসী ভাসাইয়া জল আহরণ করিতেছে, অদূরে স্মিতমুখে দুষ্মন্তের অবস্থিতি।—নদীজলে বোধকরি বা স্রোত ছিল না,—রাশি রাশি পদ্ম ফুল ফুটিয়াছে। হয় ত এরাই একদিন বিরহতাপ সন্তপ্তা শকুন্তলার বিরহ-শয়নের সহায়তা করিবে! মরাল (হয় ত বা মৃণাল লোভেই) এই

নদীতে বিচরণ করিতেছিল ; অলিকুলও অদৃশ্য ছিল না, তাদেরই একটি শকুন্তলার মুখের কাছে সম্ভবতঃ উড়িয়া গিয়াছে, নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনের সুমধুর ও সুদৃশ্য চিত্র,—অঙ্কন-ভঙ্গী অতি পরিপাটি !

বর আসিল বৃষ্টি মাথায় করিয়া। এবার টিপি-টিপি নয়, মুষলধারে বৃষ্টি চলিতেছে। মোটরগুলির 'হুড' তো ফেলাই ছিল, কতকগুলিব আশপাশও বন্ধ, কিন্তু সবগুলিব তো নয়। বরের 'সিডান বডি উইলিস্-নাইট'-খানা ফুলপাতা ও পুষ্পিত লতায় আবাব লতার মধ্যে বহু ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব দিয়া সাজানো হইযাছিল, মনে আশা ছিল বৃষ্টি হয় ত বা শেষ পর্য্যন্ত ধরিযা যাইবে ; কিন্তু তাব পরিবর্ত্তে বৃষ্টির ঘায়ে ফোটা ফুলগুলি বাস্তায় পুষ্পবৃষ্টি কবিতে করিতে নিজেরা দলহারা হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে লতাপাতাও ধারা-শ্রাবণেব প্রচণ্ড ধারা-পাত সহিতে পারে নাই, একটা হ্যাণ্ডেল ঠিক ছিল না বলিয়া জানালাব একটা কাঁচ তোলা যায নাই, মাঝ রাস্তায় বৃষ্টি যখন চাপিযা আসিল, তখন গাড়ী বদল করার উপায ছিল না, নিতবর ও বর রীতিমত ভিজিয়া গিয়াছে। এদিকে বিবাহ-বাড়ীতেও ঠিক এই সময বর আসাব জন্য কেহ প্রস্তুত ছিল না। সন্ধ্যাব প্রাক্কালে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা কবাব পর বৃষ্টি যখন চাপিযা আসিল, বাড়ীব কর্ত্তাবা মনে করিলেন, এত বৃষ্টিতে নিশ্চযই বর বাহির হইবে না। আর একটা লগ্ন যখন বেশী রাত্রে আছে, সময়ও হাতে রহিয়াছে, বৃষ্টি অন্ততঃ কিছু কমিলে বর আসিবে। তাঁরা এর মধ্যে কুটুম্ব-আত্মীয়দেব খাওয়াইযা খানিকটা কাজ চুকাইযা রাখিতেছিলেন। চুকিল তো, সবই মাঝে হইতে বড় বিষম একটা গণ্ডগোল বাধিল।

রাস্তার উপর একটুখানি খোলা জমি, সেখানে না ঢোকে গাড়ী, আর না আছে কোন আবরণের বালাই। কিনিয়া বা ভাড়া করিয়া

প্রত্যেকের জন্য ছাতা রাখারও ব্যবস্থা হয় নাই। বরযাত্রীদের যতটুকু বা দুর্দ্দশা বাকি ছিল, পূর্ণ হইতে কিছুই আর বাকি থাকিল না। এ অবস্থায় স-বরযাত্রী বরকর্ত্তার মেজাজ কেমন হইতে পারে, বরকর্ত্তা ভিন্ন সে-কথা কে' বুঝিবে ?

বরকে অবশ্য ছাতা ধরিয়া হাতে ধরিযা আনা হইল, কিন্তু সে-বৃষ্টি কি ছাতায আটকায় ? একটা 'ওয়াটারপ্রুফ' আনা উচিত ছিল, আছেও বাড়ীতে, কিন্তু সে-কথা যখন ওঁদের খোঁচা খাইয়া মনে পড়িল, তখন বৃষ্টিজলে ভেজা বরের অঙ্গ হইতে বেনারসী চেলির নীল ধারা ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতেছে, জলের ছাঁটে গলা-চন্দন তার চোখের উপর, গালের মধ্যে অদ্ভুত ভাবে নামিযা আসিযাছে। ক্রোধে ক্ষোভে অধর দংশন পূর্ব্বক সে গুম্ হইযা দাঁড়াইয়া রহিল, খুড়শ্বশুরদের আনা তোয়ালে ও নববস্ত্রের আমন্ত্রণ গ্রাহ্যও করিল না। সুরঞ্জন নিজে আসিয়া যখন অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত অনুরোধ করিলেন, তখন গম্ভীর ঔদাস্যে উত্তর দিল, "সকলেই তো ভিজেছেন।"

সত্য কথা! অপ্রতিভ হইতে কিছু আর বাকি থাকিল না। কিন্তু উপায় ? এতগুলি লোক—তা প্রায় শ' খানেক তো হবে—এদের অন্ততঃ অর্দ্ধেককেও কাপড় যোগান কি সম্ভব ? সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, জটলা পাকাইয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিল, বরকর্ত্তাকে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বাড়ীর মধ্য হইতে যতগুলি ধুতি ছিল আনিয়া দেওযা হইল, কিন্তু তাহাতে সকলের তো সঙ্কুলান হইলে না। বৃষ্টিতে কাদায় রোজ দু'বেলা কাপড় ময়লা হয়, বরং ময়লা কাপড়ের বাক্স খুলিলে অনেকটা সমস্যা মিটিত।

অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়াও কিছুই মীমাংসা হইল না। ক্রুদ্ধ অন্য পক্ষ দৈববিড়ম্বনার সমুদায় দায়টাই অপর পক্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া মনে

তো বটেই,—মুখেও যথেষ্ট বিষোদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তো মেঘ-স্তম্ভিত আকাশের মতই ভীষণ হইয়া রহিলেন এবং অপর পক্ষ প্রায়-অকারণে, এতবড় অভিশাপের বোঝা মাথায় লইয়া বিমূঢ় হইলেন। সুরঞ্জনের কথা থাক,—তাঁর মেজ ভাই-ই তাঁর বল বুদ্ধি ভরসা,—এক এক করে চারটি মেয়ের বিবাহ তিনি দিয়াছেন, আশা করেন, আরও তিনটির দিবেন, তা' ছাড়া ভাইঝিরাও আছে, সেই তিনি হেন কুটুম্ব-ঘেঁষা, এবং কুটুম্ব-তোষা দশকর্ম্মান্বিত পুরুষও যখন সর্ব্বাণীর ভাবী শ্বশুরের কাছে যোড়হাত করিয়া করিয়া হাত ক্ষয় করিয়াও না পারিলেন তাঁহাকে কাপড় ছাড়াইতে, না পারিলেন খাইতে বসাইতে, তখন সুরঞ্জনের ধাত ছাড়িবার উপক্রম করিল। তাঁর মন তো আগাগোড়াই বলিতেছিল,—ভাল নয়,—ভাল নয়, এ বিবাহ ভালয় ভালয় হওয়া দুর্ঘট!……

অথচ ঐ বরপক্ষই ধরিতে গেলে এই বিপদটি ঘটাইয়াছেন! কি দরকার ছিল এত তাড়াতাড়ি এই ভরা বর্ষায় বিবাহের দিন ফেলিবার? কৃতকর্ম্মের ফলটা অন্যের ঘাড়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া আগুনে হাত দিয়া হাত পোড়ানো আবদারে ছেলের মতই তাঁরা এই নিষ্ফল ক্রোধ দেখাইতেছেন; কিন্তু এর দায় ঠেলিতে, ধাক্কা সহিতে যে আর ধৈর্য্য থাকে না! সুরঞ্জনেরই না হয় কন্যাদায়, তাঁর আত্মীয়দের……

বিবাহের লগ্ন কাছ ঘেঁসিয়া আসিতেছে। পুরোহিত শালগ্রাম শিলা সম্মুখে উৎকর্ণ। বাজনার শব্দ এতক্ষণ বৃষ্টির দাপটে শোনা যাইতেছিল না, এতক্ষণে বর্ষাধারার পাঞ্চজন্য ক্ষীণ হওয়াতে সানাইএর আলাপ কাণে পৌঁছিতেছিল, কিন্তু কি সুর বাজিতেছে ভালরূপে তা' বোঝা গেল না। ঝিম্‌ঝিম্, ঝম্‌ঝম্, টিপ্‌টিপ্, টপ্‌টপ্—একটা না একটা তো আছেই, আর শ্রোতাদের মনের কোণেও তখন বেজায় বেসুরা চড়িয়াছে।

সাহানার আনন্দ-উচ্ছল আত্ম-নিবেদনের মিলন-মধুর তানকে থাকিয়া থাকিয়া ভৈরবীর উদাস-করুণ বিলাপ মূর্চ্ছনা বলিয়া ভুল হইতে থাকিলে শ্রোতাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া চলে না। তা' ভিন্ন কাণে সুরের রেস্ ঢুকিতেছিলই বা ক'জনার? বড় বড় মাতব্বরদেব মাথাই যে ঘুরিয়া গিযাছে।

অবশেষে বরকর্ত্তা কি ভাবিয়া বরকে আর যা'দের জন্য শুষ্ক বস্ত্র পাওযা সম্ভব হইল তা'দেরও কাপড ছাড়িতে অনুমতি দান করিলেন। জজ অবশ্য িনি ন'ন, সুরঞ্জনই,—কিন্তু আজ দু'জনের অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, মনে করা বিচিত্র নয যে হনিই বিচারক, আর উনি আসামী।

বরযাত্রীরা বুভুক্ষিত, হুকুম পাইলেই থাইতে বসে, অনেকেই অফিস ফেরৎ। হুকুম পাওয়ার জন্যই যে কাউন্‌সিল বসিয়াছিল, তা'ও অনুমান করিলে ভুল হয় না,—বেশীর ভাগ লোকেই,—অর্থাৎ যুবকবৃন্দ ফুস্‌ফাস্ করিয়া বলিতেছিল, "এদেব দোষ কি?" বর বেচারীও তার বন্ধুদের যুক্তি শুনিতে শুনিতে কাঠের মত শক্ত হওয়া ছাড়িয়া নমনীয় হইয়া ওদের মধ্যেই একটা চেয়ার লইয়াছিল। খোনে গিয়া বসার জন্য যদিও তার মনে অসাধ ছিল না কিন্তু সেটা তো আর শোভনীয় হইবে না,—বিশেষ করিয়া এই নীলবর্ণ-রঞ্জিত এবং গলিত-চন্দন কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি লইয়া! ছেলেবেলায় শোনা নীলবর্ণ শৃগালের রাজবেশ মনে পড়িয়া তার এই মানসিক বিপ্লবের মধ্যেও হাসি পাইল।

বরকর্ত্তাকে বাদ দিয়া বরযাত্রীরা যখন অনেকেই কন্যাপক্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, তথন বিচক্ষণ বরকর্ত্তা নিজের 'প্রেষ্টিজ' রক্ষার খাতিরেই হয়ত বা হঠাৎ খুব বেশী অমায়িক হইয়া উঠিলেন। "হাঁ, হাঁ, কর কি সব,—খেতে বসিয়ে দাও না হে, লগ্ন যে

এসে পড়্‌ল। ও খোকা! তুমি যাও, গরম জলে চানটা সেরে তৈবী হয়ে নাও গে'। ওবে, ও—এই নাপ্‌তে বেটা এই সময়টিতেই সরলো কোথায়? ওরে! ও রাজীব! খোকাবাবুকে সাবান দিয়ে আচ্ছা করে চান করিয়ে দে' না। আপনাবা একটু চন্দন পাঠিয়ে দিন গিয়ে, আর্‌ গরম জল সাবান তোয়ালে—"

যাক সমস্যার কতকটা সমাধান তো হইল। যেন জননী জঠর যন্ত্রণা হইতে সদ্য মুক্তিলাভ! ব্যাগ্‌পাইপ, সানাই, নূতন একটা সুর বাঁধিল। সুবটাকে বুঝিতে এবাব ভুল হইল না,—সেটা বেহাগই বটে! অন্তঃপুবে ঘোর রোলে শাঁখ বাজিযা উঠিল। নবপ্রসাধনে সজ্জিত বর এইবার ছান্দলাতলায প্রবেশ কবিবাব জন্য দানেব ঘর হইতে শ্বশুরের দ্বাবা অর্চ্চিত হইয়া উঠিয়া আসিতেছে। মুখ তার প্রসন্নতার দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত, ললাটে উৎসাহ গৌরবেব জযটিকা, অতীত কালের সলিলার্দ্র বিরূপতার অস্বাচ্ছন্দ্য মনের উপর হইতে আত্মবিলোপ করিয়াছে। থে্ান-খানায বসিতে না পাওযার দুঃখটা হয়ত বা মনের মধ্যে ঈষৎ উঁকি মারিতেছিল, তথাপি সোনে আঁকা ওই রাজা দুষ্মন্তের মতই তার হর্ষ-স্মিত মুখে চোখে কৌতূহলের একটা মধুব উদ্দীপনাও লীলায়িত হইতেছে। মণিকা বৌদি বিবৃত স্বপ্ন-লক্ষ্মীর পথ চাওয়ার পরিসমাপ্তির উগ্র ব্যগ্রতায় বুক তাব উদগ্র আবেগে দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তকে সুদীর্ঘ এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানটিকে অনর্থক বলিযাই বোধ হইতেছে।

সহসা পিতা গম্ভীর গলায হাঁকিয়া উঠিলেন, "খোকা! একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও।"

দাতার আসনে সমাসীন ক্ষৌমবাস পরিহিত, এতক্ষণের পর জামাতৃ-অর্চ্চনে প্রসন্ন মুখ স্বভাবতঃ শান্ত মূর্ত্তি বৈবাহিকের দিকে ফিরিয়া বজ্রগর্ভ কঠোরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"ফার্ণিচার,—বরাভরণ, যা' দিচ্ছেন তা'

তো চোখেই দেখছি,—বলি, মেয়ের গায়েও কি এই রেটেই গয়না গড়িয়েছেন নাকি?—আমি সেটা স্বচক্ষে একবার দেখ্‌তে চাই—"

সুরঞ্জনের মুখ শুকাইয়া গেল, এই কূট প্রশ্নের উত্তর তাঁর মনে পড়িল না। অসহায়ের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। মেজকর্ত্তা তখন তেতলার মেরাপ বাঁধা ছাদে বরযাত্রী খাওয়ানোয় ব্যস্ত আছেন।

খবর পাইয়া দ্রুত নামিয়া আসিলেন ও সবিনয়ে প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলেন, শান্ত স্বরে বলিলেন, বেশ তো! বেশ তো! আপনি একটু কষ্ট করে এদিকে আসুন,—মেয়ে পুঁথি-কোলে পাঠে বসেছে, এখন তো ওখান থেকে ওকে ওঠাতে নেই।"

বর উদ্যত চরণ সংহত করিয়া বাপের পুনরাদেশ প্রত্যাশিত হইয়া তদবস্থই রহিয়া গেল। অধরের হাস্যাভাস বিলুপ্ত ও সুমসৃণ ললাট পট ভ্রূকুটি বদ্ধ হইয়া গেল এবং উহা গোপনার্থে সম্প্রদান গৃহের মেঝেয় বসানো রঙ্গীন কাঁচের টুক্‌রাগুলার বর্ণ সমাবেশ দেখিতে বিরক্ত দৃষ্টি সে নিবদ্ধ রাখিল। পাঁচশত পাওয়ারের দুইটা আলোক মধ্যবর্ত্তী থাকায় তার সেই গবেষণা কার্য্যে কোন ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনাই ছিল না।

সর্ব্বাণীর ভাবী শ্বশুর মহামহিম বরের বাপ,—ইত্যবসরে সর্ব্বাণীকে উঁহু—তার গায়ে পরা গহনাপত্রগুলিকে দেখিতে অন্দর মহলের যে ঘরে তাকে আল্পনা দেওয়া উল্টা পিঁড়িতে চণ্ডীর পুঁথি কোলে বসানো হইয়াছিল এ বাড়ীর মেজকর্ত্তার সঙ্গে সেখানে আসিয়া উদিত হইলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের পিছন পিছন জনকতক কৌতূহলী দর্শকও এই যাচাই-পর্ব্ব দেখিতে না আসিলেন যে তাও' নয়।

সর্ব্বাণীর দুহাতে এক গোছা সোণার চুড়ি, বালা গহনাটি নাকি শ্বশুর বাড়ীর দেয়, তাই বালা সে ফর্দ্দ হইতে কাটিয়া দিয়াছিল, বালার পরিবর্ত্তে গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ণের সরু সরু রুলি দুগাছি, গলায় তোলা এবং আট পৌরে

দুটি স্বর্ণহার, কানে নতুন প্যাটার্ণের দুখানি সুদৃশ্য কানবালা। এছাড়া কাকারা, পিসিরা বাপের দু-একটি বন্ধু মুক্তার, চুনির ও পান্না সেটিংএর লেশপিন, আংটি, ছোট নেকলেশ, ইযারিং কতকগুলি দিয়াছিলেন কিন্তু সে সব সর্ব্বাণী তাকে পরাইতে দেয় নাই। সে তো তার বাপের দেওযা যৌতুকধন নয, বাপ যখন মন্ত্র পড়িবেন, 'সালঙ্কারা কন্যা' ইত্যাদি বলিযা তাঁর মধ্যে অন্যের দত্ত বস্তু সে কেন পরিবে? নিজের পিসি অনিবার্য্য কারণে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু দামী কাশ্মীরী শাড়ীর সঙ্গে চমৎকার ব্রেসলেট পাঠাইয়া দিযাছিলেন, সেটি সে ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিযাছে। ঐ কয়েকটি মাত্র গহনা আর এ বাড়ীব মেযেরা যেমন লাল টকটকে বেনারসী শাড়ী বিবাহ কালে পবে তেমনি একটি মাঝারি দামেব শাড়ীতে সে সাজিয়াছে। গলায় ফুলের মোটা গড়ে মালা, মাথায সাদা সোলার মুকুট আর সিঁথি মৌড়ে কি যে অপূর্ব্বই তাকে মানাইয়াছে! কিন্তু ঐ নশ্বর ভঙ্গুর সল্প মূল্য বস্তু ক'টার দিকে কোন্ পাকা সংসারী বিজ্ঞ ব্যক্তির ক্রোধ-পরুষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে? হাত তুলিযা কান খুলিয়া খোপা ফিরাইয়া (একটা সোণার ফুল না প্রজাপতি সেখানেও ছিল) গলার কাপড় সরাইয়া তাঁহাকে দেখান হইল,—দেখিতে দেখিতে বজ্র-গর্ভ মেঘ-মেদুর আকাশের মতই তাঁব ভারি মুখখানি একান্তই ভযাবহ হইয়া উঠিল, কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "হুঁঃ! যেমন ভদ্রতা জ্ঞান, তেমনি জোচ্চুরি বুদ্ধি, সব দিকেই দেখছি আপনাদের এতটুকুন্ ত্রুটি ঘটেনি! হাজার হাজার টাকা নিয়ে আমার ঘরে মেয়ে দে'বার জন্যে বড় বড় লোক, বহু জজ ব্যারিষ্টাব, রাজা-জমিদার লালায়িত ছিল,—শিবে ব্যাটা গেল কোথায? হতভাগাকে একবার ভাল করে দেখে নিতুম যে। ঐ মণিকা বৌমাই তো যত নষ্টের গোড়া! ছেলের কানে কি যে মন্তর পড়লেন তিনি,—যাক্, নি'ন, এখন খোকা তাঁর বিদ্বান বউ এর পা ধুয়ে ধুয়ে জল খান গে'!" সরোষে ফিরিয়া গিয়া সুরঞ্জনের

উপর যে অনলোদ্গীরণ করিলেন, তার দাহিকা শক্তি কম হওয়া তো আর এর চাইতে সম্ভবপর নয়, ভাষা তার যেমন কটু, তেমনি কঠোর।

অসহায় সুরঞ্জন এতটুকু প্রতিবাদ করিতে ভরসা পাইলেন না, অবিনাশ বা শিবেশ্বরের উদ্দেশ্যে বার বার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন। উপহার সম্ভারের অপ্রাচুর্য্য তাঁরও চক্ষে দৃষ্টি-কটু ঠেকিয়াছিল বই কি! তবে ব্যাপারটা এমন করিয়া অকস্মাৎ ও খোলাখুলি ভাবে এই মূহূর্ত্তে উঠিয়া পড়িবে এ সন্দেহ তাঁর মনে জাগে নাই, জাগিলে চিরদিনের ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক আজ হয়ত শিবেশ্বরের মারফৎ একটা গোপন ঘুষের ব্যবস্থা করিয়া লইতেও বা পারিতেন,—কিন্তু সেই বা কোথায়? বরযাত্রীদের সুখ সুবিধা লইয়া ব্যস্ত আছে কোন দিকে, আগাইয়া আসিলেন অবশ্য অবিনাশ, এ সব ব্যাপার জানে না কিন্তু ঘুষ দিবার কথাটা তাকে সুরঞ্জন বলিতে ভরসা করিলেন না, নির্ঘাত সে সর্ব্বাণীর কানে এ কথাটা তুলিয়া দিতে বাকি রাখিবে না, মেয়ের মত লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি আদিখ্যেতা করার সে ত আদৌ পক্ষপাতী নয়, কিন্তু তারপর সুরঞ্জন যে তাঁর একমাত্র সন্তানের চোখে চিরদিনের মত ছোট হইয়া যাইবেন।

যাহোক অবিনাশেরই হাতে পায়ে ধরাধরিতে, বহু কাকুতি মিনতিতে এবং সেই সঙ্গে ফুলশয্যার তত্ত্বে লোকসান পোষাইয়া দিবার অঙ্গীকারে কতকটা নরম হইয়া অনমনীয় বরের বাপ একটি দীর্ঘ—"হুঁঃ!" উচ্চারণ করিলেন, "বেশ! 'পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে', এসেই যখন পড়েছি আপনাদের পাল্লায়, তখন উপায় কি? যাও খোকা! যাও, যেথায় ওরা নিয়ে যাচ্ছিল, যাও, কাজ চুকিয়ে এসো গিয়ে—"

অবিনাশের দিকে চাহিলেন, "ভ্যালা মশাই! খুব আদুরী মেয়ে তৈরী করেছেন আপনার দাদা! একটা সিবিলিয়ান মানুষ তার এতটুকু মুরোদ নেই?" অবিনাশ তোষামোদের হিসাবে,—তবে আন্তরিকভাবেই এ

মন্তব্যে সায় দিলেন,—"খুব সত্যি কথা! উনি ঐ রকমই বরাবর! এই আমরাই খেলতে খেলতে কত ধরে মেরেছি ছোটকালে, কখন টু" শব্দটি করেন নি।"

ছাড়পত্র পাইয়া বর আসিয়া ছান্দলাতলায় পৌছিল। পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়া মনটা তার একান্তভাবেই খিঁচড়াইয়া গিয়াছে, উৎসাহের জোয়ারে ভাঁটা পড়িতেও বাকি নাই, তথাপি বাপের ব্যবহারে এদের উপর তার সমস্ত মনের সহানুভূতি প্রবলতর হইয়া উঠিল। তা'ছাড়া ধরো এ দিনটাই বা কেমন? জীবনের মধ্যে এমন দিন তো আর তু'বার আসে না, এর সল্প-স্থায়ী সঙ্গীতময় রূপটুকুকে কি নষ্ট হইতে দিতে আছে? মনকে সরস রসে রসাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিল,—

"Hope, like the gleaming taper's light—
Adorns and cheers the way."—

আবার আকণ্ঠ আ-নিতম্ব অপরিমিত স্বর্ণালঙ্কারে, আর নিজের বিবাহ দিনের সনাতন রাঙ্গা বেনারসীর মোটা চেলিখানিতে সর্ব্বশরীর মুড়িয়া শাশুড়ীস্থানীযা মেজ গিন্নী অর্থাৎ মেয়ের মেজকাকীমা তাঁর মেদবহুল দেহ লইয়া কোন মতে বর বরণ সমাধা করিলেন। নানান্ সাজের সাজ করিয়া শ্যামা, কৃষ্ণা এবং গৌরাঙ্গিনী তন্বীরা বরণডালা ঘৃতদীপ জ্বলন্ত চিতার কাঠি শ্রীস্বস্তিক-সমন্বিত সমুদয় আনুষ্ঠানিক মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি হাতে মাথায় বহন করিয়া হাস্য রহস্য ছড়াইতে ছড়াইতে সাতপাক ঘুরিয়া বর কন্যার শুভদৃষ্টির শুভাবসর করিয়া দিল। চারিদিকে রব উঠিল,—"ক'নে আন,—ক'নে আন,—একি! এত দেরী হচ্চে কিসের?—লগ্ন যে ভ্রষ্ট হ'য়ে যায় গো! হ্যাঁরে! এই হোল কি ছাই? ওরে ও—"

কিন্তু কাহাকে আনিবে? কোথায় ক'নে? পিঁড়ির উপর বরের পরি-

ত্যক্ত চাদর ও চণ্ডীর পুঁথিখানা পড়িয়া আছে, কনের হাতের কাজললতাও সেইখানেই,—তার গায়ের সমস্ত অলঙ্কার-পত্র, মায সিঁথি-মৌড়, বেনারসী শাড়ী, ব্লাউজ সব, শুধু কনে নাই! সারা বাড়ী খুঁজিয়া কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। এয়োদের হাতের শাঁক অকস্মাৎ নীরব হইয়া হাতেই রহিয়া গেল। বাজনদারদের বাজনার মিলন-সঙ্গীতের তাল কাটিল, সুর থামিল, বরণডালার ঘৃত দীপগুলি বাদলা হাওয়ায় প্রায় একসঙ্গেই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল,—কনের উদ্দেশ নাই!

সারা বাড়ী খুঁজিয়াও যখন কনে মিলিল না, তখন আতঙ্ক মেয়ে মহলে উঠিল লজ্জা আর ছিছিক্কার,—হেঁট মুণ্ড পুরুষ মহলে উঠিল চাপা তর্জ্জন তার সঙ্গে প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস। শালগ্রাম শিলা-রূপী বিশ্বরাজ মনে মনে তখন কি ভাবিতেছিলেন সে তত্ত্ব তো আর জানা গেল না, পুরোহিত অস্ফুট ক্ষোভে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া উক্তি করিলেন, "এই সব বিপরীত কাণ্ডকারখানা অনুমান করেই তো আমি এ বিয়ে দিতেই চাই নি বাপু! কেলেঙ্কারী! সুরঞ্জন—গরদের জোড়-পরা সুরঞ্জন নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার মতই স্থির স্তব্ধ সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। তাঁর ভাগ্য বিধাতা তাঁকে লইয়া তাঁর আ-বাল্য আ-যৌবন যে নির্ম্মম ক্রূর নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া আসিতেছেন, তাহারই পুনরাবর্ত্তনে এবার বুঝি বা পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন! অথবা এখনও তাঁর জীবন-যজ্ঞের সমিধ আরও কিছু বেশী ঘৃতাহুতির প্রত্যাশা করিতেছে নাকি? এরপর আরও কিছু আছে? তাঁর অজ্ঞাত অপরাধের আরও কোন কঠিন দণ্ড পাইতে কি এখনও বাকি রহিল, না এইখানেই সব শেষ? জর্জ্জরিতী করিতে করিতে

দু একটা ফাঁসির হুকুম তাঁকে দিতে হইয়াছে বৈকি,—তাঁর নির্ভুল বিচারে হাইকোর্ট হইতেও হতভাগ্য দণ্ডিতেরা মুক্তি পায নাই, কিন্তু তিনি কখনও তো কাজীর বিচার করেন নাই! ইংরাজ রাজত্বে সে বিচার অচল হইযা গিয়াছিল, কাটিযা কাটিয়া জ্বলন্ত ক্ষতে লবণ নিষেক অথবা জীবন্ত মানুষকে ডালকুত্তা দিযা খাওযানো কিম্বা সুসভ্য আমেরিকানদের দৃষ্টান্তানুসরণে লিঞ্চিংল'কে কার্য্যকরী করিতে তাঁহাকে সেজন্য হয় নাই, তবে এক জীবনেই বা বারে বারে এমন একই কঠোর শাস্তি তাঁর কোন জন্মজন্মান্তরের ভূতপূর্ব্ব সঞ্চযের জের এ'? কিন্তু এ সব কথা ভাবিবারও সামর্থ্য তাঁর হযত তখন ছিলই না।

তেমনি ভাবেই ছান্দলাতলায কদলী বৃক্ষ বেষ্টিত শিলাপট্টে শিলাময় মূর্ত্তিতে স্তব্ধ অনড় হইয়া রহিল আরও একজন, সে এই বিড়ম্বনাপূর্ণ বিবাহ করিতে আসা বর।

বরযাত্রীর দল বিস্ময বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া ব্যক্তি-বিহীন প্রশ্ন করিতে লাগিল, কেবল একমাত্র বরকর্ত্তাই যতদূর পারিলেন চিৎকারে ও আস্ফালনে বর্ষণোন্মুখ মেঘ-মন্দ্রিত বজ্রনিনাদকারী গগনকেও বিকম্পিত করিযা তুলিলেন। সে আক্রমণের প্রতিবাদ করিবার মত এ-পক্ষের কাহারও মুখে ভাষাও ছিল না, ভরসাও ছিল না। বরযাত্রীদের আহার শেষ হইযাছিল, মেঘ ঘিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া বিদায় লইয়া যে যার বাড়ী ফিরিতে চায়, আবশ্যকও বটে; কিন্তু বিস্ময়াতিশয্যে সে কথা বোধকরি কাহার মনেও পড়িল না। বিবাহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ক'নে-চুরি,—এরূপ অপূর্ব্ব রহস্য তাহারা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসেও কোনদিন পাঠ করিয়াছে কি না স্মরণে আসিল না।

ক'নে পাওয়ার আশা যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন সকাল হইতেও বড় বেশী বাকি নাই। তখন পর্য্যন্তও ঠিক তদবস্থ সুরঞ্জনের কাছে

আসিয়া তাঁর কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বেকার ভাবী-বৈবাহিক মহাশয় প্রায় জলদগম্ভীর নিস্বনে সমবেত সকল ব্যক্তিকেই শুনিতে বাধ্য করিয়া কহিলেন,—

"ভগবান যা' করেন, ভালর জন্মেই করেন,—এ আমি মনের সঙ্গেই মানি।—আপনার কন্যা যে আপনার পথে ভালয় ভালয় স'রে দাঁড়িয়েছেন, এতে তাঁকে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিচ্চি! যাক্, এখন আমাদের কর্ত্তব্যটাও এই সঙ্গে স্থির হ'য়ে যাক্। সে-মেয়ে পাওয়া গেলেও আমি আর তাঁকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলতে পারব না, সে হয়ত আপনি বুঝতেই পেরেছেন? তবে আপনার বাড়ীতে আপনারই খুড়তুতো ভায়ের যে বিবাহযোগ্যা কন্যাটি রয়েছে, তাকে দেখলাম,—সুন্দরী না হ'লেও সেটি চলনসই বলা যায়—বিয়েয় আমার সত্যি ক'রেই ঘেন্না ধরে' গ্যাছে,—আপনার সম্মতি থাকলে উনি খোকাকে ঐ কন্যাটি দান করতে পারেন। এতে উভয় পক্ষের কতকটা লজ্জা রক্ষা হবে ব'লেই আমার ওঁদের একান্ত উপরোধে একার্য্যে সম্মত হওয়া নতুবা যে ঘরে এসব ঘটনা ঘটে, সে ঘরে আবার যে কুটম্বিতা করি সে-প্রবৃত্তি আমার আদপেই ছিল না। আবার অতীতের কাহিনীও তো কিছু কিঞ্চিৎ শুনলুম!"

সুরঞ্জন কলের পুতুলের মতই অশ্রুত শব্দে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক মেজভাই-এর আকর্ষণে তাঁকে নিজের আসন ছাড়িয়া দিলেন। সর্ব্বাণীর গায়ের গহনা তার পরিত্যক্ত লাল রংয়ের সেই বেনারসী শাড়ী,—যে শাড়ী পরিয়া তাকে নাকি লক্ষ্মী প্রতিমার মত দেখাইতেছে বলিয়া মেজ কাকীমাই একটু আগে তাহাকে সোহাগ জানাইয়াছিলেন,—সুলোচনাকে সে সব পরান হইলে সর্ব্বাণীর পরিত্যক্ত সেই পিঁড়ীর উপর উহাকে বসান হইল। বৈবাহিক অনুষ্ঠানের মধ্যে চণ্ডীর পুঁথি কোলে লইয়া মুখের ভিতর একটা আস্ত সুপারি সে পুরিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে

সবুদি’র জন্য কাঁদিয়াছে, সে কান্নার অশ্রু বিন্দু তখনও গালে তার শুকায় নাই,—ঠোঁটের গোড়ায় একটুখানি হাসিও সেই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল,—দুজনকার ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখিয়া। সুরঞ্জন আস্তে আস্তে তাঁর নির্দ্দিষ্ট কক্ষটিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, অবিনাশ ব্যস্তভাবে সঙ্গে আসিয়া বলিলেন,—“বর কর্ত্তাকে দুটি হাজার টাকার চেক একটা শীগ্‌গির লিখে দাও বড়দা! নৈলে এ বিয়েও হবে না।” সুরঞ্জন নীরবে ভাইয়ের আজ্ঞা পালন করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

বর-বরণ হইয়াই গিয়াছিল,—ক’নেকে সাতপাক ঘুরাইয়া শুভদৃষ্টিটা করাইলেই সকল লেঠা চুকিয়া যায়,—তার পর গোটা দু’চ্চার মন্ত্র পড়িয়া সম্প্রদান! কিন্তু—বর কই?—বর কোথায়?—এই তো কতক্ষণ হইল তার বাপকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, ‘বাড়ী ফেরার আর দেরী কিসের?’ এই তো সে তার নূতন-বিবাহের সংবাদ শুনিয়া অত বড় দুর্দ্দান্ত বাপের মুখের উপর দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া ছিল, “না বাবা! বিয়ে আমি কর্‌ব না।”—এবং তার বাপ তাকে এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, “তোমার মতামত আমি তো চাইনি, খোকা! তুমি চুপ করে থাকো।”

তার পর? গেল কোথায়? কেউ জানে না! মায় দরজার কাছে ভিড় করা বাজে লোকেরা পর্য্যন্ত না, বাজনদারেরা তো সেই ক’নে হারানর পরই বাজনা বন্ধ করিয়া নিঝুম হইয়া থাকিয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পথের একপাশে ভাঁড়, খুরি, কলাপাতা ও উচ্ছিষ্টের স্তূপ জমা হইয়া আছে, দু’ তিনটে কুকুর এই ভোরেই তার লোভে ছুটিয়া আসিয়াছে, তারা জানে এখনই ময়লা-ফেলা গাড়ী আসিয়া পৌছিবে, এইটুকুই যা তাদের অবসর। নিত্যকার গঙ্গাস্নানের যাত্রীগণ কোনমতে টিপি-টিপি বৃষ্টিতে পা টিপিয়া টিপিয়া পথ চলিতেছিল। একটা

বৈরাগী খঞ্জনী বাজাইয়া 'রাই জাগো, শ্যাম জাগো'—গানের ধুঁয়া ধরিযা চলিয়া গেল। এই বাড়ীর পরের একটা বাড়ী বাদ দিয়া তার পরের বাড়ীটাতেও সে-রাত্রে বিবাহ ছিল। এতক্ষণে সেখানকার বৈবাহিক ব্যাপার সমস্তই নির্ব্বিবাদে চুকিযা গিয়া কোলাহল শান্ত হইয়াছে। বর-ক'নেকে লইয়া যারা বাসর জাগিতেছিল, তাদের একজনকার গলার গান এতক্ষণে এ-বাড়ীর স্বল্প গণ্ডগোলের মধ্যেও একটু একটু শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল।

গায়িকাটি বোধ করি বরের শ্যালিকা হ'ন না, ঠান্‌দিদি হ'ন, যেহেতু গানটি আধুনিক গান নয, তিনি একটি পুরাতন গানই গাহিতেছিলেন। তার সব কথাগুলি বুঝিতে পারা যায় না, তবে দু'একটি কলিই ঘুরিযা ফিরিয়া করুণ সুরে কানে আসিযা বাজিতেছিল,—

"ত্যেজ সখি! নিঠুর নটবর আশ,—
যামিনী শেষ হ'লো সকলি নৈরাশ!
কুম্‌কুম্‌ চন্দন, গন্ধ উপচার,—
ভাসায়ে দাও সখি! বক্ষে যমুনার—
ও প্রেম ভাসাযে দাওলো,—
প্রেম ফিরায়ে লহ কানুকী পাশ—"

৬

উৎসবের বাতি সেই যে শ্রাবণ নিশার ঝড়ের দাপটে ও বাদলের অশ্রুধারায় নিবিয়া গেল, বসন্তের মধুযামিনীর পুনঃ পুনঃ গতায়াতেও আর তাঁহা জ্বলিল না। জ্যোৎস্নায় রূপালী আলো সারা ধরণীর বক্ষ প্লাবিত করিয়া সহস্র ধারায় বহিয়া গেল, চামেলী, চম্পক,

মালতী, মল্লিকা, জুঁই, বেলী, শেফালিকা তাদের গন্ধে ভরা ফুলের ডালি বারে বারেই সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল, পথে পথে কতই মিলনের বাঁশি বাজিয়া বাজিয়া শ্রান্ত হইল,—যে শুভ অবসর সেদিনের মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ ব্যর্থ হইয়াছে—আর তাহা ফিরিয়া আসিল না। যা' যায়, আর কি তা' ফিরিয়া আসে? অতীত,—হারান অতীত, ফুরান অতীত চারিদিক দিয়া হাহাস্বরে বলিয়া ওঠে,—না, না, না, না,—

সর্ব্বাণীকে ফিরিয়া পাওয়া কঠিন হয় নাই,—যেহেতু—সে হারায় নাই। তেতালার একটি চোরা কুঠুরীতে ভাঙ্গা ফার্ণিচার ও ছেঁড়া গদীর পিছনে সে হাত পা মুড়িয়া পড়িয়া ছিল,—একপ্রহর বেলা হইতেই ছেঁড়া গদীর তুলা মাখিয়া কিংকঙ্গের মত কিম্ভূত মূর্ত্তিতেবাহির হইয়া আসিল। তখন পুলিসে খবর দেওযা হইবে কি হইবে না তাই লইয়া বাড়ীতে বিলক্ষণ দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। পাঁচ জনের পাঁচ কথায় গণ্ডগোলটা ভাল করিয়াই পাকিয়া উঠিয়াছে। মেজকাকা রুখিয়া রুখিয়া চোখা চোখা বাক্যবাণে বিরাট শোকের প্রকট মূর্ত্তি সুরঞ্জনকে প্রাণপণে বিঁধিতে সচেষ্ট রহিয়াছেন। কিসের যে তাঁর এতই গাত্রদাহ সে তো সহজেই বুঝিতে পারা যায়! যদি এই সুযোগে এত সহজে তাঁর কন্যাদায় উদ্ধার হইয়া যাইত তবে ঐ মানুষটিই মনে মুখের কত মধুই না ওই হতভাগ্য বাপের উপর বর্ষণ করতে ব্যগ্র রহিতেন! আর সবার মনে গত সন্ধ্যার অভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলী হইতে আর যাই হোক স্বার্থ সম্পর্কীয় গোষ্ঠী ব্যতীত অপর সকলেরই চির-নির্ব্বিরোধী সুরঞ্জন বেচারার প্রতি প্রবল সহানুভূতি ব্যতীত বিদ্বেষের লেশমাত্র বর্ত্তমান ছিল না, বিশেষতঃ মেয়েমহলে। সেখানে সকলেই এই একটি কথা বলিয়াই খেদ করিতেছিল যে "বুড় বাপের কথাটা হতভাগী একবার ভাব্‌লে না? কি দজ্জাল মেয়ে বাবা!"—এঁদের মধ্য হইতে কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন, "অমন মেয়েকে—হেঁটে কাঁটা উপুড়ে

কাঁটা দিয়ে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলতে হয়!" আর একজন তাঁর কথায় প্রোৎসাহিত হইয়া সায় দিলেন, "হ'ত আমার মেয়ে, কেটে কুচিয়ে হেঁটে কাঁটা উপুড়ে কাঁটা দিয়ে পুঁতেই তো ফেল্‌তুম। এতবড় আস্পর্দ্ধা মেয়েমানুষের! দাঁড়িয়ে বাপের মুখটা পোড়ালে!"

সর্ব্বাণীকে আবিষ্কার করিল সুলোচনা। কি জানি কি ভাবিয়া অথবা কিছু না ভাবিয়াই সে গিয়াছিল তেতালার ছাদে, ছাদে গিয়াও যখন দেখিল এখানেও তার নিস্তার নাই, পাশের বাড়ীর লোকেরা তাদের ছাদের আলিসার ফোকরের মধ্যে চোখ রাখিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে এবাড়ীর রহস্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত, তখন সে তার অদম্য অশ্রুজলকে প্রাণ ভরিয়া উৎসারিত করিয়া দিতে ছুটিয়া গিয়া চোরা কুঠুরীর দোর খুলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তার দু'চোখ দিয়া ঝরা জল চোখের কোলে আপনিই থামিয়া গিয়া গভীর বিস্ময়ের স্মিত রশ্মিপাতে অশ্রু-স্নাত মুখখানাকে সস্মিত করিয়া তুলিল। একটা অপরিমেয় হর্ষোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া সর্ব্বাণীকে সে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিল।

"সবুদিদি! সবুদিদি! ওমা তুমি এখানে!"

সর্ব্বাণী তখন সারা দিনরাত্রির অনিয়ম ও উত্তেজনার পর গভীর অবসাদে আচ্ছন্নের মতই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছিল,—যেন সেই বরের সঙ্গেই তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—ফুলশয্যার রাত্রি—ঘুমন্ত সর্ব্বাণীকে যেন বর নির্দ্দয় হস্তে নাড়া দিয়া কঠোর কণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছে, "এই! ওঠ্ না! মোষের মতন প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবার জন্যেই তোকে বিয়ে ক'রে এনেছি নাকি?"—শুনিয়া সর্ব্বাণীর যেন সর্ব্বশরীরে আগুনের জ্বালা ধরিয়াছে, সেও ঠিক তেমনি কঠিন মুখে তার দিকে মুখ ফিরাইয়া অতখানিই কঠোর সুরে কোন কিছু বলিবার জন্য যেমন মুখ খুলিতে যাইবে—অমনই তার তন্দ্রাচ্ছন্ন কাণে বাজিয়া

উঠিল,—হতভাগ্য প্রত্যাখ্যাত স্বপ্নের ববের কঠোর কণ্ঠেব পরিবর্ত্তে হর্ষোচ্ছ্বসিত কোমল কণ্ঠ ডাকিতেছে,—সবুদিদি! সবুদিদি! তুমি এখানে!”

সর্ব্বাণী ঘুম ভাঙ্গিযা ধডফড় করিযা উঠিযা বসিল, সঙ্গে সঙ্গে সব কথাই তাব মনে পড়িয়া গেল। গত রজনীর উৎসব-সমারোহ, তার পূর্ব্ববর্ত্তী সারাদিনের কত নিয়ম কানুন, তারপব তাব ভাবী-শ্বশুরের আসন্ন-বর্ষী নব জলধব সমতুল্য মুখ কান্তি লইযা পুলিস কমিশনারের মত সদর্প গৃহ প্রবেশ ও খুনী-আসামীর মতই তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সার্চ্চ কবা, তাব বাপের বিরুদ্ধে ইতরেব মত অকথ্য অশ্রাব্য কটূক্তি বর্ষণ—

সর্ব্বাণী অবাক্ হইযা গেল। কোন দুষ্ট গ্রহের প্ররোচনায—কোন দুষ্ট-সবস্বতীর মন্ত্রণা বশে সে এই অপরিজ্ঞাত ভুল পথে এতদুর পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল? কোন্ দুঃস্বপ্ন তাহাকে ঘেরিয়া থাকিযা তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, প্রাণের চেযেও শত-প্রিয়, তার রক্ষা-কবচরূপী বাপের নিঃসঙ্গ জীবনের অবলম্বন ও সাথী স্বরূপে ঐ নৈর্ব্যক্তিক অজানা অচেনা অপরিচিত লোকটাকে সংগ্রহ কবিবার এই ফাঁদ পাতাইযা ছিল? তাব বিবাহের চিন্তা হইতে সে তাঁকে মুক্তি দিতে চাহিয়া, তাঁর দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য কামনা করিযা এই যে নরমেধ-যজ্ঞেব আযোজন করিয়াছে, তাঁর কোন পরামর্শ, কোন সাবধান বাণী কানে দ্বিধাপূর্ণচিত্তে তোলে নাই, নিজেকে সেই মহাযজ্ঞের বলি স্বরূপে উৎসর্গ করিতে গিয়াছে, সে যেন একটা অভিচার ক্রিয়া! মারণ মন্ত্রে সে তাঁহাকেই তার ভাগ্যদেবতার পায়ে উৎসৃষ্ট করিয়াছে,—যাঁহাকে সে প্রাণপণে সংসারের সকল দুঃখ, সকল গ্লানি, সর্ব্ববিধ চিন্তাজাল হইতে বিমুক্ত রাখিতে চাহে!—কিন্তু ওঃ, ভগবান তুমি নাই কে এমন কথা বলে? এখনও তার আদত ক্ষতি হইতে সম্পূর্ণই বাকি আছে, সর্ব্বনাশ

এখনও তার ঘটিতে পায় নাই!—মুহূর্ত্তে উঠিয়া বধূ-বেশিনী তার সমস্ত প্রসাধন দ্রুত হস্তে খুলিয়া ফেলিয়া নিজের পরিত্যক্ত শাড়ী ব্লাউস গায়ে গলাইয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া রান্না বাড়ীর দিকে উন্মাদের মত ছুটিয়া গেল। বর দেখিতে সবাই ওদিকে গিয়াছে, তাই কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না। সেই দিক দিয়া একটা পরিত্যক্ত সিঁড়ি যে তিনতলার ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে,—সে তাহা আগেই দেখিয়াছিল, ভাঙ্গা-ছেঁড়ার গুদাম ঘর চিলে-কোঠার দ্বার পর্য্যন্ত।

সহসা সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ওরে স্নুলু! আমার বাবা!—তিনি,—তিনি কি,—"

"বেঁচে আছেন?" প্রশ্নটা তার গলার কাছে আসিয়াই বাধিয়া গেল। এই কাণ্ডের পর কি অপমানের ঝড় এবং এই হতভাগা মেয়ের জন্য কি ভয়ানক দুশ্চিন্তার তরঙ্গাভিঘাতই না তাঁর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে! কি সাংঘাতিক মেয়ে সে, তাঁকে সে কা'দের কবলে ফেলিয়া দিয়া চোরের মত লুকাইতে আসিল! স্নুলোচনা ততক্ষণে অনেকখানি সামলাইয়া লইয়া ছিল। সর্ব্বাণীর ধূলি-ধূসরিত ও তূলা মাখা আর্ত্ত-আলিঙ্গনে আপনাকে সে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া তার দ্রুত স্পন্দিত বুকের উপর অশ্রু চিহ্নিত মুখখানা সবলে গুঁজিয়া দিয়া প্রগাঢ় স্বরে উত্তর করিল, "তাঁর কথা এতক্ষণে তোমার মনে পড়লো? জানো না কি তাঁকে এর জন্যে কতখানি সইতে হচ্চে? এমন কাজ তুমি কি করে করলে সবিদি? ওঁকে তুমি এই ভালবাস?"

গত রাত্রে তার বাপের ষড়যন্ত্র মত তার বিবাহ যে সবুদির বরের সঙ্গে ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই, সে সময়ে হয়ত তাহাতে তার আত্মাভিমান কিছুটা ব্যাহত হইয়াছিল। বাড়ীর জটিল সমস্যার কথা ভাবিয়াও ঐ দুজনকারই ভাবী-পতির উপরেও একটু অভিমানের সঙ্গে

অপমানবোধও জাগিয়াছিল, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মনে হইল ভাগ্যে উহা ঘটে নাই, সে হইলে সর্ব্বাণীকে সে মুখ দেখাইত কেমন করিয়া ?

সর্ব্বাণী কাতর কণ্ঠে কহিতেছিল, "সত্যি বল্ ভাই! বাবা বেঁচে আছেন ত ?"

চটকাভাঙ্গা হইয়া সুলোচনা জবাব দিল, "আছেন বই কি !" গভীর সহানুভূতিতে সান্ত্বনা স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "বেঁচে আছেন।"

সর্ব্বাণী তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা সুলোচনার কুণ্ঠিত স্বরেই প্রত্যক্ষ করিল। "বেঁচে আছেন"—ঠিক বলিয়াছে সুলোচনা,—রাত্রের সেই কাণ্ডের পরে ঐ কসাই জাতীয় লোকটির হাতে তার অনন্যসহায় বাপকে ছাড়িয়া রাখিয়া নিতান্ত ভীরুর মত লুকাইয়া থাকিয়া তাঁর প্রতি কত বড় অন্যায় যে সে করিযাছে সেই কথা ভাবিয়া তার সারা অন্তর তাকে ছি-ছি করিয়া উঠিল। বাপের তার এপক্ষ ওপক্ষ সকল পক্ষ হইতেই দুর্দ্দশার যে কিছুমাত্র বাকি থাকে নাই, সে তা' স্পষ্টই বুঝিল। সুলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপদগুলো বিদেয় হয়েছে রে ?" অনুকূল উত্তর পাইয়া তাহাকে টানিয়া বলিল, "চল্ ভাই সুলি!—বাবার কাছে যাই।" সিঁড়ি বাহিয়া সে যেন ঝড়ের বেগে নামিয়া গেল। অসহায় ও অবমানিত সুরঞ্জনের প্রতি সহানুভূতিকারী এ-বাড়ীতে যে একজনও বর্ত্তমান নাই, সে কথা সে তো ভালরূপেই জানে, জানিযা শুনিয়াও এ দুষ্কর্ম্ম সে কেন করিল ?

"বাবা!" বলিয়া ডাকিয়া মেয়ে আসিয়া যখন সুরঞ্জনের গলাটা বরাবরকার মতই দু'হাতে জড়াইয়া ধরিল, সুরঞ্জন তাকে একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, শুধু নিজের শ্লথ দুখানা হাত দিয়া আর সেই সুদৃঢ় বন্ধনযুক্ত বাহু দু'টিকে গভীর স্নেহে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ক্ষীণ দুইটি অশ্রুবিন্দু অত্যন্ত সন্তর্পণে ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু

চিব ধৈর্য্যশীল সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিমান প্রতীক সুরঞ্জন তখনই ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যকে তাঁর চিত্তগুহায়,—যেখানে তাঁর বহু অশ্রুকেই কঠিন হিমশিলায় পরিণত হইয়া জমিতে দিয়াছেন, সেই উত্তর মেরুর মত,—অন্যের অ-প্রবেশ্য রাজ্যে চাপিযা ফেলিলেন। মুখে তাঁর শোকের ভয়ার্ত্ততাও গত রাত্রে যেমন ফুটিতে সাহায্য পায় নাই গভীর আনন্দের হর্ষোচ্ছ্বাসও তেমনি সুস্পষ্টরূপে ফুটিতে পাইল না। শুধু চোখের দৃষ্টি ও আঙ্গুলের স্পর্শই সর্ব্বাণীকে জানাইয়া দিল সে তাঁর ক্ষমা পাইয়াছে।

কিন্তু সুরঞ্জন তাঁর হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়া না হয় কৃতার্থ হইয়া গিয়া তার অতবড় অন্যায়ের—তার একান্ত অসঙ্গত কৃতকার্য্যের কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত না চাহিতে পারেন, বাড়ীর লোকেরাও তো আর সুরঞ্জনেব মত ক্ষেপিয়া যান নাই! তাঁরা এতবড় মেয়ের এতবড় কু-কীর্ত্তি, এতবড জঘন্য বেয়াদবি মুখ বুজিয়া সহ্য করিবেন কেমন করিয়া? এই যে কাণ্ডটি সে ঘটাইল এর জন্য শুধুই কি সর্ব্বাণী-সুরঞ্জনের কলঙ্ক? তাঁদের বাড়ীরও কি এতে নাম ডুবিল না? এর পর এ-বাড়ীর মেয়েদের কেহ বিবাহ করিবে? ধৃষ্টতার কি একটা সীমাও নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না? অত্যন্ত কঠিন মুখে মেজকাকা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি হইতে পদপাত পর্য্যন্ত সমস্ত মিলিয়া তাহাকে তারস্বরে চীৎকার করিয়া শাসন করিতে করিতে আসিল। তাঁর দিকে চকিতে চাহিয়াই সুরঞ্জন সভযে মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তাকে সংসারের সকল আঘাত হইতে ঢাকিয়া রাখিতেই তো তিনি চিরদিন চেষ্টা করিয়াছেন, আজও এই ভাবনাটাই যে তাঁর মনে প্রধানতম হইয়া উঠিয়াছিল।

মেজকর্ত্তা কোন ভূমিকা না করিয়াই কথা আরম্ভ করিলেন; বলিলেন—"তুমি যা' কর্‌লে, এর পরে কি আমরা আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পার্‌ব?"

সর্ব্বাণী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নত নেত্রে বাপের পায়ের কাছে বসিয়া তার আলতা-পরা পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া মনে হইল কথাগুলা বুঝি বা তার কাণেও যায় নাই।

মেজকর্ত্তা কঠিন মুখে আরও কিছুটা কঠোর কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন—"ভদ্রলোকের ঘরে জ'ন্মে, লেখা-পড়া শিখে, মানুষ যে এতটাই ইতর হযে যেতে পারে এ তোমার এই কাণ্ড দেখ্‌বার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! সাধ ক'রে কি লোকে মেয়েদের বেশী লেখা-পড়া শেখায না! খামকা একটা ভদ্রলোককে এই যে তুমি নাজেহাল আর নিছক অপমানটা করালে মনে করেছ কি এর পর আর তোমায় কেউ বিয়ে কর্‌তে রাজী হবে? তোমরা না মান্‌তে পারো,—কিন্তু শাস্ত্র-মতে তোমার বিয়ে অন্যের সঙ্গে আর হয়ও না। দো'পড়া বা দ্বিচারিণীকে কে' বউ করবে শুনি? ছি ছি ছি! কি কাজটা তুমি কর্‌লে একটি বাব ভেবে দেখ দিকি? আমাদের না হয গলায় দড়ি দিয়েই লজ্জা নিবাবণ করতে হবে,—তুমিই বা লোকসমাজে মুখ দেখাবে কি করে?"

সুরঞ্জন ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া নড়িয়া উঠিলেন, একবারের জন্য কি যেন অস্পষ্ট স্বরে বলিলেনও, হাতখানাও মেয়ের গায়ের উপর দৃঢ়-সংসক্ত হইল,—সে-স্পর্শ যেন নীরব ভাষায় অনুনয় করিয়া বলিল, 'রাগ ক'রো না,—লক্ষ্মী আমার! যে যা' বলে বলুক, আমি তো কিছু বল্‌ছি নে'।—সর্ব্বাণী সে ভাষা বুঝিল, সে নীরব নতমুখে যথাকার্য্যে নিরত রহিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার শরীর তখন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, মাথা ঘুরিয়া বুঝি পড়িয়া যায়।

মেজকাকা তাহাকে বাক্য বিমুখী দেখিয়া বিজয়োল্লাসে সুর চড়াইয়া উচ্চরবে বলিতে লাগিলেন,—আশে-পাশের ও এ বাড়ীর অধিকাংশ

জ্যাঠাইমাই তাঁর গলার জোরে সেখানে আসিয়া জমা হইয়াছিল,—মায় কুটুম্ব-কুটুম দাসদাসীরা পর্য্যন্ত আসিতে বাকি রাখে নাই,—তাদের সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের আজই এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। এর পর এ-বাড়ীর সংস্রব আমরা আর কোন মতেই রাখ্‌তে পারি নে। এরপরে এম্‌নিতেই তো সুলোচনার বিয়ে দেওয়া দুর্ঘট হ'বে। এই যে গল্পটা এখন রটনা করা হচ্চে, এ'কি কেউ মন থেকে মানবে ভেবেছ? চোরা কুঠরী নিশ্চয়ই কাল খোঁজা হয়েছিল! পাশের বাড়ীর পাঁচিলে চ'ড়ে অনায়াসেই যে ওখানে যাওয়া আসা যায় একথা কে' না জানে? বিশেষ করে যখন ইতিপূর্ব্বে অতবড় একটা কুৎসিত কাণ্ডও ঘটে গিয়েছিল! আজ থেকে—"

সুরঞ্জন অব্যক্ত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—"অনুকূল!—"

"তুমি চুপ ক'রে থাক বড়দা! তোমার প্রশ্রয় না পেলে যতই হোক, এ-বাড়ীরও তো কিছু রক্ত ওর গায়ে আছে,—এতটা স্বেচ্ছাচারিণী কখনই হ'তে পার্‌ত না! তোমার কর্ম্মস্থানে যা' কর্‌তে হয় করুক্‌ গিয়ে, আমরা কখন কিছু বলিও নি, বল্‌তে যাবও না;—তবে সমাজের বুকের উপর ব'সে এরকম জঘন্য কাণ্ড আমরা কখনই বরদাস্ত কর্ব্বো না। পারোনি সেখান থেকে বিয়ে দিতে? আসিবে। সেকথা বলেই ছিলুম। কি দরকার ছিল তোমার আমাদের মাথা হেঁট কর্ব্বার? নাস্তানাবুদ কর্ব্বার?—আমি জান্‌তে চাই'—এর মানে কি,—আমি জান্‌তে চাই,—আমি জান্‌তে চাই এর মানে কি? বলো, বলো শীগ্‌গির বলো,—"

সর্ব্বাণী যেমন ছিল তেমনি রহিল, কিন্তু তার সর্ব্বশরীরে একটা তীব্র আক্ষেপ যে জাগিয়া উঠিতেছে তাহাও সুস্পষ্ট জানা গেল। একটুক্ষণ সেইরূপ থাকিয়া অন্তর্বিগ্রহে জয়লাভ পূর্ব্বক যখন সে মুখ তুলিল তার

স্বভাব স্নিগ্ধ মুখকান্তি কঠিন ও রোষ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে,—ধীর কণ্ঠেই সে অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিল,—

"কৈফিয়ৎ যদি আমার বাবা চাইতেন,—দিতুম; কিন্তু তিনি জানেন আমি তাঁর অপমান সইতে পারিনি। যারা তাঁকে অত বড় অপমান ক'বে তাঁর মেয়েকে তুচ্ছ শাক মাছের মত যাচাই কর্‌তে দ্বিধা করেনি সে-ঘরকে আমি আমার জন্মের ঘর কর্‌তে পারি নি ব'লে তিনি যে আমায় ক্ষমা কর্‌বেন না এ-বিশ্বাস আমার নেই। আর আপনারা,—আমার সঙ্গ যদি বিষাক্তই হ'য়ে উঠে থাকে,—যা' ভাল বোধ করেন তাই কর্‌বেন—আমার তা'তে কারুকে কিছুই বল্‌বার নেই।"

এই বলিযা সে বিস্ময়াশ্চর্য্যে প্রস্তরীভূত জনতার মধ্য দিয়া দৃঢ়পদে নিজের ঘরে চলিযা গেল, কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া বাপকে বলিয়া গেল, "কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি বাবা! তোমায় নিয়ে কালীঘাটে পূজো দিতে যাব, তুমি তৈরী হ'য়ে নাও।"

একজন হালদারের বাড়ী পিতাকে গচ্ছিত রাখিয়া পরের দিন সর্ব্বাণী তাদের বাসাবাড়ী উঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে ফিরিয়া আসিল। দেখিল মেজকাকা সপরিবারে গতকালই রওনা হইয়া গিয়াছেন, আরও অনেকেই চলিয়া গিযাছে। আজও আবার অবশিষ্টরা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাড়ী ফেরার জন্য তল্পি বাঁধিতেছে। সর্ব্বাণী আসিয়া বিনীত-ভাবে প্রণম্য সকলের পায়ের ধূলা লইল, ট্রাঙ্ক-ভরা শাড়ী বাহির করিয়া যথাযোগ্য সকলকে বণ্টন করিযা দিল, পথখরচা মিষ্টির হাঁড়ি যার যত পাওনা কাহাকেও দিতে সে বাকি রাখিল না। যাঁরা চলিয়া গিয়াছেন, কারও পার্শ্বেলে কারও লোক মারফৎ তাঁদেরও প্রাপ্যগুলি পাঠাইবার ভার ছোটকাকার প্রতি অর্পণ করিয়া রাত্রে সে হালদার বাড়ী ফিরিয়া গেল। শিবেশ্বর জ্যেঠার ভয়ে সেখানে না গিয়া এই

চির.ড়ীতেই পড়িয়া আছে, মণিকা তার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া দে'বর পক্ষের সঙ্গে চ'লিয়া গিয়াছে। শিবেশ্বরকে বাড়ী আঁগলাইবার ভার দিয়া বলিয়া গেল, বাড়ী খালি হইলেই যেন সর্ব্বাণীকে সে খবর দেয়, যতক্ষণ একটি মাত্র লোক এ-বাড়ীতে থাকিবে, তার বাপকে সে তাদের মধ্যে আসিতে দিবে না।

এমনই করিয়া সুরঞ্জনের আদরিণী কন্যার জীবনাকাশ শ্রাবণ রাত্রির যে নিরেট কঠিন কালো মেঘে জমাট বাঁধিয়া গেল, সে মেঘ আজও তার উপর হইতে কাটিল না, হয়ত কোনদিনই তার জীবনের ঐ মেঘমুক্তি এ জীবনেই ঘটিবে না!

এরপর ঐ একমাসের ভাড়া-করা বাসায় থাকিয়াই বাপকে দিয়া সে তাঁর অন্যত্র বদলীর ব্যবস্থা করিয়া লইল। ওখানে সে আর ফিরিয়া যাইতে পারে না, মণিকা যে তাহাকে জীবনে ক্ষমা করিবে না ইহা অত্যন্তই স্বাভাবিক। যদিও সে-ই তার জীবনের রাহু হইয়া আসিয়া এতবড় বিপ্লবটাই ঘটাইয়াছে, তথাপি দোষ তার দিক হইতেও তো নেহাৎই সামান্য নয়! কি অদ্ভুত বোকা সে! এমন কেউ থাকে?

আর সেই পলাতক ছেলেটি? তার খবর আমাদের কিছুই জানা নাই,—তবে এরপর একটি বিজ্ঞাপন ইংরাজী বাংলা সাপ্তাহিকে ও দৈনিকে কিছুদিন ধরিয়াই বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল,—অবশ্য সেটা উহারই উদ্দেশ্যে কি না তা'ও তো সঠিক বলা চলে না!

সে এই :—

—খোকা!

ফিরে এস,—আমরা একান্ত কাতর। বিবাহের কথা বলিব না।—তোমার বাবা।

তারপর তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর!

সংসারের কত ভাঙ্গা-গড়া, কত উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনা করিয়া কাটা কবিতে মহাকালের বক্ষে নিত্যকালের চিরপ্রবাহিত স্রোতধারা অবাধ গতিতে নিযতই প্রবাহিত হইযা চলিয়াছে, এই তিনটি বৎসরও তাহারই মধ্যে একে একে বিলীন হইযা গেল। ভবিষ্যৎ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এর দান কতখানি তার পরিমাপ আমরা করিতে যাইব না,—আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন-ইতিহাসের আলোচনাতেই প্রমাণ পাইয়া থাকি প্রত্যেক মানুষের জীবনে তিন তিনটি বৎসর খুবই তুচ্ছ নয়!

৭

ওই যে রেল-লাইনটি ছায়াচ্ছন্ন পথের সরল রেখার মত বহু দূর হইতে দূরান্তরে আসিয়া আরও সুদূরে চলিয়া গিয়াছে; অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয় বুঝি বা অতি ভোজন পরিপুষ্ট একটি অতিকায় অজগরের মতই সে সূর্য্যকরোজ্জ্বল শীত-মধ্যাহ্নে নিঃশব্দে পড়িয়া পড়িয়া রৌদ্র সেবন করিতেছে! সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রেও তাহাকে বাড়ীর ছাদ হইতে দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাণীর মনে হইয়াছে সার্চ্চ-লাইটের বিচ্ছুরিত দীপ্তালোক যেন ঐ বিশ্রামশীল অজগরটার মাথার মণি দীপ্তি! আর ঐ রেল গাড়ীর তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ? ও-ও যেন ঐ বিরাট অজগরেরই রোষ-গর্জ্জন। শুদ্ধ প্রকৃতির সুপ্ত শুদ্ধতাকে সে যেন কাটিয়া চিরিয়া ফাঁড়িয়া দেয়। মেল প্যাসেঞ্জার মালবাহী নানা আকারের এবং নানা প্রকারের ট্রেনগুলিকে স্পষ্টই এ বাড়ী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এক-একটা কামরায় এক-আধটি মানুষ থাকে, আর বেশীর ভাগ কামরাই থাকে ঠাসা, সে সমস্তই সে দেখিতে পায়। মেয়েগাড়ীতে মেয়েরা কি রংয়ের শাড়ী পরিয়াছে তা'ও পশ্চিম ধারের বারান্দায় দাঁড়াইলে চোখে অস্পষ্ট থাকে না। সর্ব্বাণীর চেনা জানা কে-ই

।র

.ড়ীতেই

চির বর প৲পথ দিয়া কোথায়ই বা যাইবে ?—যদিই যাইত তো তাদের মুখও চেনা যাইত না কি ? তথাপি সর্ব্বাণীর মনের ভিতর যেন একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা করিয়া থাকে। একটু ক্ষীণ আশা, অকারণ ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা অহেতুকী প্রতীক্ষা কে' জানে কি,—মনের কোণে জাগিয়া ওঠে। ট্রেন যখন তখনই যায়, যখন তখনই আসে, দিনে রাত্রে কতবার তার হিসাব অবশ্য রাখা নাই,—সব সময়ই শিশুর মত কৌতূহল লইয়া সর্ব্বাণী সে ট্রেন দেখিতে দৌড়ায় তা' নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু দূর হইতে দূর-ভেদ্য, তীক্ষ্ণ সুরে ট্রেনের বাঁশী বাজিয়া উঠিলেই তার বুকের ভিতর ধ্বক্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগে। পথচলার সেই সাঙ্কেতিক বাঁশী যেন কোন্ অজানা রহস্যের গোপন বাণী সঙ্কেতে উচ্চারণ করিতে করিতে দূর হইতে কাছে আসে, আবার কাছে হইতে দূরান্তরে মিলাইয়া যায়। সর্ব্বাণী হয়ত তার হাতের কাজ লইয়া ব্যাপৃত থাকে, মন হয়ত অন্যমনস্ক হইয়া ঐ দূরের এবং অদূরের বাঁশী কান পাতিয়া শোনে। চলন্ত ট্রেনের কামরায় ভিড় করা মুখগুলির মাঝখানে যেন কোন্ একখানি তার পরিচিত মুখ তার না-দেখার সুযোগ লইয়া অপসৃত হইয়া গেল, এমনি একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তি বোধ মনকে তার উদ্বেলিত করিতে থাকে,—অথচ তার আছেই বা কে' ? আর এই লাইন ধরিয়া যাইবেই বা কে' ? যুক্তি নিজেই সেকথা বলে, কিন্তু মন মানে না। জানিয়া শুনিয়াও যদি সে নিজের সঙ্গে নিজেই এত বড় ছল চাতুরী করে, তবে আর উপায় কি ?

মণিকার সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা। শিবেশ্বরকেও আর সে দেখে নাই। আর তাদের সেই ছোট্ট ছেলেটা ?—কি ভালই না তাহাকে সর্ব্বাণী বাসিত ! সে না জানি কত বড়টি হইয়াছে ? নিশ্চয় মাথায় অনেকটাই লম্বা হইয়া গেছে ! পড়াশুনাও কিছু কিছু করে বই কি ! কে' পড়ায় ? শিবেশ্বর অথবা মণিকা ? মণিকারা সেখানেই আছে ত ?—সেই বহু

পরিচিত ছোট্ট বাড়ীটায়? সর্ব্বাণীর দেওয়া সেই বিগ্নোনিয়া লতাটা তাদের সামনের বারান্দার খাপ্‌রার চালের উপর সেই রকম লতাইয়া আছে নাকি? চৈত্র মাসের উতলা হাওয়া গায়ে লাগিয়া তাদের মুমূর্ষু শরীরের পরতে পরতে নূতন পাতার স্তবকগুলি তেমনি ম্যাজিক-শক্তির বিকাশ দেখাইয়া কি নবীন শ্যামলিমায় চিক্কণ হইয়া প্রকাশ পায়? বৈশাখের প্রারম্ভে তাদের ফুলের স্তবকগুলি জমকিয়া উঠিত। শীতের গোড়া হইতে সীজন ফুলের মরশুম,—সেও কি তারা আজও বজায় রাখিয়াছে? না—বোধহয়। আর তাদের সেই সাজানো বাড়ী ও বাগানটায় কে' এখন আছে? কত সাধেই না সে তৈরী করাইয়াছিল তার বাগানটাকে। কি কি ফুল সেখানে ফোটে? গাঁদাগুলা কত বড় হয়? সুইটপী আর সাদার ছিটা দেওয়া চার-থাক লাল পপী?—আচ্ছা, মণিকার কাছে তার স্মৃতি কি একান্ত ঘৃণ্য হইয়া উঠে নাই?—তারই শ্বশুর বাড়ীর অপমানে?

শিবেশ্বর কি আর কোন মেয়ে কিংবা ছেলেকে প্রাইভেট টিউশনীতে ওরই মত যত্ন করিয়া সংস্কৃত কাব্য পড়ান? মাণিক কি সত্যই তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছে? এই সব কথা তার জানিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু—চিঠি সে লেখে না। কি হইবে তাদের ক্ষতের মুখকে খুলিয়া দিয়া?

চুপ করিয়া বসিযা কোলের উপর সেলাই লইয়া ফোঁড়ের পর ফোঁড় তুলিতে তুলিতে এই সব কথাই সে ভাবে। যখন কোন কিছুই ভাল লাগে না, তখন বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসিয়া অথবা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া চিত্র করা পুতুলের মত নিস্পন্দ চোখে আরও অনেক কথাই চিন্তা করে। পিছন দিকের বাঁশবন হাওয়ায় নড়িয়া চড়িয়া পাতায় পাতায় সয়্‌সয়্ ঝড়্‌ঝড়্ শব্দ তোলে, ফলভার গৌরবে গৌরবান্বিত সমুন্নতশীর্ষ নারিকেল বৃক্ষগুলি তার দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকে, অনিবিড়-শাখ চম্পক বৃক্ষের ওপাশ দিয়া আচম্‌কা-ওঠা শুক্লা সন্ধ্যার নির্ম্মল চাঁদ

তাঁর সুস্মিত চোখে পরিহাস-প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া উহার ধ্যান-স্তিমিত মুখের দিকে সহাস্যমুখে চাহেন, অকস্মাৎ জাগিয়া ওঠা কোন্ একটি গৃহ-প্রত্যাশী শঙ্খচিলের কর্কশ শব্দে চকিত হইয়া সর্ব্বাণীর স্বপ্নভঙ্গ হয়। শ্রাবণ-সন্ধ্যায় রিম্‌রিম্ ঝিম্‌ঝিম্ বর্ষণের ধারা ঝরিয়া পড়ে, গুরু গুরু মেঘের ডাকে পুরাতন অট্টালিকার জনশূন্য ঘর-দ্বার, জানালার শার্সি, দেওয়ালে ঝুলানো বড় বড় তৈলচিত্র, বৃহদায়তন আয়না, আল্‌মারী সমস্তই ঝন্ ঝন্ ঝম্ ঝম্ শব্দে কাঁপিযা ওঠে। লিক্‌লিকে বিদ্যুতের লেলিহান রসনা আকাশের গায়ে সাপ খেলানোর ঢঙে মুহুর্মুহুঃ খেলা করিতে থাকে। বন্ধ দরজার ওধারে প্রাণপণে ঠেলা দিতে দিতে ঝড়ো হাওয়া গর্জ্জিয়া ওঠে,—হুউ—উ—!

সর্ব্বাণীর এমনই আর এক সন্ধ্যার কথা মনে জাগে বইকি! সেদিনও এই শ্রাবণ-ধারার বর্ষণ রবে বিচিত্র শব্দলহরী ঢাকা পড়িয়াছিল। বিদ্যুতের দীপ্ত শিখায় সর্ব্বাণীর মনে একটা অজ্ঞাত আলো-আঁধারের খেলা চলিয়াছিল, আজিকার মত এমন নির্ব্বিকার নীরন্ধ্র ধূসরতায় মন কিন্তু তখনও এমন করিয়া চাপা পড়িয়া যায় নাই।

যে কাজটা সেদিন সে ঝোঁকের মাথায় করিয়া বসিয়াছে, সে জন্য মনে কি তার একটুও অনুতাপ জাগে নাই?—তার কর্ম্মফলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তাদের পরিত্যাগ করিয়াছে, তার সঙ্গ বাড়ীর বৌ মেয়েদের পক্ষে নাকি বিষতুল্য, এই অজুহাতে মেজকাকা তাদের দেশে ফেরার নামেই এখানের বাস উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁর দেখাদেখি এবং তাঁর ভয়ে অন্যেরাও এবাড়ীর সংস্রব ছাড়িয়াছেন। সর্ব্বাণীর এতেও মনে খুব বেশী ক্ষোভ ছিল না কিন্তু সে বুঝিতে পারে, ইহাতে তার বাপের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। আপনার জনদের তিনি যে অন্তর দিয়াই স্নেহ করিতেন। তিনিই সকলের বড়, তাই সবার সম্বন্ধেই তিনি নিজেকে

যেন একটা দায়িত্বের পদে আরূঢ় করাইয়াছিলেন। স্মরিয়া বলিলেন, সে বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে বুকে তাঁর কম ব্যথা বাজে নাই।
সর্ব্বাণীর প্রতি এই মিথ্যা অপবাদে তাঁর ভাঙ্গা মন একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একান্ত অনভিজ্ঞ জীবনের তীব্র অভিমানকে নির্ব্বোধের ধৃষ্টতাকে কলঙ্কে ভরাইয়া দিতে আপনার লোক হইয়াও যাঁদের বাধিল না, তাঁদের না করা যায় ঘৃণা, না করা যায় ক্ষমা,—স্নেহ ভালবাসা তো আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না! যত অপরাধই তার থাক, সত্য করিয়া পাপ তো সে কিছুই করে নাই, এমন করিয়া তাকে পরিত্যাগ করার কি প্রয়োজন ছিল?

সুরঞ্জন মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছেন। সেই নির্ম্মম আঘাত তাঁর সর্ব্বদেহে একটা অকরুণ ভগ্ন চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। কথা তিনি কোন দিনই বেশী কহিতে পারেন না, এখন প্রায় মৌনী হইয়াই গিয়াছেন। শুধু ভাগ্যহতা মেয়ের জন্যই যেটুকু না করিলে চলে না তাই করেন, নিজের সকল প্রয়োজন তাঁর এবারে যেন সম্পূর্ণই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

সর্ব্বাণী কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হয় নাই, কিন্তু বাপের জন্য সন্তপ্ত সে খুবই হইয়াছিল। সাত তাড়াতাড়ি এ বিবাহে সম্মতি দেওয়াই যে তার মস্ত বড় ভুল হইয়াছে এ কথা ভাবিয়া তাকে গভীর অনুতাপ করিতেই হয়। সে ভাবিয়াছিল একাজটা তাড়াতাড়ি চুকাইয়া লইলে তার বাপ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন, তাই না সে অমন করিয়া এক কথায় বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল।—ভুল!—ভুল!—একান্ত নির্ব্বোধের মত এতবড় মস্ত একটা ভুল,—এ'কি কেউ কখন করে?… কিন্তু কি ভাগ্য তার যে সেই গণ্ড মূর্খতার চরম ফল ফলিতে পায় নাই! বিবাহটা যদি হইয়াই যাইত?—ভাবিতে এখনও তার গায়ে কাঁটা দেয়!

তাঁর সুস্মিত চোখে পরিস্থাদের ব্যাভার, তাদের হাতের মুঠায় গিয়া পড়িলে দিকে সহাস্যমুখ্যোতনই হয়ত তার সঙ্গে তার বাবাকেও' সহিতে হইত। শঙ্খচিন্তাঃ! বাবা তার অনর্থক দুঃখ পাইতেছেন,—দুঃখ পাইবার মত এমন কিছুই তো তাদের দিকে ঘটিতে পারে নাই,—সর্ব্বরক্ষে!

মনের কথা চাপিতে না পারিয়া সে প্রকাশ করিয়াই বলিল, চৈত্র-সন্ধ্যায় সেদিন আকাশে আধখানা চাঁদ উঠিয়াছে, তারই ছুরিত জ্যোতিতে গভীর নীল মখমলের চাঁদোয়ার মত আকাশটাকে অদ্ভুত কোমল ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। নক্ষত্রগুলা যেন এক একটা শল্‌মা-জরির গালি কাটিয়া তৈরী করা চক্‌চকে সূর্য্যমণি ফুল! দক্ষিণ ধারের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বাপের আরামচৌকির কাছেই সর্ব্বাণী ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল। সুরঞ্জনের ঈষৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসপাতের শব্দ হইতেই সে হঠাৎ প্রদীপ্ত হইযা উঠিল,—

"আচ্ছা বাবা! তুমি সব সময় অমন দুঃখ ক'রে থাক কেন বলত? এমন কি তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে যার জন্যে মনে তোমার তিলমাত্র সুখ নেই?"

কথাটা বলিযাই সে ঔৎসুক্য-ভরে বাপের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইয়া রহিল। এ প্রশ্ন সে আকস্মিক করে নাই, মনে মনে অনেক-খানি বিতর্ক করিয়া তৈরী হইয়াই করিয়াছে।

কিন্তু সুরঞ্জনের দিক দিয়া অবস্থা ঠিক বিপরীত। এপর্য্যন্ত তাদের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় লইয়া তাদের ভিতর আলোচনা প্রায় হয়ই নাই। তাই প্রশ্নের আকস্মিকতায় তাঁকে একটু বিপন্ন করিয়া তুলিল। উত্তর এর দেওয়া চলে কি চলে না জানি না, সুরঞ্জনের পক্ষে দেওয়া অন্ততঃ কঠিন। এর যথার্থ উত্তর সর্ব্বাণীর পক্ষে হয়ত অত্যন্তই কঠোর হইবে, সুরঞ্জনের পক্ষে সে-কাজ করা দুঃসাধ্য! ঈষৎ আহত, ঈষৎ বিব্রত, ঈষৎ

অপ্রতিভভাবে একটুখানি ম্লান হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "নাঃ,—দুঃখ আর করি কই ?"

বলিতে বলিতে হৃদয়োচ্ছ্বসিত বিষাদবাষ্পে কণ্ঠস্বর তাঁর ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, উদ্গত প্রায় দীর্ঘশ্বাসটাকে সন্তর্পণে বুকের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া ঠোঁটের একটি কোণায় এতটুকু হাসিকে ফাঁপাইয়া বড় করিয়া তুলিতে চাহিলেন, কিন্তু অন্তঃসার শূন্য জল-বুদ্‌বুদের মতই তাহা মুহূর্ত্তে উৎপত্তিস্থলে বিলীন হইয়া গেল। দুঃখ তো তিনি জীবনের প্রথম হইতেই করিতে- ছেন,—যেদিন অভাগিনী বিদ্যুৎ তাঁর জীবন হইতে বিদ্যুতের মতই একটি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গিয়াছে! আজ বুঝি দুঃখ করিবার শক্তিও তাঁর মধ্যে আর বাঁচিয়া নাই।

"ক'র না ? চুপটি ক'রে তবে কি এত বসে বসে ভাব বল তো শুনিই সেটা ? চেহারাটি কি যে হচ্ছে আয়না দিয়ে একবার দেখবে ?"

আর একবার সেই রকম অর্দ্ধ-ব্যক্ত অস্ফুট হাসি হাসিয়া পিতা সস্নেহে মেয়ের উৎকণ্ঠা-শঙ্কিত মুখের দিকে চাহিয়া নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে সন্তর্পণে ঠেলিয়া রাখিয়াই উত্তর দিলেন,—

"জান তো মা! শঙ্করাচার্য্যের বাণী—"বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্ন",—আর গভর্ণমেণ্ট পেন্‌সনের যে ব্যবস্থা করেছে,—এও কি নিরর্থক ?"

সর্ব্বাণী ঝঙ্কার করিয়া উঠিল,—"না বাবা! ও সব ধোঁকা দিওনা আমায়। তা' ব'লে তুমি এত বুড়ো হওনি। পঞ্চান্ন বছর বয়সে ওরা পেন্‌সন দিয়ে চুকিয়ে দেয় ব'লেই কি ওটাকে বুড়ো বয়েস বলতে হবে নাকি ? তুমি তো আরও পাঁচ বছর কাজ করতে পারতে। আমাদের দেশের নিয়মে ছেষট্টিতে মধ্যজীবন, তারপর থেকে বৃদ্ধত্ব।"

সুরঞ্জন এবার সত্যসত্যই হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "তাহ'লে এদেশে কাউকে আর বুড়ো হ'তে হবে না রে! ছেষট্টির পর ক'জন মানুষ

এযুগে বেঁচে থাকে রে বুদ্ধু? যে জাতের গড়-পড়তায় ছাব্বিশ সাতাশ বছর আয়ু—"

সর্ব্বাণী ঈষৎ চিন্তিত হইয়া কি ভাবিল, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সে কথা ঠিক, বুড়ো এদেশে নূতন ক'রে হ'তে হয় না, হ'বার অবসরও হয় না, আবশ্যকও নেই;—এদেশের ছেলে মেয়েরা বুড়ো হ'য়েই জন্মায়।"

তারপর সহসা সচকিত হইয়া উঠিয়া আগ্রহ-স্মিত মুখে বলিয়া উঠিল, "না বাবা! তা' ব'লে তুমি এইটেকেই নজীর করে ধরে নিও না যেন, তোমায় অনেকদিন বাঁচতে হবে।"

সুরঞ্জন একটা গভীর তপ্ত শ্বাস মোচন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যমুখে মেয়ের মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইলেন। মুখে তাঁর কথা যোগাইল না।

সর্ব্বাণী বলিতে লাগিল,—"সাহেবরা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি খুব নিয়মিতভাবে পালন করে, ওদের জাতের লোকেরা তোমার বয়েসেও রীতিমত ঘোড়ায় চড়ে, সাইকেল চালায়, পায়েও হাঁটে। আবার আমাদের দেশের সেকেলে লোকেরাও খুব সুস্থ আর দীর্ঘজীবী হ'তেন। এখনও দেখতে পাই, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেণীর আর খুব নিয়ম-চারিণী বিধবাদের ভেতর অনেকেই সত্তর পেরিয়েও বিনা চশমায় লেখাপড়া করেন,—নিজের দাঁতে আখ চিবিয়ে খান। শুধু এই মাঝের বয়সী থেকে কমবয়সী মেয়েপুরুষরাই এদেশে 'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট' হ'তে বসেছে। না বাবা! তোমায় আমি কিন্তু ওদের দলে পড়তে দেব না, তোমার শরীর ভাল রাখতে হবে, অনেক দিন যে তোমায় বাঁচতেই হবে।"

সুরঞ্জনের ঠোঁটের কোলে ঈষৎ একটু বিষাদ-প্রচ্ছাদিত মৃদু হাস্য উচ্চকিত হইয়া উঠিল। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি তো আমার শরীরের কম তদ্বির তদারকটি করচো না মা! এত যত্নেও যদি এ শরীর

ভাল না থাকে, তাহ'লে নেহাৎই তার বেইমানী!" তারপর চকিতের মধ্যেই তাঁর ঠোঁটের হাসি মিলাইয়া গেল এবং অকস্মাৎ ভাসিয়া আসা এক টুকরা কালো মেঘের মতই একটা দুঃসহ দুঃখ-গাম্ভীর্য্য মুখের উপর এক মুহূর্ত্ত খেলা করিয়া গেল, তার ভিতর সঞ্চিত অশ্রু-আর্দ্রতা যেন বাধা মানিল না, তিনি সলিলার্দ্র গভীর স্বরে কহিলেন,—

"বাঁচতে তো হবে। নাঃ,—মরবার কথা আমি তো ভাবিনে! আমায় বাঁচতে হবে, আমি জানি, আজই নয়, চিরদিনই এই বাঁচার তপস্যা আমি যে করে চলেছি।"

ইহার পর আর এ আলোচনা চলে না। চালাইতে গেলে যেখানে পৌঁছিতে হইবে সর্ব্বাণী সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে পরিহার করিতে চায়। কেন যে তাঁর অনিচ্ছুক ব্যথিত চিত্ত লইয়াও দীর্ঘ দিন জীবিত থাকার অভিশাপ বহন করিতে হইবে, সে কথা তো তার কাছে উহ্য নয়! আর সে দুর্দ্দশার বোঝা তাকে কেহ জোর করিয়া চাপাইয়াও দেয় নাই, স্বেচ্ছায় এ সমস্যার সৃষ্টি সে নিজেই করিয়াছে, এর জন্য দায়ী যদি কেহ থাকে সে নিজেই। অতএব এ আলোচনা থামাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অ-প্রফুল্ল কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলে,—"হবেই তো,—একশো বচ্ছরের একটি দিনও কম হতে দেব না। তার আগে আমি তোমায় চলে যেতে দিচ্চি কিনা!"

এই বলিতে বলিতে নিতান্ত ব্যস্ততার সহিত কি একটা জরুরী কাজের খাতিরেই যা সেখান হইতে উঠিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া যায়। সহসা চলিয়া গেল বলিয়াই জানিতে পারিল না, তার কথায় তার বাপের চোখের দৃষ্টি অশ্রুবাষ্পে কিরূপ আবিল হইয়া উঠিয়াছে। তা' এতে কি তাঁকে দোষ দেওয়া যায়? সুরঞ্জন মানুষ,—পুরুষ মানুষ বলিয়া ভগবান তাঁকে কি পাষাণ দিয়াই তৈরী করিয়াছেন নাকি? তাঁরই নবীন যৌবনে

সর্ব্বহারা বিদগ্ধ জীবনে এই একটিই যে স্নেহ নির্ঝরের শীতল ধারা তাঁর শুষ্ক রসহীন দেহ মনকে সঞ্জীবিত করিয়া ঝরিয়া চলিয়াছে, আর এইটাই পরম আশ্চর্য্য যে, যে জ্বলন্ত পাবক-শিখা তাঁর ভরা যৌবনের সমুদয় সুখ সাধ শান্তিময় আশাময় জীবনানন্দকে বিধ্বস্ত বিদগ্ধ করিয়া অকালে নিজেকে আহুতি দিয়া গিয়াছে, তার সেই প্রচণ্ড বেগবান অপার্থিব ভালবাসার সমস্তটাই সে ইহারই মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিল, 'এ'ও তাঁরই জন্য আত্মাহুতি দান করিল! এদের দুজনকার ভালবাসার রীতি ও প্রকৃতি একই,—এরা গঙ্গোত্রির গুহা মুখ হইতে প্রচণ্ড বেগে সহস্র শিলা-শৈল চূর্ণ করিয়া দেশভূমি ভাসাইয়া উন্মাদ গতিতে জ্ঞানশূন্যবৎ ছুটিযা চলে, সেই গতিবেগে কোথায় কি ধ্বংস হইল তার জন্য ভ্রূক্ষেপ মাত্র এরা করে না। অবশেষে নিজেরাও সেই স্রোতের বেগে ভাসিয়া যায়, ফলে যার জন্য এ আকুল উন্মাদনা তাকেও ধ্বংস হওযা হইতে বাদ দেয় না।

৮

বকুলের ঘন পল্লবে লুকাইয়া পঞ্চম তানে পুং কোকিলটা গাহিয়া চলিয়াছে, কুহু, কুহু, কুহু, কু-উ, কু-উ। ঘাটের পাশের আমগাছের বোলের গন্ধে মৌমাছিরা যেন মাতাল হইয়াছিল, বকুলের ঝুরো ফুল-গুলাকে বাতাসে উড়াইয়া জলে ভাসাইতেছিল, মালার আকারে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উহারা চক্রাকারে ভাসিয়া চলিয়াছে। জলের ধারে একটা সারস পাখী লম্বা গলাটি পিঠের উপর বাঁকাইয়া ধোঁয়াটে রঙের ডানার মধ্যে ঠোঁট ঢুকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একটা বক তীক্ষ্ণ-চঞ্চল চক্ষে জল তলের অবস্থা লক্ষ্য করিতে করিতে এক পায়ে দণ্ডায়মান। মধ্যাহ্ন

প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ঔদাস্যভরা অলস সুর যেন কোন্ যন্ত্রহীন যন্ত্রীব হস্তধৃত যন্ত্র হইতে অব্যক্ত রাগিণীতে বর্ষিত হইতেছে।

ঘাটের দিকে মুখ করিযা জানালার ধারে একটা আরাম কেদারায় আধ শোয়া হইযা সর্ব্বাণী কি একটা নভেল পড়িতেছিল। পড়িতেছিল বলা চলে না, বইখানার মধ্যে মনটাকে নিবিষ্ট রাখিতে চেষ্টা করার পর ব্যর্থকাম হইযা বন্ধ নভেলের পাতার মধ্যে একটি আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিয়া অনির্দ্দিষ্ট চক্ষে এইদিকেই চাহিয়া রহিযা ছিল। স্নানের পর দীর্ঘ কেশেব শেষপ্রান্তে একটি গ্রন্থি দিযাছিল, কোন্ সময় তাহা এলাইযা গিযাছে, বাতাসে কপালের চূর্ণ কুন্তল বীচি-বিক্ষেপকারী নদী-তরঙ্গের মতই তালে তালে নর্ত্তিত হইতেছে। মসৃণ কৃষ্ণ কেশের মধ্য হইতে সুবাসিত কেশতৈলের মৃদু গন্ধ ধীব গতিতে সঞ্চবণ করিতেছিল। শিথিল বক্ষোবাসের উপর দিযা হৃদ্‌স্পন্দন অনুভূত না হইলে অলস মধ্যাহ্নেব আলস্য-শিথিল তনুলতাব প্রতিকৃতি বলিযাই তাহাকে হযত মনে হইতে পারিত।

পিছন দিকের নিমগাছে একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল, উড়িয়া আসা একটা পাপিয়া হঠাৎকাবেই হাহারবে কাঁদিয়া উঠিল,—'চোখ গেল,—চোখ গেল,—চোখ গেল'—

সর্ব্বাণী চিন্তাতন্ময়তা হইতে জাগিয়া উঠিল, চকিতে বইএর অঙ্গুলি চিহ্নিত পাতাখানা খুলিল। মোটে সাতাশ এর পাতা! পড়িবার মত ভাল বং ও নয, ভাল মনও নয, বইটাকে আবার মুড়িয়া ফেলিল। বাবার শরীব দিন দিন ভাঙ্গিযা পড়িতেছে, সেই ভগ্নদেহ নানা মূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই সর্ব্বাণীকে ভৎ‍র্সনা করিতেছে। অন্যে জানে এবং সর্ব্বাণীও জানে, তার বাপের এ অবস্থার জন্য একমাত্র দোষী সে। তার এই অভূতপূর্ব্ব অবস্থা,—না কৌমার্য্য না বৈধব্য—এ এক অপূরণীয় হেঁয়ালীর মতই

অনারোগ্য ক্ষতের মতই তাঁর পিতৃহৃদয়কে নিয়তই নিপীড়িত করিতেছে, অথচ এমনি বাৎসল্য ভরা চিত্ত তাঁর যে, জোর করিয়া একটা কথাও তো তাকে কই বলিতে পারেন না? সর্ব্বাণী সে কথাও ভাবিয়াছে। এর চাইতে যদি তিনি তার উপর জবরদস্তি করিতেন, সেও ঢের ভাল ছিল,—সেও তা' লইয়া খানিকটা কান্নাকাটি, রাগ-অভিমান তো করিতে পারিত? হয় জিতিতো—না হয়—বাপের হুকুম মানিয়া লইয়া বাধ্য হইযা যা' তাঁর নির্দ্দেশ তাহাই করিয়া ফেলিত; কিন্তু এ এক অদ্ভুত অবস্থা! না মুখে একটি কথা বলিবেন,—না মন হইতে মনের আপদকে ঝাঁটাইয়া বিদায় দিবেন! নিঃশব্দে এই যে বিরাটভার সুমহৎ দুঃখটাকে বহন এবং অন্তরে অন্তরে অশেষভাবেই লালন করিযা চলিয়াছেন, এ লইয়া মানুষ কয়দিন বাঁচিতে পারে? সর্ব্বাণী রাগিয়া কাঁদিয়া আজ পিতাকে গিয়া বলিয়াছিল,—

"আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, আমার একটা গতি না হ'লে তোমার আর বাঁচোয়া নেই! বেশ, তাই করো, যা' করলে তুমি খুসী হও,——তাই হোক। শুধু এমন ক'রে ভেবে ভেবে আমার জন্যে তুমি প্রাণটা খুইয়ো না বাবা!"

সুরঞ্জন এত বড় ত্যাগের কথায় কেবলমাত্র হাত দিয়া তার মাথাটাকে বারেক স্পর্শ করিয়া ক্ষমাময় স্নিগ্ধ হাসির সহিত উত্তর দিয়াছিলেন, "কে' বল্‌লে তোকে, আমি তাই ভাব্‌ছি?" তার পর ঈষৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন, 'তোমায় আমি কোন কাজেই বাধ্য করতে চাইনে'।' যদি কখন ইচ্ছে ক'রে বিয়ে করতে চাও, লজ্জা ক'রো না,—আমায় ব'লো। আমার জন্যে ভেবো না,—আমি ভালই আছি, কাজকর্ম্ম নেই,—কর্ব্বো কি চুপ করে বসে না থেকে?"

ইহার পর সর্ব্বাণী নিঃশব্দে বাপের দুই হাঁটুর উপর উপুড় হইয়া পড়িল, আর সুরঞ্জন একটি কথা না কহিয়া কল্যাণবর্ষী শীতল দক্ষিণ হস্ত কন্যার মাথায় রাখিয়া স্নিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে কি বলিলেন বা কিছুই বলিলেন না,—সে খবর কে' জানিতে যাইবে ?

অনেকক্ষণ পরে সর্ব্বাণী আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়া বাপের দিকে একটি বার না চাহিয়াই পাশ কাটাইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে তখনও চোখের জলে তার মুখ ভাসিতেছিল।

বই পড়ার বিড়ম্বনা কি এর পর তখনও চলে ?

পুকুরধারে ত্রিভঙ্গঠামে হেলিয়া পড়া নারিকেল গাছের উপর হইতে টুপ্ করিয়া নামিয়া একটা মাছরাঙ্গা সদ্যো-সলিলোত্থিত একটা মৎস্যকে মুহূর্ত্তে শিকার করিয়া লইল। সুপারী গাছের মাথায় বসিয়া একটা শঙ্খচিল চিঁচিঁ শব্দে চেঁচাইয়া জাগিয়া উঠিয়া যেন তার উদ্দেশ্যেই কঠিন তিরস্কার বর্ষণ করিল। বকটা নিজের অক্ষমতার ধিক্কারের লজ্জাতেই বোধ করি বা দুই পায়ের উপর খাড়া হইয়া উঠিল এবং এই সব সম্মিলিত গোলযোগের ধাক্কায় সুখসুপ্ত সারস তার লম্বা গলাটিকে পিঠের দিক হইতে সাম্‌নের দিকে ঘুরাইয়া লইয়া ঘুমভাঙ্গা সজাগ চোখে একবার চারিদিকে খরভাবে চাহিয়া লইয়া লম্বা পায়ে পরিক্রমণ পূর্ব্বক অতি শীঘ্রই দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইয়া গেল।

সর্ব্বাণী অন্যমনস্কতার মধ্য দিয়া সব কিছুই দেখিতেছিল, কিন্তু চোখে পড়িলেও মনে তারা ছায়া ফেলিতে পথ পায় নাই। গভীর চিন্তায় চিত্ত তার ডুবিয়া আছে। সে জানে সে বালিকা নয়, নিজের এবং অন্যের ভালমন্দ বুঝিবার মত বয়স তার যথেষ্ট হইয়াছে,— বুঝিয়াছে কৃতকর্ম্মের দ্বারা সে নিজেকে তার ভগ্ন-হৃদয় বাপের হিত শৃঙ্খলিত করিয়াছে। যে মনের তেজে সেদিন তার

পিতৃ-অবমাননাকারীকে নির্ম্মম প্রতিশোধ দিতে পারিয়াছিল, তার নারী-মর্য্যাদার যে অবমাননাকে সে নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাতে করিতে দ্বিধা মাত্র করে নাই, সে তেজ অবশ্য তার ঠিক আছে, কৃতকার্য্যের জন্য যে অনুতপ্ত হইয়াছে তা-ও নয়,—তথাপি এই সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায নাই যে, তার বাপের দিক্ দিয়া দেখিলে তার কাজটাকে সমর্থন করাও চলে না। সর্ব্বাণী পিতার এক সন্তান, মাতৃহারা সর্ব্বাণীকে তিনি প্রাণ দিযা পালন করিযাছেন, তাঁর দিকে কোনই ত্রুটি নাই। বিবাহ সম্বন্ধে সুরঞ্জন তার মত চাহিয়াছেন, এত তাড়াতাড়ি করার ইচ্ছাও তাঁর আদৌ ছিল না, সর্ব্বাণীই নিজের ছেলেমানুষীর খেয়ালে কাজ চুকাইয়া বাপকে নিশ্চিন্ত করিবার পরম আগ্রহেই না এ কার্য্যে তাঁকে তাঁর মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছিল। তারপর টাকাকড়ি লইয়া যা' কিছু অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিল সেও তো সর্ব্বাণীর নিজের কৃতিত্ব! বাপ তার এ বিষয়ে বিরুদ্ধই ছিলেন। সর্ব্বাণীর নিজস্ব মতবাদ যাই হোক, তা' লইযা সে যত খুসী ল'ড়িতে পারে লড়ুক, কিন্তু সেই নিজস্ব যুদ্ধের ফলে বাপকে আহত করার অধিকার তার আছে কি না, এর মীমাংসা করা কঠিন! যখন তা' করিয়াছে, তখন ঐ আশাহত ও মর্ম্মাহতকে লইয়া তাকে চিরদিন বিড়ম্বিত হইতেই হইবে। পড়াশুনা, দেশের কাজ, আর্ত্তের সেবা, অজ্ঞের শিক্ষাবিধান, অনুন্নতদের উন্নতি-প্রচেষ্টা এ অভাগা দেশে কত দিকে কত কি না কাজ। কোটী কোটী কণ্ঠের করুণ প্রার্থনায় দশদিক ভরিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বাণীকে সে সব লোভাতুরও কি করে না? স্তব্ধ মধ্যাহ্নেও নিঝুম রাত্রে নিদ্রাহীন দৃষ্টি মেলিয়া সে জ্বলিয়া মরে, প্রাণপণে লোভ সামলাইতে হয়। নিজের কানকে শুনাইয়া বলে, "উপায় নেই,—বাবাকে তো ছেড়ে যেতে পারি নে', আমার উপায় নেই!"

সে জানে সে যা' করিয়াছে তার ফলে সে অসুখী না হইলেও তার বাবা তা' মনে করেন না। তাঁর বিষণ্ণ মুখ, বড় বড় নিঃশ্বাস তাঁর মনের কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। তবু যতদিন চাকরী ছিল এক রকম কাটিয়াছে, এই মাস কয়েক চাকরী ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়া যেন অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আত্মীয়েরা সরিয়া গেল,—সমাজে কাণাকাণি, পথে পথে বিস্ময়, ঘটক-ঘটকীর আনাগোনা সর্ব্বাণী বাহিরে যতই গভীর ঔদাসীন্যে উড়াইয়া দিক, মনে কি তার দাগ লাগে না?

"খুব ভাল ছেলে, সব কথাই জানে,—এক পয়সা চায় না, শুধু শাঁকাপরা মেয়েটি চায়।" পাত্র নিজেই ঘটক পাঠাইল। সুরঞ্জন ফল জানিতেন, এমন ঘটনা পূর্ব্বে আরও ক'বারই তো ঘটিয়াছে। সর্ব্বাণী সাফ বলিয়া দিয়াছে, 'বিবাহে তার যে রুচি নাই,—এটা পরীক্ষিত সত্য! নাই বা সে বিবাহ করিল? তা' ছাড়া লোকাচারে 'দো-পড়া মেয়ের বিয়ে তো হয়ও না।' এই ছেলেটি বিশেষ করিয়া বলিয়া পাঠাইল, সে ওসব মানে না। 'বাগ্‌দত্তার অন্য বিবাহের বিধি পরাশর মনু দুজনেই দিয়াছেন। যে 'পরাশরী'-শ্লোকটি অধুনা বিধবা-বিবাহ এবং সধবার পত্যন্তর গ্রহণের বিশেষ বিধিরূপে সমাজকে আলোড়িত করিতেছে, সেই পত্যন্তর গ্রহণের কারণান্তর প্রদর্শিত শ্লোকটি যে বাগদত্তা কন্যার পক্ষেই প্রযোজ্য, তাহা বহু বিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে,—অতএব 'দো-পড়া' বলিয়া কোন বস্তু জগতে নাই,—দো-পড়া অর্থে বাগ্‌দত্তাই বুঝায়। লোকাচারেও বিবাহরাত্রের মধ্যে পাত্রান্তরে বিবাহের বিধি যখন আছে, তখন রাত্রি প্রভাতেই বা বিবাহে বাধা কিসের? যদি সর্ব্বাণীর অসম্মতি না থাকে, নিজে আসিয়া তর্কদ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত সে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

সর্ব্বাণী জবাব দিল, 'তার বাগ্‌দত্ত-পতি নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব

বা পতিত—এ সবের যখন কিছুই ন'ন এবং ঐ সকল কারণে যখন তার বিবাহ বন্ধ হয় নাই, তখন তার "কেস"টা তর্কদ্বারা প্রমাণ বা অপ্রমাণ হইতে পারে না। অতএব সে সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছে, তাহাকে যেন বিব্রত করা না হয়।'

সুরঞ্জন কন্যা সম্বন্ধে যে নির্লিপ্ত, সে কথা আবেদনকারী মাত্রেই জানে এবং তাঁর মধ্যে যে পৌরুষের একান্ত অভাব এ কথা বলিয়া তাঁকে ধিক্কার না দেয় ঘরে পরে এমন কোন লোকই নাই। এমন "মেয়েমুখো," "কুণো" লোকটা ম্যাজিষ্ট্রেটী ও জজিয়তী দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়া আসিল কেমন করিয়া ইহা ভাবিয়াও লোকে অবাক হয়।

কেহ কেহ সহানুভূতি দেখাইয়া বলে, "ডানপিটে মেয়ে,—জোর করতে গেলে কি' না কি ক'রে বসবে, ঠিক আছে কিছু?"

এমনি করিয়া সর্ব্বাণীর বিবাহ সম্বন্ধ যা'ও বা আসে পণ্ড হইয়া যায়। তাকে বউ করিতে চাহিবে, এমন ছেলের বাপ এদেশে এখনও জন্মায় নাই, স্বাধীন ছেলেরাই কৌতুহল বশে অথবা বাস্তব শ্রদ্ধায় দরবার করে এবং ঘা খাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, এই জন্যেই বলে, "কুকুরকে 'নাই' দিতে নেই!"—গিন্নীরা শুনিয়া শুনিয়া গালে হাত দেন, চোখ কপালে তুলিয়া বলেন, "মেয়ের জাত বাঁদীর জাত,—এত তেজ যে কিসের, তা' উনিই জানেন!" "ওসব হ্যামাক্ গো হ্যামাক্! চাচ্চিখানি রূপ আছে, বয়েস আছে, বাপের পয়সা আছে তার উপুর ন্যাকা পড়া শিখেচেন, তারই গরম।"

সর্ব্বাণী পরম উপেক্ষায় কোন পক্ষের কোন কথা কাণেই তোলে না। ভাল কথা?—তা'ও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পায় বই কি!

পরিজনবর্গের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার নাম খবরের কাগজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক অজ্ঞাত অখ্যাত তরুণ-তরুণীর প্রশংসাপত্রও সে পাইয়াছে। অবশ্য গালিও খাইয়াছে তার চাইতে অনেক বেশী।

খোলা বই হাতে সেই সব কথাই সে ভাবিতেছিল। জীবনটা তার একটা প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিয়াছে। কত কি করার আছে অথচ কিছুই যেন আয়ত্তাধীন নয়। বাপের সুখহীন জীবনকে আরও নিরানন্দ করিতে এতটা নিষ্ঠুরতা তা' বলিয়া তার মধ্যে নাই। সাংসারিক দৃষ্টিতে নিজেকে সুখী করিয়া পিতৃ-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্তি দিবার সাধ্য যখন তার হইল না, তখন বাহিরের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া পিতাকে তার সাহচর্য্য-বঞ্চিত করিতে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এমন করিয়া কত দিন—এই বয়সে কত দিনই কাটানো যায়? একটা কিছু অবলম্বন তো করিতেই হইবে? বড় কিছু না পারে মাঝারি কিছু,—আচ্ছা অনুন্নতদের উন্নতির চেষ্টা করা—সে-ও তো একটা এ দিনের উপযোগী বড় কাজ? এই কাজটাতে যদি লাগে?

"দিদিমণি! বাবু আপনারে ডাকৃতেছেন।"—বলিয়া এবাড়ীর ঝি রাণী ঝাঁটা হাতে দোরের গোড়া হইতে উঁকি দিল।

সর্ব্বাণী ভাবনার দায় এড়াইয়া যেন বর্ত্তিয়া গিয়া তখনি বাপের উদ্দেশ্যে ছুটিল। পুকুরঘাটে অধ্যবসায়শীল সেই বকটা তখন একটা ছোট্ট মৃগেল মাছের ছানা ধরিয়া একপাশের শরবনে গিয়া আহার করিতেছে,—সারসটা তৃণাস্তীর্ণ তীরে উঠিয়া যথেচ্ছ পরিক্রমণে ব্যাপৃত আছে। কি জানি কি দেখিয়া কি বুঝিয়া চিরদিনের তাপিত সেই পাখীটা বকুল গাছের মধ্য হইতে ব্যাকুল কণ্ঠে মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছে,—'চোখ্ গেল'! 'চোখ্ গেল'!

কেন গেল তার চোখ? কি এমন দগ্ধকারী দৃশ্য তার চোখে পড়িয়াছে, যার যন্ত্রণায় আজও সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সবার কাছে নালিশ জানায়—'চোখ্ গেল'! 'চোখ্ গেল!'

"আঁা বাবা! আমায় ডাকছিলে?"—বলিয়া সর্ব্বাণী হাসিমুখে বাপের

সাম্‌নে দাঁড়াইল। হাতে তার সেলাইএর সুতাসুদ্ধ একটা রুমাল, যেন সে এতক্ষণ ওই কাজটাই করিতেছিল।

"হ্যাঁ মা। এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখ তো, কি জবাব দিই?" সর্ব্বাণী সবিস্ময়ে অনুভব করিল তার বাবার কণ্ঠে বহুদিনের অশ্রুত আবেগের সহিত বিজড়িত একটা সহর্ষ বিশেষ ভঙ্গী যেন নিহিত রহিয়াছে। মুখটি তাঁর তৃপ্তি-প্রসন্ন।

একখানা মোটা খামের চিঠি,—উপরে কয়েকটা ডাকের ছাপ, একটায় সুরঞ্জন সর্ব্বাণীর বিবাহের সময় পশ্চিমের যে সহরে থাকিতেন সেখানকার, আর একটায় কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিসের এই দু'টোই স্পষ্ট দেখা গেল। সর্ব্বাণী বিস্ময়ের সহিত ভিতরের চিঠিটা টানিয়া বাহির করিল।

"এ আবার কে' গো? হ্যাঁ বাবা! এ' তো তোমায় লিখেছে, আমায় দেখতে বললে যে? ঘটকালীর চিঠি হয়ত—ওযেষ্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক্,—ও দেখতে দেখতে আমার চোখ দুটো ক্ষয়ে গেল,—"

বলিতে বলিতে সর্ব্বাণী নীরব হইয়া মনে মনে চিঠিখানা পড়িতে লাগিল,—

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার হয়ত স্মরণ আছে যে প্রায় তিন বৎসরাধিক কাল অতীত হয় আপনার কন্যা শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা দেবীকে আমায় সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আমাদের পক্ষ হইতে কোন অপ্রিয়-আচরণে বিরক্ত হইয়া আপনার কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বেই আত্মগোপন করেন। সম্প্রতি বিদেশ হইতে ফিরিয়াছি,—যদি আপনার কন্যার সম্মতি থাকে, তাঁর পাণিগ্রহণ করিতে আমি ইচ্ছুক আছি—('টোন'টা

বেশ সুবিধের নয় ! ‘পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছি’—আহা,—যেন কতই না অনুগ্রহ কর্‌তে চাইচেন !) তাঁর কি ইচ্ছা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে যথাবিহিত ব্যবস্থাদি করিব।

চিঠি পড়া শেষ না করিয়াই সর্ব্বাণী মুখ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল,—“না বাবা ! উঃ যে ওদের ব্যবহার !—ওদের বাড়ীর সেই মুদ্রা-রাক্ষস বাবাটি তো বেঁচেই আছেন ? আমায় হাতে পেলে এবার গোগ্রাসে গিলেই খাবেন ! না বাবা তুমি লিখে দাও—‘আমাদের মত নেই’।”

চিঠিখানা শত খণ্ড করিয়া কাগজ ফেলা ঝুড়িটায সে সত্য সত্যই ফেলিযা দিল। আকাশের চলন্ত মেঘ যেমন করিয়া সূর্য্যকে ঢাকে তেমনি করিযা সুরঞ্জনেব স্মিত প্রসন্ন মুখখানা একমুহূর্ত্তে গাম্ভীর্য্য-বিরস হইয়া গেল। বোধ করি, এই অতি অপ্রত্যাশিত পত্রখানা তাঁর আশাহীন চিত্তকে সহসাই আশালোক দেখাইয়াছিল। ফুৎকারে নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত নিষ্প্রভ মুখে ঈষৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ওযেষ্ট-পেপার বাস্‌কেটটার দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে স্বগতোক্তিব মতই কহিলেন, “ঠিকানাটাও তো দেখে রাখা হলো না !”

“তাই নাকি ?

সর্ব্বাণী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ঝুড়িটার কাছে গিয়া চিঠির টুকরাগুলার একমুঠা তুলিযা লইযা তার উপর বারেক চোখ বুলাইয়াই নিতান্ত অগ্রাহ্যের সহিত বলিয়া উঠিল, “যাক্ গে বাবা ! ও আপদই গেছে !—উত্তর না পেলে বুঝে নেবে’খন। তা ছাড়া চিঠিটা আসতে এত দেরি করেছে যে, ভদ্দর লোক এতদিনে উত্তর পাবার প্রত্যাশাও বোধ করি বা ছেড়ে দিয়েই থাকবেন”।

তারপর বাপের কাছে সরিয়া আসিয়া ধপ্‌ করিয়া তাঁর পায়ের

পাতার উপর বসিয়া পড়িল। তাঁর মুখের উপর চোখ মেলিয়া ধরিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল, "আমরা এই বেশ আছি, না, বাবা? ও হ'লে ওরা আমায় তোমার কাছে তো থাকতে দিত না, তাই ভগবান্ নিজের হাতে মস্ত বাধা সরিয়ে দিলেন। আমরা এ বেশ আছি, ওসব ন্যাটায় আর কাজ কি? তুমি মনে কষ্ট ক'রো না বাবা! এ আমাদের বাল্যবিধবার দেশ, এদেশে চিরকুমারী থাকা একটুও কঠিন নয়! এ তুমি বিশ্বাস ক'রো বাবা!—এ খুব সত্যি কথা।"

এই বলিয়া সে ছল ছল চোখে এবং হাসিভরা মুখে কচিপাতার মত দুখানি কোমল হাতে তার বিমূঢ় প্রায় বাপের পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল, তারপর অপগত সংশয় সহজ কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল,—

"তুমি আশীর্ব্বাদ করো বাবা! যাতে এমনি থেকেই জীবন সার্থক করতে পারি। সব মেয়েকেই যে যেমন তেমন ক'রে বউ হ'তেই হবে, সে কখন বিধাতার বিধি হ'তে পারে না। তাই না এদেশে বাল্য-বিধবার অত ঘটা! এখন বাল্য-বিবাহ উঠে যাচ্চে, কাউকে কাউকে কুমারী থেকে ওদের স্থানীযা হ'য়ে সংসারের আর উপরন্তু দেশের সেবা করতেই হবে। যেসব দেশে বাল্যবিধবা নেই, ভেবে দেখ,—সে-সব দেশেই চিরকুমারী থাকার ব্যবস্থা আছে। পুরাকালে সকল দেশেই ছেলেমেয়েদের চিরকৌমার্য্য সমাজ ধর্ম্মের একটা অঙ্গ ছিল। বহুপূর্ব্বের ভেস্‌টালভায়্‌জিনের কথা মনে করে দেখ,—আমাদের বাল্য-বিবাহ যখন প্রবর্ত্তিত হয়নি, তখন মেয়েদের দু'টি শ্রেণী ছিল। এক ব্রহ্মবাদিনী, অপর একটি সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন-সংস্কার প্রভৃতি হ'তো আর সদ্যোবধূরা বিবাহিতা হতেন। ব্রহ্মবাদিনীরা অগ্নি-সংস্কার, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানচর্চ্চা নিয়ে থাকতেন, আর অন্যেরা করতেন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন। দেখ, শুধু বৈদিক যুগেই নয়, বৌদ্ধ যুগেও কত কত কুমারী-মেয়ে দেশ-

বিদেশে ঘুরে ধর্ম্মপ্রচার ও জ্ঞান বিস্তার করতে কতই না কৃচ্ছসাধনা ক'রে গেছেন! আবার এ দেশে সেই আদর্শেরই বিস্তৃতি ঘটুক। সব্বাই মিলে আত্মসুখকামী হলে সমাজ ধর্ম্ম রাষ্ট্র কোনদিনই উন্নত হবে না।"

এই বলিয়া সে ক্ষণকাল অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তার মানস চক্ষে যেন সেই পৌরাণিক যুগের জীবন্ত সমাজ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া তার চিত্তে অনুপ্রেরণা প্রদান করিল।—সেই বলে সবল হইয়া উঠিয়া সে আবারও কহিতে লাগিল,—"কোন জাতের মধ্যে সকল নর আর সকল নারী বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারে না, কতককে সংসার মুক্ত থেকে সমাজ ও দেশের কল্যাণে জীবনোৎসর্গ করতেই হয়। সে যে ভাবে বা যে আকারেই হোক। আমাদের দেশের সমাজ বিধিতে অনেক পরিবর্ত্তন হচ্চে, হবেও আরো—কতক ছেলেমেয়েকে ভোগের সাধনা ছেড়ে ত্যাগের সাধনা করতে হবেই। নিজেরা ক'রে পরকে পথ দেখানো,—না হোক নীরবেই দেশের কাজ ক'রে যাওয়া—ভোগ-সুখকেই চরম না ক'রে, আত্মোন্নতির সেই পথে যে পথকে লক্ষ্য করে—"

শেষ কথাগুলি ঈষৎ জড়াইয়া আসিল, বাপের মুখে চকিতের মত একটা ব্যথার বিদ্যুৎ হানিয়া যাইতে দেখিয়া সহসাই সে নীরব হইয়া গেল।

সুরঞ্জন এক মুহূর্ত্তে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া একটুখানি নড়িয়া বসিলেন। সুগভীর স্নেহে এবং সুবিপুল গৌরবে তাঁর গাম্ভীর্য্য-মলিন মুখ ঈষৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, স্নিগ্ধনেত্রে মেয়ের আবেদন-ব্যাকুল মুখটি নিরীক্ষণ করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিলেন,—

"তোমার পথ ত্যাগের মহিমায় গৌরব দীপ্তই হোক। অকল্যাণের মধ্য দিয়ে কল্যাণের জন্ম হয় সকল দেশেই এ কথা বলে, তোমার জীবনে তাই সার্থক হোক।"

সুরঞ্জন তাঁর স্বভাব বিরোধী ভাবে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাঁর বিশাল দু'টি চোখের কোলে জল টলটল করিতে লাগিল। সর্ব্বাণী তাহা দেখিতে পায় নাই, সে তখন বাপের আশীর্ব্বাদ ও সমর্থন লাভে পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে নত হইয়া বাপকে প্রণাম করিতেছিল।

বাপের কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে অনুভব করিল, তার মনটা যেন হঠাৎ অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছে। জানলার বাহিরে আকাশ মেঘমুক্ত আ-নীল ও বিশাল,—ঐ বিশালতাই তো তার উদারতা,—তাই না, সে অসীম, সে মুক্ত।

বহুকাল পরে তার গান লেখার খাতাখানা কোথা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া মনের এই অবস্থায় একটা কিছু লিখিবার জন্য তার শেষ লেখা পাতাটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। বিবাহ-অভিনয়ের ঠিক পূর্ব্বেই সে এই গানটা সেখানে লিখিযা রাখিয়াছিল। এতদিন পরে তার জের টানায ছেদ টানিযা দিয়া সেই বিষয়েই হয়ত কিছু লিখিতে চাহিতেছিল। সেই গানটা তার মনে পড়িয়া গেল,—

মিলন তিথি ঐ আসে !
সাহানার সুরখানি ভাসে বাতাসে।
তারকার মালা পরা চাঁদ হাসি, মোর, বাসর দ্বারে দাঁড়াইল আসি,
তুমি মোরে ডেকে লও তোমার পাশে।
সাজায়ে রেখেছি মোর বরণডালা, সাজিবে তোমারে মম বরণ মালা,
সাজিতে পারি নি নিজে বাসক-সাজে,
সাধ ছিল, শুধু বেধেছে লাজে,
মোর হৃদয় সাজিয়া আছে তোমারই আসে।

অ্যাঁরে রাম বল ! রাম ! রাম !—ছি ! ছি ! ছি ! এ' কি কাণ্ড করেছে সে !

কা'র 'হৃদয় সাজিয়া আছে' কা'র আশায়? তার? এই সর্ব্বাণী দেবীর? ঈষ্! তা' আর নয়! যদি সাজিয়াই থাকিবে, তবে সে তার 'বাসক সজ্জা' দূর করিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিয়া দড়ির আন্‌লায় ঝোলানো ছাড়া শাড়ীখানা জড়াইয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া চুপি চুপি পলাইয়া গেল কেন? সাধে কি স্থির মাথার লোকেরা কবিদের বলে পাগল!—কোথাও কিছু নেই,—দুম্ করিয়া যেন একটা বোমা দাগিয়া দিল!

"এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি,
মনপ্রাণ যা' ছিল তা' দিয়ে ফেলেছি—"

সেই গোছের আর কি! সে তো তবু বাঁশীও শুনেছিল, আমি তো কচুপোড়া তা'ও শুনি নি, আচম্‌কা 'হৃদয় আমার তার জন্যে সাজতে' গেল কি দুঃখে?

সর্ব্বাণী খাতার পাতা উল্টাইয়া অন্য একটা সাদা পাতায় খস্ খস্ করিয়া পেন চালাইয়া দিল, এরই একটা প্রতিবাদ লিপিই সে তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিল;—

মিলন তিথি মম আসিল না,—
বুঝি মিলন লগন আজও হয় নি গোনা?
চুনি চুনি তুলেছিনু ফুল ভরা পরিমল,
শুখালো সে গাঁথা মালা ঝরে গেল ফুলদল,
তারা মালা পরা শশি হাসিল না।
হৃদয় ভরিয়া গেল নিবিড় নিথর মেঘে,
শ্রাবণধারার সাথে মন-বায়ু বহে বেগে,
সাহানার তানে বাঁশী বাজিল না।

বরণের ডালা হতে নিবে গেল দীপ শিখা,
নয়ন সলিল ধারে ধুয়ে গেল পত্র-লিখা,
বাসক সাজে তনু সাজিল না।—

দূর! দূর! এর মধ্যে যেন একটা হতাশার সুর বেজে উঠছে না কি? একটু যেন নৈরাশ্যের ছোঁয়াচ লেগে যাচ্চে! কেন লিখতে পারি নে'—

"যাবোনা বাসর ঘরে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী—"

সে ভাষা আমার কলমে ফুটলো কই? কবি-মনীষী তো নই, একটা পেটি-কবি কি আর ভাষায় সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছোটাতে পারে?"

৯

ঈষৎ পীতাভ সূর্য্যকিরণে ভরা পুকুরের টলটলে জল একখানা মস্ত বড় আর্সির মত ঝকঝক করিতেছিল। সুনীল দিগন্ত-বিসারী আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত থাকায় তার বিশালতা যেন সুপ্রত্যক্ষ হইতেছিল। সে অত বিশাল বলিয়াই তো এমন উদার! কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য অযুত কোটি জ্যোতিষ্কের ধারক ও বাহক যে সে, কোথাও কোন পক্ষপাতের লেশ মাত্র তো তা'তে নাই।

সর্ব্বাণীদের বাড়ীর পরে খানিকটা দূরে একটা বড় মাঠ দেখা যায়, হৈমন্তী ধান্য সেখানে এক অপূর্ব্ব শ্যাম শোভায় মায়া রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা সুশ্যাম নদীই বহিয়া গিয়াছে! মৃদু বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত উন্নত শস্য শীর্ষ যেন তার মন্দ মন্দ বীচী-বিক্ষেপ। শেষবেলার সূর্য্য কিরণে তার সুমন্দগতি ভঙ্গী আলোকচ্ছন্দিত ভাবে ঝকিয়া উঠিতেছে। একসারি বক তার উপর দিয়া ষ্ট্রেট-লাইনে বোধহয় কোন বড় বিল বা ঝিলের উদ্দেশ্যে শ্লথগতিতে উড়িয়া চলিয়াছিল।

সর্ব্বাণীর উপর দিয়া ইতিমধ্যে খুব বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল। কত দিনই যে এমন করিয়া সে বহির্বিশ্বের সহিত এমন মুখামুখী দাঁড়াইতে অবসর পায় নাই তা যেন তার ভাল রূপে মনেই পড়ে না। অসুস্থ বাপের সেবা লইয়া অত্যন্ত অশ্বস্ত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে সে নিজেকে তাঁর কক্ষ সীমানাতেই নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। কোনদিকেই তার লক্ষ্য মাত্র ছিল না, শুধু একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের মতই সে এক অপরিচিত আতঙ্কের রাজ্যে বাস করিতেছিল। উঃ কি দুঃসময়ই যে তার গিয়াছে!—একা অনন্য-সহায় জীবন-দর্শনে একান্ত অনভিজ্ঞ, অসম্পূর্ণ শিক্ষা জ্ঞান লইয়া তার জগতের একমাত্র আধারকে সে ধরিয়া রাখিবার জন্য কি নিষ্ঠুর সমর ঘোষণার বিরুদ্ধে সব্যসাচীর মতই সব্য করে লড়িয়া গিয়াছে! আবার যে এতবড় সুদিন তার এ জীবনে ফিরিয়া আসিবে এ আশা তার সেই সকল দুঃস্বপ্নাচ্ছন্ন দিনের মধ্যে আদৌ ছিল না। বাবা তার হয়ত তাঁর সেই শেষ আশা ভঙ্গে একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়া কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সে জয়ী হইযাছে। শমনের সমন জারির বিরুদ্ধে যে অভিযান সে চালাইযা ছিল, তাহাতে হার তাকে মানিতে হয় নাই। ভগবানের চরণ পাইলে সে তাঁর পায়ের উপর সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িত!

চেঞ্জে যাওয়ার প্রেসক্রিপ্‌সন ও গোলাপসুন্দরীর আমন্ত্রণ একসঙ্গেই আসিল।

পিসিমার প্রৌঢ়-মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বাণী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল।—তার বাপের উপযুক্ত বোনই বটে!

ভাইবোনের মধ্যে বহুকাল দেখা নাই। সুরঞ্জনের ভগ্নিপতি দীর্ঘদিন কাশ্মীরে কাটাইয়া সম্প্রতি পেন্‌সন লইয়াছেন। হিমালয়ে জীবন কাটাইয়া ম্যালেরিয়া-সঙ্কিত বাংলা দেশে ফিরিতে ভরসা নাই, তাছাড়া

গোলাপসুন্দরীর সপত্নী-পুত্র সুকুমার এখানকার 'ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে' চাকরী পাইয়াছে—এ জায়গাটি স্বাস্থ্যকর সুপরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য, কাছেই হিমাচল শৃঙ্গে মুসৌরি।—গ্রীষ্মকালে অফিস সেখানে উঠিয়া যায়। অভয়াচরণ একটি বাড়ী কিনিয়া এখানেই বসিয়া গেলেন। সর্ব্বাণী ছোট বেলায় একবার মাত্র বাপের সঙ্গে কাশ্মীরে গিয়াছিল। সে কথা তার ভাল মনেই পড়ে না, তাই মনে তার অপরিচিতা পিসিমার সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চিত ছিল। শৈশব স্মৃতি সে ভুলিয়া গিয়াছে, তার অভিনব-বিবাহের সময় পাহাড়ীপথে বর্ষার ধ্বস নামায় পিসিমা আসিতে পারেন নাই। তার মনে হইল,—ভাগ্যে আসেন নাই! তাই না তাদের স্মরণে রাখিয়াছেন, নতুবা অন্যান্য আত্মীয়দের মত এঁরাও হয়ত তাদের ত্যাগই করিতেন, সাদরে গ্রহণ করিতেন না।

ষ্টেশনে নামিতেই নিমন্ত্রকদের সাক্ষাৎ মিলিল। প্রসন্ন মূর্ত্তি অভয়াপদ, পুরাদস্তুর সাহেব সাজা সুকুমার, আর একটি তারই সমবয়সী মেয়ে। হাসি-মাখা তার ছোট্ট মুখখানি, চোখ দু'টি তার খুসীর প্রাচুর্য্যে জল্ জল্ করিতেছে,—তাদের লইতে আসিয়াছিল। বাবার কাছে জানিয়াছে পিসিমার ঐ এক ছেলে আর একই মেয়ে। ছেলের নাম তাঁর 'সুকুমার', —কিন্তু মেয়ের নাম 'ডালি' ছাড়া আর কিছু আছে বলিয়া তারা জানে না। পিসিমাও ঐ ডাকনাম ছাড়া পোষাকী নামের কথা কখন চিঠিতে লেখেন না। সর্ব্বাণী ও সে নাকি এক সমবয়সী।

পরস্পর কুশলবার্ত্তার আদান-প্রদান হইয়া গেলে ডালি আসিয়া সর্ব্বাণীর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তার গায়ে একটা গরমের লেডিস্ কোট, গলায় সিল্কের মাফ্লার। সর্ব্বাণীর গায়ে শুধু হাল্কা রংয়ের ছোট্ট একটি শাল। শেষ আশ্বিনের পাহাড়ঘেরা উত্তরে হাওয়ায় একটু শীত-শীত করিতেছিল, ডালি তার হাত ধরিয়াই বলিয়া উঠিল,—

"তোমার হাত যে হিম হয়ে গেছে সবুদি! শীগ্‌গির তুমি আমার এই কোটটা প'রে পকেটে হাত দুখানা ঢুকিয়ে ফেল।"

বলিয়াই সর্ব্বাণী বাধা দিবার পূর্ব্বেই গায়ের গরম কোটটা খুলিয়া ফেলিল এবং সর্ব্বাণীর আপত্তির মধ্যেই সেটা তার গায়ে জড়াইয়া দিয়া তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। তার অনুযোগের উত্তরে পাল্টা অনুযোগ করিল,—

"ওই মূর্ত্তি ক'রে বাড়ী গেলে মাযের কাছে মার খেতেই যা' বাকি থাকতো! জানো না ত, কাশ্মীরে বাস ক'রে ক'রে মা আমার পুরো-দস্তুর কাশ্মীরী বনে গ্যাছে। তাদের বুকে আগুনের কাংড়া ঝোলে, আর আমরা দুটো গরম কাপড়ও গায়ে ঝোলাবো না, মা হয়ে তিনি কেমন করে এতটা বরদাস্ত করবেন বলতো?"

মুখের আপত্তি যা'ই না কেন জানাক্, এই চির-অপরিচিতা বোনটির স্নেহের উপদ্রব সর্ব্বাণীর নিরাত্মীয় জীবনে একান্ত মধুর ঠেকিল। এমন করিয়া কে' কবে তাকে যত্ন করিয়াছে? তার দু'চোখ জ্বালা করিয়া এক ঝলক জলও যেন আসিয়া পড়িল, সেটা সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া নত নেত্রে পাযের দিকের শাড়ীটা সে ঠিক করিয়া দিতে লাগিল এবং যখন মুখ তুলিল তখন চেষ্টা তার সফল হইয়াছে,—চোখের জল চোখের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছে,—উপরন্তু ফুটিয়া উঠিয়াছে অধর প্রান্তে ঈষৎ একটুখানি স্নেহ-করুণ স্নিগ্ধ হাস্য।

বাড়ী আসিয়া পিসিমাকে দেখিয়া সর্ব্বাণীর প্রবল ঔৎসুক্য প্রশমিত হইল। পিসিমাও 'সবুমা'কে বুকে টানিয়া পরম স্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সতৃষ্ণ চোখে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ওমা! কত বড়টি হয়েছিস্ রে! আমি তো সেই চার বছরেরটি দেখেছিলাম! ডালি আর তুই দু'জনেই ত সমান বয়সী,—ও বুঝি

ক'মাসের ছোট।" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কতকটা আত্মগতই কহিলেন,—"পোড়া কপালীর মুখের সঙ্গে খুব মিল আসে!"

আরও একবার আরও একটা তপ্ত শ্বাস বিমোচন করিয়া তিনি মুখটা ফিরাইলেন। চোখ দুটা অশ্রুজলে ভরিয়া গিয়া ভরা পুকুরের মত ছল ছল করিতে ছিল।

সর্ব্বাণী সাশ্চর্য্যে ও কিছুটা বোকার মত পিসিমার দিকে চাহিয়া থাকিল, কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন সুরঞ্জন। তাঁকে সামনের হলের একটা কুসনওয়ালা কৌচে বসানো হইয়াছিল, পথের কষ্ট লাঘবের জন্য আয়োজন ও চেষ্টা যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দৌর্ব্বল্যজনিত যতটুকু ক্লেশ বোধ হইয়াছিল তাহাতেই তিনি একটু ক্লান্ত হইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ গম্ভীর গলায় ডাকিয়া উঠিলেন,—

"গোলাপ! শুনে যাও।"

বোন কাছে আসিলে নিজের পাশে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "বোস।"

ভাইবোনে মৃদুকণ্ঠে কি আলোচনা হইল তাঁরাই জানেন, বোন যখন উঠিয়া গেলেন, শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে গেলেন। আর ক্লান্ত সুরঞ্জনকে ক্লান্ততর দেখাইল। ইতিমধ্যে ডালি আসিয়া সর্ব্বাণীকে দখল করিয়াছে। সুরঞ্জনের পুরাতন ভৃত্যের হস্তে তাঁর প্রয়োজনীয় সেবার ভার দিয়া সর্ব্বাণী ডালির সঙ্গে তার মহলে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে তাদের দুজনকার ব্যবস্থা একসঙ্গেই করা হইয়াছিল।

স্নান সারিয়া গাঢ় নীল রংয়ের একটি মারহাট্টি শাড়ী এবং হলদে রেশমের চেলি পরিয়া ভিজা চুল পিঠে ছড়াইয়া ফিরিয়া দেখিল চায়ের টেবিলে সুকুমার ও ডালি তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। সে আসিতে দুজনেই তাকে সাগ্রহে সম্বর্দ্ধনা জানাইল। সুকুমার তার দিকে চাহিয়া

বিস্ময়-মুগ্ধ হইল। সদ্যোস্নাতা নীলাম্বরী তরুণীকে তার যেন অভিনব বলিয়া মনে হইল। কাশ্মীরীদের সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া থাকিয়াও বাংলার নিজস্ব রূপ যেন তার আশ্চর্য্য মত লাগিল। এদের রূপের মধ্যে খর রৌদ্রের উগ্রতা নাই, শ্যামস্নিগ্ধ স্বল্প জ্যোৎস্নার মতই এই বাংলার রূপ। ডালিও তার দিকে মুগ্ধভাবে চাহিযা মনের আনন্দ চাপিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিযা ফেলিল,—"তোমাকে কি সুন্দর দেখতে সবুদি! যেন পটে আঁকা ছবিটি!"

সর্ব্বাণী সলজ্জে তার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল—"ফাজলামী রেখে দাও!—আমার পিসিমার কাছে আমি?"

ডালি কহিল, "মায়ের কথা ছেড়েই দাও। মায়ের 'টাইপ' অন্য। কিন্তু তোমার চেহারায একটা বেশ আর্ট আছে। গ্রীসিয়ান আর্টের মতন—ভেনাসের ছবির সঙ্গে খুব মেলে,—"

সর্ব্বাণী সুকুমারের সাক্ষাতে নিজের রূপ বর্ণনায় বিব্রত ও বিত্রস্ত হইয়া উঠিয়া সবেগে বাধা দিল,—

"রক্ষা করো! ভেনাস মেনাস আমি মোটেই নই। আচ্ছা ডালি! স্রেফ্ রূপ বর্ণনা শুনেই কি আমার পেট ভরবে? কাল কখন সেই কি খেয়েছি, ক্ষিধে আমার পায়নি?"

ডালি অপ্রতিভ হইযা তাড়াতাড়ি এক প্লেট খাবার তার দিকে সরাইয়া দিযা চা-দানির মধ্যে চামচ চালাইতে চালাইতে কহিয়া উঠিল,—

"আহারে! তাইতো! এই যে ভাই! ততক্ষণ আরম্ভ করো, চা-টা ছেঁকেই দিচ্চি। সত্যি, বেলা হয়ে গেছে—ক্ষিধে ত পাবেই। কিন্তু সবিদি! আমার আজকে আর ক্ষিধে তেষ্টা নেই।"

সুকুমার তার মুখে ভরা রুটির টুক্‌রোটাকে আয়ত্ত গত করিয়া লইয়া বোনের দিকে ফিরিয়া মুখ ভেঙ্গাইল,—

"ভাই তো'রে ডল্‌কামারা! তুই যে দেখতে দেখতে একজন মস্ত কবি বনে গেলি! ভেনাসের ক'টা ছবি তুই দেখেছিস বল্‌তো? গ্রীসিয়ান আর্টের কি ধার ধারিস তুই শুনি? নূতন মানুষ পেয়ে খুব তো বিদ্যে জাহির করছিস্‌। সর্ব্বাণি! তুমি হয় ত জানোই না, আমাদের ডল্‌কামারা একবার কবিতা প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছিলেন। তারপর কবিতা লিখতে ব'সে কিছুতেই যখন মিল খুঁজে পেলেন না, তখন তেউড়ে মেউড়ে হাত পা খেঁচে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললেন,—"

ডালি চা-এর পেয়ালা প্রত্যেককে ঠেলিয়া দিযা তীব্র প্রতিবাদে চিৎকার করিয়া উঠিল,—"দেখ দাদা! মিথ্যে কথা বলো না কিন্তু,—ভাল হবে না বলে দিচ্চি! ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিলুম?—না, তুমি মিথ্যে করে চারদ্দিকে ঐ কথা রটিয়েছিলে? এমন উস্তন খুস্তন তুমি আমায় সেই থেকে ক'রে এসেছ,—বাপ্‌! আজও তার শেষ হলোনা।"

সুকুমার পুনশ্চ তার দিকে চাহিয়া গম্ভীর মুখে মুখ ভ্যাঙ্গাইল,—"শেষ কি আছে যে হবে? দার্শনিকরা বলেছেন, জগৎটা নাকি যেমন অনাদি তেমনি অনন্ত,—অপিচ মানুষের আত্মাও নাকি আবার অবিনশ্বর! দেহ মরলেও সূক্ষ্ম শরীর তখন আবার শূন্যে গিয়েও ঘর সংসার পাতে। তবে বোঝ ব্যাপারটা কি রকম! শেষ অম্‌নি হলেই হ'ল? যদ্দিন না মরছি তোমার সেই কবিতা লেখা আমি তা'বলে এ জন্মে আর ভুলছি'নে। উঃ সে কি মজারই কবিতা! শুনবে সর্ব্বাণী? আমার সেটা একদম মুখস্থ হয়ে আছে।—হবেনা কেন? কলেজের পড়ায় কত শক্ত শক্ত নোট মুখস্থ ক'রতে হয় নি? না পারলেই তো ফেল মারা। আর অমন চমৎকার কবিতাটিই বা কি দুঃখে ভুলে যাব?—আচ্ছা বলি শোন, অবহিত হও—শৃণ্বন্তু—"

ডালি নিজের হাতের চা-এর পেয়ালাটা টেবিলের উপর ঠক করিয়া

নামাইয়া দিয়া তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল,—"দাদা! ও দাদা! তোমার পায়ে পড়ি—"

সুকুমার গম্ভীরপূর্ণ প্রশান্ত স্বরে জবাব দিল,—"পায় পড়বি? তা' পড়্ না। আমার পায়ে পড়লে ত তোর জাত যাবে না। শোন সর্ব্বাণি! মন দিয়ে শুনে যেও,—কবিতার নাম হচ্চে, 'আহা কি সুন্দর'!

"কি সুন্দর আহা মরি চাঁদের আলো,
আমার প্রাণে বড় লেগেছে ভালো,
চকোর হলে চাঁদের কাছে যেতাম,
সারা রাত ধরে তার সুধা খেতাম,
মানুষ হয়েছি তাই রয়েছি বাড়ীতে,
যেহেতু মানুষ কভু পারে না উড়িতে।"

সুকুমার আবৃত্তি থামাইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রে ডল্‌কামারা! আরও বলবো? নাঃ, আর বলবো না। ডল্ এবার নিশ্চয় কেঁদে ফেলবে! হুঁ—তারি তোড়জোড় হ'চ্ছে দেখছি। কিন্তু সর্ব্বাণি! কবিতাটি কেমন শুনলে তা' বলো?"

সর্ব্বাণীর এ ছেলেমানুষী কবিতা যেমনই লাগুক, এদের ভাই-বোনের এই স্নেহ-মধুব সম্পর্কটি তার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। সে হাসিমুখে সুকুমারের প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিল,—"এমনই বা মন্দ কি? নেহাৎ খাঝাপ তো কই আমার লাগলো না।"

সুকুমার করুণভাবে উহার মুখের দিকে চাহিল, গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল,—"তোমার বি-এ পরীক্ষায় কি সাব্‌জেক্ট ছিল? সংস্কৃতে দিয়েছিলে না?—কি কি বই ছিল?"

সর্ব্বাণী কহিল,—"মেঘদূত, আর কুমারসম্ভবের তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গ।"

সুকুমার মৃদু হাসিয়া কহিল,—ওঃ, "তাই বল!—ডল্‌কামারাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলে? আমি বলি কাব্য-সম্বন্ধে মাথাটি বুঝি সায়েন্স দিয়ে নিরেট করে ভরিয়ে রেখেছ!"

ডালি রাগ করিয়া গুম্ হইযা রহিল, তার চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সুকুমার খপ্ করিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া এক চুমুকে পার করিয়া দিয়া তার দিকে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি সবেগে প্রদর্শন করিল।

রাগ ভুলিযা ডালি চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"ও এঁটো চা,—খেও না খেও না,—" কিন্তু ততক্ষণে সুকুমার চায়ের কাপ্ খালি করিয়া ফেলিযাছে। মুখ খিঁচাইযা জবাব দিল,—"ইকনমির জ্ঞান নেই? একান্ত অপচয় হচ্ছিল দেখেই সদ্‌গতি করে দিলাম না। জঠরাগ্নিতে পড়ে সব কিছুই যে পরিশুদ্ধ হ'যে যায তা'ও জানিসনে? মুখ্যুর শেষ একটি।"

সর্ব্বাণী এদের দু'জনকার দিকে চাহিয়া একটা মৃদু নিঃশ্বাস অতি সন্তর্পিতভাবে গোপনে মোচন করিল।—হায়! সে তো কোনদিন এ সুখের স্বাদ পায় নাই। কত দিক্ দিয়াই যে তার এ বিড়ম্বিত বিপাকগ্রস্ত জীবন প্রবঞ্চিত হইয়াছে।

এমন সময় সামনের ঘর হইতে কেহ হাঁক পাড়িল,—"কি হে গঙ্গু!—"

ডালি ত্রস্তে সহজ হইয়া বসিল,—সুকুমারও স্বাভাবিক হইয়া বোনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আস্‌তে বলি?"

ডালির গাল লাল হইয়া উঠিল, চোখের পাতা নত হইয়া আসিল কিন্তু সে ত্বরিতে সর্ব্বাণীর দিকে চাহিয়া উত্তর দিল,—"সবুদি'র যদি না আপত্তি থাকে?"

পুনশ্চ আহ্বান আসিল,—"কি? ফিরবো নাকি গঙ্গরাজ?"

সুকুমার তখন সর্ব্বাণীর দিকে চাহিয়া তার অনুমতি চাওয়ার ভাবে কহিল,—"আমার বন্ধু—মিষ্টার জি. পি. ব্যানার্জ্জী, আই-এফ-এস্,—সর্ব্বদাই এবাড়ীতে যাতাযাত করে থাকেন—"

সর্ব্বাণী নিজের আঁচল টানিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ-পূর্ব্বক বলিল,—"আপনার আপত্তি না থাকে তো আমারও নেই।"

চাকর আসিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র পরিষ্কার করিতেছিল, তার কাজ শেষ হওযার পূর্ব্বেই সুকুমারের আহ্বানে তার বন্ধু পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল।

হাফ্‌প্যাণ্ট পরা, সার্টের আস্তিন গুটানো, চোখে টর্‌টয়েজ সেল চশমা, হাতে সোলা হ্যাট্‌, যেমন সাধারণ বিলাত-ফেরতা কমবয়সী ছেলেরা আজকাল হয়। চেহারাটি লম্বাচওড়া, রংও নেহাৎ ময়লা নয়, হাবভাব সুভদ্র। ঘরে ঢুকিয়া সে সর্ব্বাণীকে দেখিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত হইল,—তারপর তার মুখের দিকে চাহিতেই বিস্ময়মিশ্র প্রশংসায় চোখের দৃষ্টি তার ভরিয়া গেল। স্বল্প পরে অশিষ্টতা হইতেছে বুঝিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিলেও মনের মধ্যে একটা বিস্ময়ের ঢেউ লাগিয়া রহিল, সে বিস্ময়ের অর্থ—কে' এই সুদর্শনা তরুণী ?

ইতিমধ্যে সুকুমার উঠিয়া তাকে একটা চৌকি সরাইয়া দিয়াছে, বাড়ীর ছোকরা চাকর ধনিয়া অভ্যাগতের জন্য এক কেটলী গরম জল লইয়া আসিয়াছে, ডালি নবাগতের জন্য চা তৈরী করিতে নতমুখে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সর্ব্বাণী আগন্তুকের অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে।

সুকুমার বলিতে লাগিল,—"বোনার্জ্জী ! এসো এর সঙ্গে তোমায় 'ইনট্রোডিউস্' করে দিই।—ইনি হ'চ্ছেন আমার মামাতো বোন সর্ব্বাণী দেবী।—সর্ব্বাণি ! ইনি হচ্ছেন,—আমার বন্ধু মিষ্টার জি. পি. বোনার্জ্জী এবং এট্‌সেট্রা, এট্‌সেট্রা, সে ত আগেই বলে দিইছি।"

পিসিমার বাড়ী সর্ব্বাণীর বড়ই ভাল লাগিল। শৈশব হইতে একলা জীবনই সে অতিবাহিত করিয়াছে, মধ্যে দু'দিন জুটিয়াছিল মণিকা, জীবনের একটা অনাস্বাদিত নূতনত্ব দু'দিনের জন্যই সে আর তার ছোট্ট ছেলেটাই তাকে জানাইয়াছিল, আর তার পরই তার জীবনে একরকম তারাই উপলক্ষ্য হইয়া ঢালিয়া দিয়াছে একটানা নিরানন্দ! সর্ব্বাণীর মনে হয় যদি কখন সে মণিকাদের সঙ্গে পরিচয়ে না আসিত তো তার কথা যাক, তার বাপের কপালে অন্ততঃ এত বড় বিড়ম্বনাটা ঘটিত না। মণিকাদের লইয়া অতটা গলিয়া পড়া সর্ব্বাণীর ভাল হয় নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কখন সে বাহিরের কাহাকেও আপন করিতে যাইবে না। পর কখন আপন হয় না, অথচ পরকে ভালবাসিয়া বিশ্বাস করিয়া অনর্থক ঠকিয়া মরিতে হয়। মণিকাদের আত্মীয় জানিযাই তো সে নির্ব্বিচারে ঐ অর্থগৃধ্নু বরের বাপকে বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিল, যিনি বিবাহ-সভায় কনের বাবাকে দানদ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই! যিনি ভাবী পুত্রবধূর অঙ্গের অলঙ্কার স্বর্ণকারের মত তৌল করিতে লজ্জিত নহেন! মণিকার প্রতি ভালবাসা একেবারে মুছিয়া না গেলেও দুর্জ্জয় অভিমান তার উপর একটা স্থূল আবরণ ফেলিয়া দিয়াছিল। মণিকার উহাদের সম্বন্ধে অত বড় সার্টিফিকেট দাখিল করা তা' বলিয়া ভাল হয় নাই। মণিকার পরিবর্ত্তে আর কেহ বলিলে সে কি অত সহজে অতটাই বিশ্বাস করিত?

অথচ সর্ব্বাণী জানে না, অপর কেহ হইলেও অত সহজেই সে অমনিই বিশ্বাস করিয়া লইত। সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই তাকে প্রধানতঃ প্রবঞ্চনা করিয়াছে এবং আজও করিতেছে এই কথাটা সে ভাল করিয়া

ভাবে না কেন ? সে যদি সংসার জ্ঞান সংযুক্ত হইত তো মণিকাদের সে যতটা দোষী করিতেছে তা' করিত না। এদেশের বরের বাপেদের এই ব্যবসা বুদ্ধিকে বড় একটা কেহই হীনতাবাচক মনে করে না। সাধারণতঃ কনের বাপেরা বরের আত্মীয়দের উপরওয়ালার চক্ষে দেখিতেই অভ্যস্ত। 'পায়ে ধরিয়া'—না কি কন্যাদান করিতে হয়! অন্ততঃ সম্প্রদানের পূর্ব্বে জামাতা অর্চ্চন মন্ত্রের এইরূপই একটি বিকৃত ব্যাখ্যা সাধারণতঃ এ দেশের সমাজে প্রচলিত আছে। 'পায়ে ধরে মেয়ে দিয়েছেন জানেন না!' —বর এবং বরপক্ষীয়েরা এই কথাটি বেশ চড়া সুরেই অপ্রতিবাদে আস্ফালনে যত্র তত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সে জন্য কোনদিন তাঁদের কোন সামাজিক দণ্ডবিধানের ব্যবস্থাও নাই। এদেশে একটা প্রবাদই দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, 'লাখ কথার কমে কি একটা বিয়ে হয়!' অতএব কথার কচ্‌কচিতে বিবাহটা যে না জমিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে সে ধারণা স্বপ্নেও কি কখন ইতঃপূর্ব্বে ছিল ? কাহারও জানা এর চাইতে কত কত তা-বড় তা-বড় ব্যাপার ওই সম্প্রদান সভায় ঘটিয়া গিয়াছে,—বিবাহ ভাঙ্গিয়াছে কাহার, বা কয়টা ? মণিকারাই বা এই আশ্রম-পালিতা নারী-বর্জ্জিত-সংসারেব বন্য-হরিণীকে চিনিবে কিরূপে ? একদিকে সে যেমন ননীর মত গলিয়া পড়ে, আবার আর দিকে তার আদর্শের সঙ্গে না মিলিলে বজ্রের মত উদ্যত হইয়া উঠে, এটা যে তার রক্তের দোষ। বিশেষ ওঁদের এই প্রথম ছেলের বিবাহে কন্যাকর্ত্তাদের সঙ্গে ওঁরাই বা কেমন ব্যবহার করিবেন সে কথা উহারা জানিবেই বা কেমন করিয়া ?

পিসিমার বাড়ী আসিয়া সর্ব্বাণী তার একটানা জীবনে নূতনত্বের সুমিষ্ট আস্বাদ পাইল। যতই হোক ছেলেমানুষ ত সে, এ বয়সে মন যে বড় সহজেই গলিয়া পড়ে, কেহ একটু আত্তি দেখাইলে তাহারই হইয়া পড়িতে সাধ যায়,—এইটা যে এই বয়স কালের ধর্ম্ম! সর্ব্বাণী দু'চারদিন নিজের

পণ বজায় রাখিবার জন্য ছাড়া ছাড়া রহিল বটে, কিন্তু বেশীদিন পারিল না। ডালি তাহাকে শীঘ্রই আয়ত্ত করিয়া লইল। বাস্তবিক, এমন মেয়ে সে, তার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই! একহারা ছিপ্‌ছিপে পাতলা শরীর, ছোট্ট মুখখানিতে বাঁশির মত নাকটি টিক্ টিক্ করিতেছে, দু'টি চোখ সর্ব্বাণীর চোখের মত বিশালও নয়, অমন অতলস্পর্শী গভীরতাও উহাতে নাই, কিন্তু এমন কিছু একটা আছে, যাহা হইতে মন ফিরানো যায় না। চঞ্চল-চটুল হাস্যাভাসে ভরা যেন একটি কৌতুকের ঝরণা সেই দুটি চোখের মধ্যে ঝরো ঝরো হইয়া আছে। সূক্ষ্মতার তুলনায় হয়ত হার মানিতে বাধ্য,—কিন্তু গভীর চিন্তাশীলতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাষে পরস্পর সংযুক্ত সর্ব্বাণীর ওষ্ঠাধরের চাইতে হাসির প্রলেপে রঞ্জিত ডালির ঠোঁট দু'খানি যেন ভোরের বেলার তাজা ফুলের পাপ্‌ড়ীর মতই ঢল ঢলে বলিয়া দর্শককে তৃপ্তি দেয় ঢের বেশী। সব চাইতে বড় গুণ ডালি মেয়েটি বড়ই মিশুক স্বভাবের। সর্ব্বাণীকে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে, একেবারেই একলা হইতে দেয় না। প্রথম প্রথম সর্ব্বাণীর ইহাতে অস্বস্তি বোধ হইত। জন্মাবধি সে ত' কখন এমন ছায়ানুগামিনী কাহারও সাহচর্য্যে থাকিতে অভ্যস্ত নয়। তার জীবন-যাত্রার প্রণালী সবই যে নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। এখানে কিন্তু তার সেই চিরঅভ্যস্ত পথে চলিবার উপায় মাত্র রহিল না। বর্গীর উপদ্রবের মত পথ সে ডালির হাতে নিয়তই উপক্রুত হইতে লাগিল। স্নানের ঘরে খিল লাগাইতে উদ্যত হইয়াছে, পাগলা হাওয়ার মত উদ্দামভাবে ডালি ছুটিয়া আসিয়া দড়াম্ করিয়া দোর ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল,—

"ও সবুদি! সবুদি! রক্ষে কর,—'নো অ্যাডমিশন' করো না ভাই! সাবান দিয়ে আমার পিঠটা একটু রগ্‌ড়ে দাও,—আমিও অবশ্য হাতে হাতে তোমার ঋণ শোধ করে দেবো। একা একা 'চান' কর্‌তে ভাই,

আমার মোট্টে ভাল লাগে না,—কি করে লাগবে? অনেকক্ষণ মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে তো।”

রাত্রে তারা একই ঘরে শোয়। দু’জনের দু’খানা খাট। একদিন পরেই দেখা গেল দু’খানাকে একত্র জুড়িয়া একটা মাত্র বিছানা পাতা রহিয়াছে। ডালি নিজ হইতেই কৈফিয়ৎ দিল, বলিল,—“শুয়ে শুয়ে আমি অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত বকে মরি, আর তুমি মজা করে ঘুম দাও, আর কিন্তু সেটি হচ্চে না! বুঝেছ ঠাক্‌রুণ! ঘুমোলেই এম্‌ন ‘কাতুকুতু’ দেবো, টেরটি পাবে তখন।”

সর্ব্বাণী এই সকল উপদ্রব প্রথম প্রথম বাহিরে প্রকাশ না করিলেও মনে মনে বিরক্তি বোধ যে না করিয়াছে তা’ নয়, কিন্তু বেশী দিন তার মনের এ নিস্পৃহা বজায় রাখিতে সে পারিল না। ডালি তাকে তার প্রতি অনুরক্ত করিয়া ছাড়িল। উপায় কি? একজন যদি ভালবাসাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে, কে’ এমন বৈরাগী আছে, যে, নিজেকে চিরদিন নির্লিপ্ত রাখিতে সমর্থ হয়? ডালির অত্যাচার সহনে সর্ব্বাণী দিনে দিনেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। তার শাসনে আব্দারে তার মন আর এখন বিরক্ত হয় না, ধাড়ী-মেয়ের আহ্লাদেপনা মনে হয় না, তা’ ভালই লাগে। কদাচিৎ না করিলেই বরং যেন ফাঁকা ঠেকে।

ক্রমশঃ এমন হইল যে, তার খুন্‌সুটির জবাবে সেও হয়ত তার গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া তার সঙ্গে খানিকটা খুন্‌সুটি করিয়া বসিত এবং এ লইয়া দু’জনে হুড়াহুড়িও পড়িয়া যাইত। তারপর অনভ্যাস প্রযুক্ত মুখ কাণ গলা পর্য্যন্ত লাল করিয়া এক গা ঘামিয়া সে যখন পরাজিত হইয়া আসিত, ডালি তখন সোহাগ ভরে দু’হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিত। নিজের একটা কাণ তার সাম্‌নে আনিয়া আব্দারের সুরে বলিয়া উঠিত,—“আচ্ছা ভাই। এই ঘাট মান্‌লুম। দে’ এই কাণটা মলে,—আর যদি কক্ষণ তোকে চিমটি কেটেছি তো কি বলেছি,—তখন সবুদি! তুই ভাই আমার নাম বদলে দিস্।”—

পরক্ষণেই—"কই দিলি নি?" বলিয়াই তাকে সজোরে 'কাতুকুতু' দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইল। তখন হয়ত বা' উৎসাহে সর্ব্বাণীও রুখিয়া উঠিয়া বলিয়া বসে,—"বটে! আচ্ছা দাঁড়া তোকে দ্যাখাচ্চি।"

সুরঞ্জন সর্ব্বাণীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। বোনের ও ভাগ্নীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁর চক্ষু গোপনে সজল হইয়া উঠিল। ভাগ্যে গোলাপ তাঁদের আসিতে লিখিয়াছিল! সবু যে এমন করিয়া হাসিতে পারে, এমন হালকা মনে খেলাধূলায় মাতিয়া উঠিতে জানে, এ যেন তাঁর কাছে স্বপ্ন জগতের বার্ত্তা! বৃদ্ধের সঙ্গে সেও যে বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিয়াছে, যৌবনে জরা আনিয়া যযাতি-সন্তান পুরুর মতই সে যে পিতৃসেবায় জীবনোৎসর্গ করিযাছে, কেমন করিয়া তিনি সে দুঃখ ভুলিবেন?

একদিন দু' ভাইবোনে এই আলোচনাই হইতেছিল। শান্ত গম্ভীর-মুখে উদাস নেত্রে চাহিয়া সুরঞ্জন ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিয়া ছোটবোনের অনুযোগের উত্তর দিলেন। গোলাপসুন্দরী যখন তখন অনুযোগ করিয়া বলেন, "খাম-খেয়ালি মেয়ের জন্যে তুমি প্রাণটা দিতে বসেছ দাদা!"

এই উত্তরের প্রতি কিন্তু গোলাপসুন্দরীর কিছুমাত্র আস্থা হইল না। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"ওসব কথা শুন্‌তেই ভালো। ইতিহাসে, পুরাণে, গল্পে, উপন্যাসে দিলেই মানায়, কিন্তু মানুষের সংসারে ওধরণের ধারালো রসালো কথার কোন দাম নেই এবং থাকলেও নিষ্ফল। মেয়ে যদি তোমার বিয়ে-থা' করে ঘরসংসার করতো তুমি কি তা'তে অনেক বেশী সুখীই হতে,—না মনের দুঃখে বুক ফেটে যেত? পুরুর সঙ্গে ওর মিল কি হলো? এখনকার মেয়েরা ঐ রকম মারমুখো পল্টনের গোরার মতই হয়েছে, সেই আদত কথা। ওরা বলতে চায় 'তুম্‌ভি মিলিটারী তো হাম্‌ভি মিলিটারী'।"

বলিয়া নিজেই তিনি হাসিলেন। সুরঞ্জনের মুখেও একটুখানি মৃদু হাসির আমেজ খেলিয়া গেল। গোলাপসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ধেড়ে করে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া এই যে উঠেছে, এর ফলে দেখো সমাজের কি অবস্থা ঘটে, সমাজ বলে আর কিছুই থাকবে না, এ তারই লক্ষণ। ঐ যে রবিবাবুর একটি পদ্যে পড়েছিলুম,' 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।'—তা' কবিবরের সে কল্পনা এবার সার্থক হবে—বাঙ্গালী ভদ্রসংসার এর পরে বেদুইনীই হবে। 'আমারই ঘরে দেখো না, ঐ যে অতবড় ধেড়ে ছেলে,—পড়াশোনা সাঙ্গ করে চাকরীও করছে, দু'পয়সা আছেও তো যাহোক ঘরে, নেহাৎই ত আর আমরা ডোক্‌লা নই,—বিয়ে কর্ব্বেন না।"

সুরঞ্জন কি যেন ভাবিতেছিলেন, গোলাপ চুপ করিয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁর চট্‌কা ভাঙ্গিল, মৃদুকণ্ঠে কতকটা আত্মগতই কহিলেন বা বোনের শেষ কথাটিরই পুনরুক্তি করিলেন,—"বিয়ে কর্ব্বে না?"

গোলাপসুন্দরী কহিলেন, "না, বিয়ে কর্ব্বে না। বিয়ে যে কর্ব্বেই না তা' অবশ্য স্পষ্ট করে বলে না, কি যে সব বাপু বলে সে ছাই আমি বুজতে পারি নে। যখনি বিয়ের কথা বলা যায়,—উত্তর দেয় 'এখন নয়।' কখন যে ওঁর সেই মহেন্দ্রক্ষণ আসবে, উনিই জানেন।—আমার যেমন পোড়া কপাল! নিজের পেটে হয় নি, পরের ছেলে মানুষ করে মায়ায় জড়িয়ে গেছি, নইলে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হ'য়ে দু'জনে তো কাশীবাসই করতাম।"

তারপর আবার বলিলেন, "তাই বা কি বল্‌বো বল? এই ডালির জন্যেও তো কম খোঁজা খুঁজি নে', সেই কি এতদিনে দিতে পেরেছি? আর তা'ও বলি, এত দূরে বসে থাকলে কি মেয়ের বিয়ে হয়? সম্মানেই বলছি যে, কলকাতায় যাই চলো, তা' তো শুন্‌বে না কেউ আমার কথা।

ধুম্বো-ধাড়ী মেয়ে গলায় ঝুলিয়ে বাপ বেটায় নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছেন।”

সুরঞ্জন এবার সাগ্রহকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “আমার সঙ্গে যেও, কলকাতায় গিয়েই না হয় কিছুদিন থাকা যাবে।”

গলার স্বর নামাইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া গোলাপ উত্তর দিলেন, “দেখা যাক্ যদি এই ছেলেটির সঙ্গে লেগে যায়, তা’হলে আর ও সব হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। মনে ত’ হয় যেন ডালিকে ওর অপছন্দ হয় নি, এখন মেয়ের বরাত!”

সুরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন ছেলের কথা বল্‌ছো?”

তাঁর কণ্ঠে ঈষৎ বিস্ময়ের রেস।

“তুমি কি দেখ নি? ঐ যে সুকুমারের সঙ্গে প্রায়ই আসে, ওর ওপোরওলা—কি। বাঁড়ুয্যে যেন আজকালকার কি যে সব ঢঙের নাম হয়েছে বাপু, সে সব ছাই মনেও থাকে না! কি যে জি. পি. না কি বলে ওরা।

সুরঞ্জন কহিলেন, “হ্যাঁ, সেদিন একটি স্যুটপরা ছেলে সুকুমারের সঙ্গে এলো বটে, আমি বারাণ্ডায় ছিলুম, ভাল করে দেখি নি। তবে চেহারাটি ভালই মনে হলো।”

গোলাপ কহিলেন, “ছেলেটি বেশ, মাইনেও মোটা, তবে কেমন যেন কাটখোট্টা কাটখোট্টা ধরণ ধারণ। আমাদের সেকেলে চোখে ঠিক পছন্দ হয় না, কিন্তু কি আর করবো,—যে কালের যে ধর্ম্ম! নিজের ঘরই যখন সাম্‌লাতে পারি নে’, তখন পরের কাছে বিনয় নম্রতা চাইতে গেলেই বা পাবো কি করে? ঐ হলেই এখন বেঁচে যাই, মেয়েও ত আর কম ধাড়ীটি হয় নি, অমন বয়সে সেকালের মেয়েদের নিজের বিয়ে ছেড়ে মেয়ের বিয়েরও সময় হয়ে আসতো।”

সর্ব্বাণীর পিসিমার বাড়ী ইষ্ট ক্যানাল রোডে, বাড়ীর নাম 'রোজ কটেজ'। গৃহকর্ত্রীর নামের সঙ্গে মিল দেখিয়াই হয়ত বা বাড়ীখানি কেনা হইয়াছিল। উঁচু ফ্লোরের উপর পরিচ্ছন্ন বাংলো। সংশ্লিষ্ট জমির তিনপাশে নীচু পাঁচিল ঘেরা ঐ জমিটিতে শতাধিক গোলাপগাছ বাড়ীর নামকরণকে সার্থকতা দান করিতেছে—

দেরাদুন গোলাপফুলের দেশ। এত অজস্র ও নানাজাতীয় গোলাপফুল বোধ করি এ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও ফোটে না। এক একটা গাছে হাজার হাজার ফুল ফুটিয়া চারিদিকে আলো ছড়াইয়া আছে। একহারা ছোট ফুল, থোকা থোকা বড় ফুল, বৃহদাকারের লাল, সাদা, হল্‌দে ফুল, কোন কিছুরই এখানে অভাব নাই। উপরন্তু গেটের উপর, পাঁচিলের গায়ে, দেওয়ালে দড়ি বাঁধিয়া তোলা, মাচার উপর কুঞ্জকরা থামের গায়ে জড়ানো গোলাপের লতায় প্রায় এখানের সমস্ত বাড়ীরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খচিত। অন্য কোন গাছপালার বালাই নাই, কেবল প্রাচীরের ধারে ধারে একসারি ইউক্যালিপ্‌টাস্ সান্ধ্যবাতাসটাকে মিষ্ট-গন্ধী ও স্বাস্থ্যময় করিয়া তোলে। আর ছিল একধারে একটা সবুজ রংয়ের প্রকাণ্ড বাঁশঝাড় এবং আঙ্গুর কুঞ্জ।

সর্ব্বাণীর সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে এই বাগান। যখন তখন আসিয়া সে এর প্রত্যেকটি ফুলভারাবনত গাছের কাছে কাছে দাঁড়ায়, গাছের তলায় শুক্‌নো পাতা সরাইয়া দেয়, ঘাস থাকিলে তুলিয়া ফেলে, ডাল নামাইয়া ফুলগুলির গন্ধ শোঁকে, কদাচিৎ একটি দু'টি ফুল তুলিয়া নিজে একটি খোঁপায় পরে এবং ডালির জন্য একটি তুলিয়া লয়। নির্ম্মমভাবে ফুল তুলিতে তার প্রাণে ব্যথা বাজে। ডালি প্রথম প্রথম তার পুষ্প-প্রীতি দেখিয়া মালিকে দিয়া বড় বড় গোলাপের তোড়া বাঁধাইয়া আনিত, কিন্তু সর্ব্বাণীর তা' মনঃপূত হয় নাই। ভর্ৎসনা-

ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, "অত করে ফুল নষ্ট করতে মায়া হয় না ?"

ডালি তা' শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়া উত্তর দিয়াছিল, "না, মায়া কেন হবে ? ফুল ত' তোল্‌বার জন্তেই।"

সর্ব্বাণী স্মিতমুখে অথচ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "যখন তখন যা' তা' করে ? যত খুসী ?"

ডালি বিস্মিত হইল। সর্ব্বাণীর প্রশ্নটার মধ্যে কোন নিগূঢ় অর্থ নিহিত আছে বুঝিয়া নীরব রহিল, কারণটা কিন্তু সে ধরিতে পারিল না। একটুক্ষণ অপ্রতিভ থাকিয়া তারপর ফুলের তোড়াটা সজোরে তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "আজকের মতন নাও তো মহারাণী!—কাল থেকে আর ডালি পাবে না। মেয়ের সকলই অনাসৃষ্টি! গাছে গাছে প্রজাপতির মতন ফুল শুঁকে বেড়াবেন, হাতে করে শুঁক্‌লেই মহাভারত অশুদ্ধ হযে যাবে।"

সর্ব্বাণী হাসিয়া পতনোন্মুখ তোড়াটিকে ধরিয়া ফেলিল, কতকগুলি ফুলের পাপ্‌ড়ি খসিয়া গিয়াছিল, একটা গোলাপ কাঁটাও তার হাতে বিঁধিয়া গেলো, গ্রাহ্য না করিষা হাসিমুখে জবাব করিল,—"গাছে ফুল শোভে যেমন' গানটা জানো ত ?"

ডালি হয়ত এ গান জানিত না,—কাশ্মীরে পালিতা সে, বাছা বাছা গান গল্প ভিন্ন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার খুব বেশী ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি হার না মানিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া জবাব দিল, "এই যেমন তুমি শোভা পাচ্চো!"

সর্ব্বাণীও কীল খাইয়া কীল চুরি করিল না ফিরাইয়া দিল, উল্‌টিয়া কহিল, "আর তুমিও—"

ডালি ভুরু সমেত দু'চোখ টানিয়া যেন অবাক্ হইয়া গিয়া বলিয়া

উঠিল,—"বাঃ রে! আমি আবার কতক্ষণই বা শোভা পাবো? টেনে হিঁচ্ড়ে তুলে ফেলবার জন্যে চেষ্টা চরিত্র তো চলেইছে—চলেইছে! শোভা নেই বলেই না যেটুকু দেরি হচ্চে,—তা' থাকলে এতদিন কোন কালে না কোন কালে,—হ্যাঁ ভাই সবুদি! তুমি কি ভাই বিয়ে করবেই না?"

সর্ব্বাণী এ প্রশ্নের উত্তরের দায় এড়াইযা এ পর্য্যন্ত এই মেয়েটির প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট ছিল, আজ হঠাৎকাবে সেই একান্ত অনীপ্সিত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত হইয়া সে যেন থমকিযা গেল। চাপা বিরক্তিতে তার ভ্রূ-কুঞ্চিত হইল, তারপর মনের সে ভাবটাকে সবলে দমন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন পরিহাসে উত্তর করিল, "দূব! আমার না কি আবাব বিয়ে হয়? আমি যে 'দো-পড়া' রে!"

এই বলিয়া সে জোর করিযা হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ডালি তা'তে ভুলিল না—সবেগে কহিয়া উঠিল, "যাঃ,—'দো-পডা' না হাতী পড়া! সে কি তোর বিযে পুরো হযেছিল নাকি? সম্প্রদানই তো হয় নি, তা' ছাড়া কুশণ্ডিকা না হলে ত সত্যিকাবের বিযেই হয না।

সর্ব্বাণী এই যুক্তি শুনিযা হটিল না বরং পরম গম্ভীরমুখে নির্ব্বিকার-ভাবে জবাব দিল, "এদেশের লোকাচাব তো এই রকমই বে!—হাসছিস্ যে বড়? বিশ্বাস হচ্চে না বুঝি? বিশ্বাস না হয ত যা, পিসিমাকে জিজ্ঞেস করগে,' এই রকম হতো কি না, আমাদের দেশে, এখনও তা' লোপ পায নি। আমরা এর ব্যতিক্রম বলেই না একঘরে হয়েছি।"

ডালি এবার তার সপক্ষে একটা যুক্তি পাইল, সদম্ভে সে হাত মুখ নাড়িযা বিজয়োল্লাসে কহিয়া উঠিল,—"হ'তো কি না!'—ওঃ, সে যদি বলো, সে তো অনেক কিছুই হতো। তখনকার কথা ছেড়েই দাও

না ঠাক্‌রুণ!—তখনকার বিয়ের কনে না কি আবার চেলি চন্দন পরে, পুঁথি কোলে করে বসে,—পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দৌড়ে পালাত? হা হা হা, —কি মজারই দৃশ্য! আহারে! আমিই কি না সেই পরমরমণীয় দৃশ্যের দর্শিকা হয়ে রসোপভোগটা কর্‌তে পেলুম না?—কি অভাগ্যির দশা রে আমার!”

ডালির কথা বলার ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট না হইতে পারিয়া সর্ব্বাণীও হাসিয়া ফেলিল এবং হাসিয়া বলিল, “ভাগ্যে দেখতে পাস্ নি তাই রক্ষে! যারা যারা পেয়েছিল, তাদের কাছে তো ষ্ট্রিক্ট্‌লী বয়কটেড্ হয়ে গিয়েছি। তোরা থাক্‌লে তোরাও তাই করতিস্। এ কথা তো তোকে আর একদিনও বলেছি আমি।”

ডালি চট্ করিয়া সরিয়া আসিয়া সর্ব্বাণীকে জড়াইয়া ধরিল, আদরে আব্দারে ভরাইয়া দিয়া কহিয়া উঠিল, “কক্ষণো না!—কক্ষণো না!—সত্যি সবুদি! আমি থাকলে সেই সময় একখানা ভাঙ্গা কুলো বাজাতে বসে যেতুম। কানা কড়ি আর ছেঁড়া চুল দিয়ে একটা গোবরের পুতুল গড়ে তার মুখটা সেই অভাগা বরের মুখটির ছাঁচে—”

সর্ব্বাণী তাকে সহাস্যে বাধা দিয়া কৃত্রিম প্রতিবাদের ভাবে বলিয়া উঠিল, “আহা বেচারা! তাকে নিয়ে কেন টানাটানি করচিস্ ভাই? সে তো ভাই! কিচ্ছুটিই অপরাধ করে নি।”

অমনি ডালির কণ্ঠে একরাশ ব্যঙ্গের হাসি উথলিয়া উঠিল। সে তার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়া উদ্গত হাস্যে উদ্বেল হইতে হইতে কহিয়া উঠিল, “সত্যি?—তোমার সে বেচারীর জন্যে একটু একটু মন কেমন করে তাহ’লে?—আ হা হা! মরে যাই রে! কোথায় গেলেন তিনি? ঠিকানা যে জানি নে,’—বললে একটু খবর-বার্ত্তা না হয় নে’ওয়াই যেত। লাথি মেরে যদি পায়ে ধরতেই চাও, বলোই না

হয় খুঁজেই দেখি একবার তাঁকে? হা হা হা!—আচ্ছা সবুদি! কি মজাই তা'হলে হয় কিন্তু?"

সর্ব্বাণী হাত দিয়া ডালিকে একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া নির্ব্বিকার নির্লিপ্ততার সহিত গম্ভীর গলায় উত্তর করিল, "কোন মজাই হয় না'রে ডালি! খবর তো সে বেচারী দিয়েই ছিল। আমায় নিতে অনিচ্ছাও তার নাকি এততেও ছিল না, আমিই তো তাকে ফিরিয়ে নিতে মত করি নি।"

ডালির হাসি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল, অকস্মাৎ সে গম্ভীর হইয়া গিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া ফেলিল, "বাবা! তুমি কি নিষ্ঠুরা নারী! অগ্নিশুদ্ধি করেও বেচারাকে জাতে তুলতে পারলে না? সা' শ্রীরামচন্দ্র! আচ্ছা ভাই! সে বুঝি দেখতে ভাল ছিলনা?"

সর্ব্বাণী নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল, "তোর যেমন কথা! আমি কি তাকে দেখেছিলুম নাকি?"

ডালি সবিস্ময়ে চোখ টানিয়া বলিয়া উঠিল,—"দেখ নি? ওমা! মোট্টে দেখ নি? সে কি ভাই? সত্যি? বর তোমায় দেখতে আসে নি?"

সর্ব্বাণী হাসিয়া ফেলিল, সহাস্তে বলিল, "আমার কি তোর মতন 'কোর্ট-শিপ' করে বিয়ে হচ্ছিল?"

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী যে এ-বাড়ীর গোপনে ঈপ্সিত জামাতা, সে কথাটা প্রকাশ্য হইয়া না উঠিলেও নেহাৎ অপ্রকাশ্যও তো ছিল না। ডালি ঈষৎ রাঙ্গিয়া উঠিলেও সে লজ্জা সে স্বীকার করিল না। মিথ্যা সহানুভূতি দেখাইয়া সোদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"আহা গো তাই বলো? এইবারে বুঝেছি! তার জন্যেই মেয়ের সে বরকে মনে ধরে নি। পরম বিদুষী কন্যাটির ওরকম সেকেলে বিয়ে মামাবাবুই বা কেমন করে দিচ্ছিলেন?

আমার সদাশিব মামাটির ঘটে একটুও যদি সাংসারিক বুদ্ধি আছে। আচ্ছা ভাই! তারপরও তো অনেক দিন হয়ে গেল, এর ভেতরও কি মনের মতন তোর কাউকে দেখতে পেলি নে'? আচ্ছা, তোর কি রকম পছন্দ বলত?—পেশোয়ারী, কাবুলী বা কাশ্মীরীদের মতন গোলাপ-রং, ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের পাট্টা, সাড়ে ছ'ফুট পৌনে সাত ফুট লম্বা, অ্যাথ্‌লেট্‌? না ননীর পুতুল ভালবাসিস্‌? নব-কার্ত্তিকের মতন চেহারা কোঁকড়ানো চুলে সোজা সিঁথি, গায়ের রং হত্তেল ফলানো, গোঁফের রেখা দিয়েই মুছে গেছে ক্ষুরের ধারে, গলাটি খাসা মেয়েলী মেয়েলী—"

ডালি আরও হয়ত অনেক ধাঁচের বরের নমুনা দেখাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু সর্ব্বাণী চোখ পাকাইয়া তাহাকে একটা তাড়া দিল, "দেখ্‌ ডালি! বেশী ফাজলামী করিস নে', বড় বোন হই না?—" তারপর হাসিয়া বলিল, "নিজের চরকায় তেল দি'গে যা'। চল্‌ চুলটা বেঁধে দিইগে'। সুকুমারদা সকালে বল্‌ছিলেন, আজ হয়ত সন্ধ্যার সময় তাঁর দু'জন বন্ধু চা খেতে আসবেন। যদিও কোন প্রশ্ন করি নি,—তথাপি জানা আছে, ঐ দুজনের মধ্যের একজন আমাদের মিঃ জি. পি. বোনার্জ্জী!"

ডালি সর্ব্বাণীকে অনুসরণ করিতে করিতে মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিল, "ঈঃ। মেয়ের মুখখানিতে বোনার্জ্জীর নাম সর্ব্বদা লেগেই আছে, বোনার্জ্জী শুন্‌তে পেলে কৃতার্থ হয়ে যাবে রে, বলিসতো আমি তাঁকে না হয় জানিয়েই দোব'খন।"

পর্দ্দা সরাইয়া পাশের কাপড়-চোপড় পরার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া ড্রেসিং টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া সর্ব্বাণী তার কথার জবাবে বলিল, "প্রাণ ধরে যদি পারিস তো দিয়েই দিস।"

রাজপুরের পথের দু'ধারে বরাসফুলের (রডো ডেন ড্রন) গাছ গাঢ় গোলাপী ফুলের থোকায় নিজেদের খচিত ও পথ-ঘাট আলোকমণ্ডিত করিয়াছে। সরলোন্নত বাঁশঝাড় গগনস্পর্শের স্পর্দ্ধায় হিমস্পর্শ শীতল বাতাসে বংশীধ্বনির মতই মর্ম্মর রব করিতেছিল। অসংখ্য ইউক্যালিপ-টাসের পত্র নিঃসারিত সতেজ সৌরভে স্বাস্থ্যপূর্ণ ও সানন্দ পক্ষীরবে চারিদিক মুখর রহিয়াছে। সর্ব্বাণীরা রাজপুর হইতে মুসুরীপাহাড় বেড়াইতে গিয়াছিল। হপ্তা দুই সেখানে থাকিয়া আজ বাড়ী ফিরিতেছে। খানিক মোটরে আসার পর ডালি বলিয়া বসিল, "সবুদি! এসো ভাই আমরা হেঁটে যাই, মোটে মাইল দুই তো বাকি।"

ডালি পশ্চিমের মেয়ে, স্বাস্থ্য ভাল, হাঁটিতে মজবুত কিন্তু সর্ব্বাণী পথ হাঁটায় অভ্যস্ত নয়, তথাপি ডালির পাল্লায় পড়িয়া এখানে তাহাকেও খানিকটা হাঁটার অভ্যাস করিতেই হইয়াছে। ডাণ্ডিতে পাহাড় হইতে নামার সময়ে ডালির হাঙ্গামায় তাকে খানিকটা হাঁটিয়া উৎরাই নামিতে হওয়ায় তার পায়ে ব্যথা হইয়াছিল। চড়াই চড়া কষ্টকর হইলেও উৎরাই নামায় পা বেশী ব্যথা করে। আবার মাইল দুই পথ হাঁটিতে তার আদৌ আগ্রহ ছিল না, কিন্তু না থাকিলেই বা শোনে কে? ডালি তাকে নামাইয়া ছাড়িল। সর্ব্বাণীর পিসিমার ইহাতে যে অনুমোদন ছিল তা' নয়। তিনি আপত্তিও তুলিয়াছিলেন; কিন্তু এ মেয়ে তো কথা শোনার মেয়ে নয়! সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "সঙ্গে দাদাকে তো নিচ্ছিই,—তোমার এতে আপত্তির কি আছে? মেয়ে-ধরায় তো আর ধরতে পারবে না যে, তুমি ভয় পাচ্চো। আর দিনের আলোয় রাস্তার ওপোর বিরাট ডাকাতের দলও ঘাপ্‌টি মেরে বসে নেই যে, আমাদের কাণ ছিঁড়ে সোনার ঝুমকো চারটে ছিনিয়ে নেবে। তবে?"

গোলাপসুন্দরী অপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "তা' না হয় কোন ভয়ই নেই মানলুম,—তোমাদেরই বা অনর্থক রাস্তায় দেরি করে কি লাভটা হবে তাই বল ত' বাছা? এত বেড়িয়েও বেড়ানোর সাধ আর মিটলোনা?"

ডালি উত্তর করিল, "ঐ মুসুরী পাহাড়টিই এত বড় পৃথিবীর প্রতিভূ নয়, যে, ঐটুকু বেড়িযেই আমাদের জন্মের সাধ মিটে যাবে। আচ্ছা মা! তুমি আমাদের কি অপদার্থই ভাবো বল ত?"

মাকে বাক্যবিমুখী দেখিয়া নিজেকে বিজয়িনী বোধে হাঁকিল, "ড্রাইভার! গাড়ী থামাও।"

সামনের আসন হইতে সুকুমার মুখ ফিরাইয়া ভ্রূভঙ্গী করিল, "কা'র মাফ্‌লার উড়ে পড়লো?—কা'র হ্যান্‌কারচিফ?"

গতিবেগে-স্পন্দমান গাড়ী হইতে তড়াক্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া ডালি উচ্চহাসি হাসিল, "তোমার! শীগ্‌গির নেমে এসো না সবুদি! বাঃ মজা করে বসে রইলে যে? মা না বললে নামবে না? সুশীলা বালিকা!—মা! ওমা গো! শুন্‌ছো,—শীগ্‌গির ওকে নামতে বলে দাও, কেন মিথ্যে মামাবাবুর চা খাবার দেরি করে দিচ্চো, আর ড্রাইভার বেচারার তেল পোড়াচ্চো, শীগ্‌গির বলে ফেলো।"

গোলাপসুন্দরী মনের মধ্যে পছন্দ না করিলেও মেযের কাছে পার পাওযা শক্ত জানিয়াই নীরব ছিলেন, শুষ্কভাবে জবাব দিলেন, "ও তো তোমার মতন গেছো ধিঙ্গী নয়! তা' যাও মা, যে একটা কাঠ-গোঁয়ারের পাল্লায় পড়েছ, খানিক হায়রাণ হয়েই এসো গিয়ে।"

সর্ব্বাণী গায়ের শাল প্রভৃতি সামলাইয়া লইযা মোটর হইতে নামিতে নামিতে অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, "ওই করেই তো তোমরা আমাদের আস্কারা দিয়ে দিয়ে এই রকম তৈরি করেছ!"

এদিকে ডালিও মায়ের তিরস্কারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতে-

ছিল,—"আহা গো!—তাই না? ভাইঝিটি ওঁর মোটেই ধিঙ্গী ন'ন, যত অপরাধ ভাঙ্গাকুলো এই আমারই!"

গোলাপসুন্দরী দু'জনকার দু'রকম মন্তব্য শুনিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের কাছে হার স্বীকার করিলেন না। গলার স্বরে ঝাঁজ আনিয়া ধমক দিলেন,—"চুপ করে থাক ডালি! সকল কথায় কথা কওয়া কি রে? আজ-কালকার মেয়েগুলো হলো কি!"

ডালি সর্ব্বাণীর গা টিপিয়া কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "জান্‌লে সবুদি! এক সময় মায়েদের মায়েরাও মায়েদের ঠিক ওই কথা বলেই বকেছে। মায়েরাও তো একদিন আজ-কালকার মেয়ে ছিল, না তো কি বুড়ো হয়েই জন্মেছে?"

বলিতে বলিতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন ড্রাইভার মোটরে ষ্টার্ট দিয়াছে, গভীর তর্জ্জনে অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্তিতে বিরক্ত যানখানি দ্রুত ধাবনের আগ্রহে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, ডালির সেই তরঙ্গময় কৌতুকহাস্য তারই উচ্চ কলরবে চাপা পড়িয়া গেল নতুবা গুরুজনের কথাতে উপহাস্য করার জন্য তাকে আরও একবার ভৎর্সিত হইতে হইত।—অথচ ভৎর্সিত হইলেই কি স্বভাব যায়? এই হাস্য ও কৌতুকই যে তার প্রাণের উৎস,—তার জীবনী রস।

একরাশ ধূলি উড়াইয়া ঘোর রবে মোটরখানা ছুটিয়া চলিয়া গেল। সর্ব্বাণী উড়িয়া আসা ধূলার ঝাপ্টা হইতে চোখ মুখ বাঁচাইবার জন্য গায়ে জড়ান শালে মুখ ঢাকা দিয়াছে দেখিয়া সুকুমার চেঁচাইয়া বলিল, "নাও, সাম্‌লাও এখন ঠ্যালা! তোমারই বা এমন দুর্ম্মতি কেন হলো সর্ব্বাণি? তুমি তো না নামলেই পারতে, অনর্থক ধূলো খেয়ে এ দুর্গতিও ঘটতো না,—তোফা বাড়ী গিয়ে আত্মারামের তৈরী গরম গরম চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসে যেতে।"

সর্ব্বাণী ততক্ষণে মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তার কথা কহিবার পূর্ব্বেই ডালি ফণা তুলিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, "আচ্ছা দাদা! তুমি তো বেশ মজার লোক! একেই সবুদি মায়ের সো' হবে বলে শিষ্ট শান্ত হয়ে থাকতেই ভালবাসে, তার উপর তুমিও এলে ওকে নীতিপাঠ পড়াতে? আমার দিক্ হয়ে যদি একজনাও একটা কথা বলে।"

সুকুমার ওদের সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার হয়ে একজন একটা কথাই নয়, অনেক কথাই কইবে, দাঁড়াও না আর তো বেশী দেরিও নেই।"

কথাটা গাম্ভীর্য্যপূর্ণও বটে, সংক্ষিপ্তও খুব—কিন্তু ছোট্ট একটি সূত্রেরই মত নিহিতার্থক,—ডালির অর্থ বোধে বাধিল না, সে সলজ্জ কোপে ভাইকে একটা কীল দেখাইল, সবেগে বলিয়া উঠিল,—"যাও! যত সব রাবিস্!"

তারপর সাম্‌লাইয়া লইয়া পুনশ্চ যোগ করিল,—"জানো সবুদি! দাদার আজকাল নিজের একজনের জন্যে সর্ব্বদাই মন ছট্‌ফট্ করছে কি না, তাই ও ভাবে সব্বাইকারই যেন ওর ছোঁয়াচ লেগেছে!—মা বাবার কি রকম যে অন্যায়,—কেনই যে আমাদের বউদি ঠাকরুণকে আনতে এত দেরি করছেন। আচ্ছা! ভেবে ভেবে ছেলেটার মাথা বিগড়ে গেলে তখন কি করবেন বল ত?"

সুকুমার গম্ভীর-চালে পা চালাইতে চালাইতে গায়ে-পড়া উত্তর করিল, "আর বছর রাঁচীর 'কাঁকে'তে যেরকম সুবন্দোবস্ত দেখে এসেছি, কারু কিচ্ছু করবার দরকার হবেনা। কিন্তু সর্ব্বাণি! তুমি যেমন কবি-প্রকৃতির লোক, হয় তো বা মর্ত্ত্য জীবদের চাল-চলন তোমার চক্ষে ঠেক্‌তেই পায় না,—আমাদের ডালিয়া রাণীর বিয়ের ফুল যে এই 'সীজ্‌নে'ই ফুটে উঠ্‌ছে তার খবর রাখছো তো? ওর তথা-কথিত ফুলটিও

বোধ করি বা ডালিয়াই নৈলে শীতের মরশুমেই বা সেটি ফুটতে বসলো কেন ?"

শুনিয়া সর্ব্বাণীর চিত্ত আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল। পিসিমাকে এর বিবাহের জন্য একান্ত চিন্তিত দেখিয়া তারও অনেক সময় মনে হইয়াছে বর যখন উপস্থিত তখন বিবাহ হইয়া গেলেই তো চুকিয়া যায়! নিজের কাণ্ডে তার পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া মেয়ের বিয়ে যে কি ভীষণ বস্তু তার কতকটা আন্দাজ তো তার হইয়াছে। সাগ্রহে তাই সে বলিয়া উঠিল,—"পাকা কথা হয়ে গেছে বুঝি? পাকা দেখা কবে হবে সুকুমারদা' ?"

সুকুমার কহিল, "কথা কইলে কে' যে পাকা হবে? কথা তো ও নিজেই কইবে। আর 'পাকা'? সে কি কখন হয় নাকি? এমন কি আধখানা বিয়ে হলেও তো শুনেছি সেও নাকি আবার কেঁচে যেতে পারে। যায় না সর্ব্বাণী ?"

সর্ব্বাণী তার প্রতি এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে মনের মধ্যে অসন্তুষ্ট হইলেও মনোভাব অপ্রকাশ্য রাখিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিল, "না না, সত্যি বলো না সুকুমারদা! ডালির বিয়ে স্থির হলো? কাছেই যখন বর রয়েছে মিথ্যে মিথ্যে দেরি করে তবে লাভ কি? আমরা থাকতে থাকতে বিয়েটা হয়ে গেলেই তো হয়।"

সুকুমার কহিল, "সেই জন্যেই তো হচ্চে না।"

"যথা ?—"

"হলেই তো তোমরা থাকবে না!"

সর্ব্বাণী হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার 'লজিক' জোরালো বটে! কি বলিস্ ভাই ডালি! আমাদের ধরে রাখবার জন্যে তুই বিয়ে বন্ধ করে বসে থাকবি নাকি? না বাপু, শেষকালে কি তোর

অভিশাপে পড়ে যাবো। আমি বাড়ী গিয়েই দেখনা পিসিমাকে খুব তাড়া লাগাচ্চি।"

কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া পথ চলিতে চলিতে তাহাঁরা অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিল। সূর্য্যাস্ত না হইলেও সমুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তরালে দিবসান্ত তপনের ক্লান্তমূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়াছে। আকাশের গায়ে তার সোনালী রেখাগুলিও ক্রমশঃ নানা বর্ণ ছড়াইতে ছড়াইতে মিলাইযা আসিতেছিল। কেবল 'রাজপুব রোডে'র দু'ধারে উচ্চশীর্ষ ইউক্যালিপ-টাস শ্রেণীর মন্দ পবনে আন্দোলিত মাথাব হিরণ্ময় মুকুটের মত অস্তসূর্য্যের স্বর্ণাভ লোহিতচ্ছটা রাজপুর-রাজপথের নাম সার্থক করিতেছিল। অদূরে সুনীল বনানী পরিবেষ্টিত উচ্চাবচ গিরিমালার অঙ্গে উহা নিকষের গায়ে স্বর্ণরেখার মত ঝিলিমিলি করিতেছিল। আসন্ন সন্ধ্যার বিচিত্র সুর সেই নির্জ্জন প্রদেশের দিকে দিকে একটি অপরিচ্ছেদ্য মৃদু রাগিণীতে রণিত হইতেছে। সেই সঙ্গে পরিচিত ঝিল্লীরব সংমিশ্রিত হইয়া যেন একটি অভিনব ঐক্যতানেরও সৃষ্টি করিয়াছে।

সুকুমার এদিকে তটস্থ হইয়া পড়িয়া যেন কতই আতঙ্কে শিহরিয়া কাণ্ডটিও করতে যেও না, দোহাই তোমার! তুমি যেমনি যেমনি তোমার পিসিমাকে তাড়া লাগাবে,—তেম্‌নি তেম্‌নি তিনি সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে নে'বেন আমার এই ঘাড়টি দিযে।"—এই বলিয়া সে সশব্দে নিজের স্কন্ধের উপর একটি চাপড় মারিল।

সর্ব্বাণী সকৌতুকে হাসিতে লাগিল, হাসিয়া বলিল, "ভালই তো হবে সুকুমারদা! তোমারও তা' হলে একটু একটু চাড় হবে, বন্ধুটিকে—"

ডালি এতক্ষণ ইহাদের সান্নিধ্য রাগ করিয়া পরিহার পূর্ব্বক জোর পায়ে অগ্রগামী হইয়াছিল; কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা তার পোষাইল না, কিছু দূর আসিয়া একটা গোলাপী ফুলে ভরা বরাস গাছের তলায় দাঁড়াইয়া

উচ্চশাখার ফুলের দিকে লোলুপ চক্ষে সে তাকাইয়া রহিল। ইহারা গল্প করিতে করিতে কাছে আসিতেই ঝোঁপে লুকানো বাঘের মতই সে তাদের মধ্যে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

"এই জন্যেই বুঝি মা'র বকুনি খেয়ে আমি তোমাদের মোটর থেকে নামাতে গেছলুম? না বাপু! এর চাইতে তোমরা গাড়ী চড়ে বাড়ী ফিরে গেলেই ভাল করতে। আর কক্ষণো যদি আমি তোমাদের জন্যে কিচ্ছু করি।"

ডালি অন্ধকার মুখ করিয়া সবেগে মুখ ফিরাইল।

সুকুমার বলিল, "সেই জন্যেই তো আমরা তোকে আশার বাণী শোনাচ্চি রে! আশা! আশা! জানিস্ যত রাজ্যের দেশ-বিদেশের কবি জন্মেছিল সব্বাই মিলে বাস্তবের চাইতে আশার কথাই সাত দু'গুণে চৌদ্দগুণ ক'রে করে গেয়ে গেছে! আহা রে!—গেছেই বা বল্‌ছি কেন? কবিরা কি যায়? রক্তবীজের মত এক যায় আর তাব জায়গায় শতকরা নিরানব্বই পারসেণ্ট হিসেবে বাড়ে। সত্যি বল্‌ছি,—আমি এর একশোটা নজীর অন্ততঃ তোকে দিতে পারি। অবশ্য যদি অনুমতি দিস্। আচ্ছা এ বিষয়ে টেনিসন কি বলেছেন আগে ভাই সাবহিত হয়ে শোন,—তারপর বাংলা এবং সংস্কৃত, আর প্রয়োজন বোধ করলে উর্দ্দু ফার্সি ও পরে পরে শোনাবো নতুবা বক্তব্যটি প্রাদেশিক হয়ে পড়বে।—"

ডালি ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া বলিল, "নতুবাই থেকে যাক্ এবং টেনিসন ও তোমার ঐ একশোটা নজীর তুমি তোমার নিজের জন্যে তুলে রাখো, আমায় বরং তার বদলে একটা বড় থোকার বরাস ফুল পেড়ে দাও দেখি।"

দু'জনেই তখন অদূরবর্ত্তী গাছের দিকে চাহিল। সর্ব্বাণীর মুখ দিয়া বিস্ময় প্রশংসাসূচক ধ্বনি নির্গত হইল,—"বাঃ!"

ডালি সমুৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সুকুমারের কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিল,—"দেখছো না! শুধু আমি নয়,—আমি নয়,—সবুদি'রও সখ হয়েছে, দাও না দুটো থোকা পেড়ে। সবুদি! তুমিও একটু বলো না ভাই, দেখছো তো কত বড় বড় ফুল, যেন এক একটা তোড়া বাঁধা রয়েছে!"

সর্ব্বাণী প্রশংসা-স্মিতমুখে সুকুমারের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বড় সুন্দর ফুল, না?"

সাগ্রহে সুকুমার জামার আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে গাছের দিকে অগ্রসর হইয়া সহাস্যমুখে সর্ব্বাণীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তোমার বুঝি একটা চাই সর্ব্বাণি?"

উত্তর সর্ব্বাণী দিল না, সুকুমারও তা' আশা করে নাই, তার অধর-প্রান্তের হাস্যাভাসটুকুই যে এ বিষয়ে পর্য্যাপ্ত! সুকুমার অগ্রসর হইল।

পশ্চিমের আকাশ হইতে ক্ষীণতর অথচ কমলালেবুর রংয়ের সঙ্গে গোলাপী দীপ্তি আসিয়া ঝাড় বাঁধা অসংখ্য গোলাপ ফুলের আভাসযুক্ত পুষ্পগুচ্ছের বর্ণ সুষমা যেমন বর্দ্ধিততর করিতেছিল, সেই সঙ্গে ঈষৎ উন্নমিতাননা সপ্রশংসমুখী আত্মভোলা সর্ব্বাণীর সৌকুমার্য্যপূর্ণ পরিপুষ্ট মুখের উপর পড়িয়া তাহারও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছিল। ফুলের গোছাটা হাতে দিতে আসিয়া সহসা সুকুমারের চোখের দৃষ্টি প্রশংসায় ভরিয়া উঠিল। প্রথম দেখার দিনে ডালি ঠিকই বলিয়াছিল, তার নজর আছে!—সর্ব্বাণীর চেহারাটা বাস্তবিকই কবিত্বপূর্ণ। গভীর নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ, ঠিক তার তলাতেই মসৃণ চন্দ্রার্দ্ধবৎ ললাটপট মনে হয় যেন মৃদু তরঙ্গায়িত গভীর কালো নদীর জলে চাঁদের ছায়াটুকু ভাসিয়া আছে,—আর কি গভীর কালো ও অতলস্পর্শী তার ঐ দু'টি চোখ! ওদের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলে মনে হইবে নিজে সুদ্ধ যেন ওর মধ্যে তলাইয়া যাইতেছি! সুকুমার বিব্রতভাবে নিজের

দৃষ্টি নত করিয়া লইয়া হাত বাড়াইয়া ফুলের গুচ্ছটা তাব দিকে বাড়াইয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "নাও সর্ব্বাণি!"

উদ্ধত উপহার সাগ্রহ-স্মিত মুখে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাণী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—'থ্যাঙ্কস্' দিতে হবে না কি সুকুমারদা' ?"

ডালি ছুটিয়া আসিয়া সাশ্চর্য্য বিরসকণ্ঠে তীব্র চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও দাদা!—কি ছেলে মা! আমার ফুল কই? বাঃ রে! আমিই না বল্লুম, আর আমারই ভাগ্যে জুটলো না? দাদা!—"

সুকুমার তার দিকে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয সতেজে দেখাইয়া দিয়া সর্ব্বাণীর কথার জবাব দিল, "সে তোমার খুশী আর আমার ববাত! তবে ফুলটা পাড়তে একটা কাঠ-পিঁপ্ড়ে যে কাম্ড়ে দিয়েছে এটা নির্ঘাত সত্য এবং সেই খবরটুকু জেনে রেখো।"

সর্ব্বাণী ব্যস্ত হইযা বলিল, "সত্যি!—কোথায?" বলিয়া সে দংশিত স্থান দেখার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। ডালি তাকে একটা ঠেলা দিয়া বিকৃত মুখে বলিয়া বসিল, "থাক্ থাক্, অত আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই! কামড়াবে না ওকে কাঠপিঁপড়ে? গাছের ডাল মাথায় ভেঙ্গে যে পড়ে নি, সেই তো ওব ভাগ্যি! আমার সঙ্গে কি লাগাটাই না লেগেছে,—বাব্বাঃ! মুসুরীর 'গাফওয়ে' হোটেল থেকে সুরু করে একটানা চালিয়েই চলেছে, চালিয়েই চলেছে।"

পিপীলিকাদংষ্ট্র স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিমর্ষ করুণ মুখে সুকুমার সর্ব্বাণীকে মধ্যস্থ রাখিয়া কহিতে লাগিল, "ও যে আমায় অত করে গাল দিচ্চে, সর্ব্বাণি! তুমি জিজ্ঞেস কর তো ওকে, আমি কথা কইলে কি না'কি কিই দোষ বেরোবে, তাই কথা আমি কইবো না, কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করলে তো আর দোষ নেই? ও বলুক না ওর জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত কবে আমি ওর সঙ্গে লাগি নি, যে, আজই আমাকে ও নতুন করে

ওর সঙ্গে লাগতে দেখলে,—আর অমন নির্ঘাত অভিশাপটা দিলে? ঐ অত মোটা ডাল মাথায় ভেঙ্গে পড়্‌লে মাথার কি হয়, সে কি ও জানে না বলতে চায়? ও তা'হলে নির্ঘাত চায় যে আমার মাথাটা ভেঙ্গে আমি মরে যাই—"

"দাদা! কি যে তুমি যাচ্ছেতাই কথা সব বলো! না ভাই!— না ভাই! লক্ষ্মীটি! দুটি পায়ে পড়ি, থামো তুমি,—আমি কি তাই বলেছি? কেন তুমি আমার জন্যেও একটা ঝাড় পাড়লে না?"

সুকুমার কহিল, "পিঁপড়ে কামড়ালো যে, তা'ছাড়া—"

"চুপ করলে কেন?"

"নাঃ চুপ কর্‌বো কেন? ভাবছিলুম বলবো কি না,—যা তুই ছিঁচ-কাঁদুনী! নাঃ, না বল্‌বোই বা কেন? সত্যং ব্রূয়াৎ, তোকে দেবে—ডালি! ডালি! চেয়ে দেখ্‌, যা' বলতে যাচ্ছিলুম সত্যি কি না? হুঁ, হুঁ, গুণ্‌তে শিখেছি না চেরোর বই পড়ে। ঐ দেখ মিষ্টার জি. পি. বোনার্জ্জী স্বয়ং সশরীরে বহাল তবিয়তে তোমার জন্যে বিধি-নির্দ্দিষ্ট 'ডালি' হাতে নিয়ে সহসা রঙ্গভূমে উপস্থিত। কি হে বোনার্জ্জী! পথ ভুলে?— না পথ চিনে?"

বাস্তবিকই অনতিদূরের একটা এই রকমই রক্তাভ পুষ্পখচিত বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া সুকুমারের বন্ধু মিঃ বোনার্জ্জী এমনই একটা পুষ্পগুচ্ছ সংগ্রহ করিতেছিল, সে ইহাদের দেখিতে পাইয়াছিল কি না বলা যায় না, প্রকাশ্যে সাক্ষাৎটা দৈবাধীন বলিয়াই বোধ হইল।

"এ কি! মুসুরী থেকে ফেরা হ'লো কখন? সকালে খবর নিয়েছিলুম, চাকরটা বল্‌লে, ফের্ব্বার খবর কই আসে নি।"

সুকুমার কহিল, "ফেরা হলো আবার কখন? এই তো আমরা সবে মাত্তর ফির্‌চি, ওঁরা মোটরে গেছেন। কেন? ওঁদের পথে দেখ নি?"

ব্যানার্জ্জী কহিল, "উঁহু—আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক আনন্দ ভবনে ছিলাম, এই কতকক্ষণ মাত্র ওখান থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়েছি—"

"তোমার হাতের এ ফুলের ঝাড়টার প্রতি কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষরূপে লোভ লেগেছে বলে কি তোমার অনুমাত্রও সন্দেহ হচ্ছে না?"

মিষ্টার জি. পি. ব্যানার্জ্জী ভদ্রতার খাতিরে তার যে চোখের দৃষ্টিকে অন্যত্র ফিরাইয়া রাখিয়াছিল, তাদের টানিয়া আনিয়া একবার করিয়া তার সম্মুখবর্ত্তিনী দুই জন মহিলার প্রতিই তাহা সন্নিবিষ্ট করিল এবং পরক্ষণেই সম্ভ্রমপূর্ণ ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ফুলটি ডালির সাম্‌নে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "অনুগ্রহ করে নিলে বাধিত হবো।"

"ধন্যবাদ!"—বলিয়া ডালি ফুল লইল। তার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, হাত বাড়াইতে গিয়া হাতটাও কাঁপিতে লাগিল,—এত সুস্পষ্ট সে কম্পন যে মিঃ ব্যানার্জ্জী ঈষৎ বিস্ময়ভবেই ফুল দিবার সময় তার মুখের দিকে বারেক চাহিয়া দেখিল। প্রথমটা পথশ্রমের কম্পন ভাবিয়াছিল কিন্তু ডালির মুখে চকিতদৃষ্টি বুলাইয়া লইতে সহসা যেন একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়া গেল। সুকুমারের প্রস্তাব সে পূর্ব্বেই পাইয়াছে, সে আবেদনে সে বিশেষ কাণ দেয় নাই, কিন্তু আজ এই গোধূলির স্নিগ্ধালোকে চঞ্চলা তরুণীর সলজ্জ স্মিত মুখে যেন তাহারই পুনরুক্তি সে শুনিতে পাইল। মুখের ভাষা যদিও নীরব, তথাপি সেই অব্যক্ত কণ্ঠ এক মুহূর্ত্তে যেন অনেক কথাই ব্যক্ত করিল। বিমনা হইয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল, যদি তাই-ই হয়, ইহাতে কি অধিকার আছে তার?—

সুকুমার তাকে ক্ষ্যাপাইবার সুযোগটাকে সার্থক করিয়া লইয়া বলিতেছিল, "আমি তোকে কেন যে ফুল পেড়ে দিই নি, দেখ্‌লি তো ডল? তুই কিন্তু নিশ্চয় মনে করেছিলি তোকে আমি বুঝি দুচক্ষে'পড়ে

দেখতে পারি নে' বলেই দিই নি, না? বল সত্যি করে গণৎকার হয়েচি কি হই নি? হুঁ! হুঁ! তবু জ্যোতিষ-শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়ি নি এখনও একটি বর্ণও,—শুধু ঐ চেরো না কেরোর নামই কানে শুনে রেখেছি।"

মুখরা চপলা ডালি ভ্রূ বাঁকাইয়া অপাঙ্গে চাহিয়া শুধু প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিল। কি জানি কি জন্য এই লোকটির সামনে ঝগড়া করা তার আসে না। আর সেই জন্যই সুকুমারের পক্ষে এ যেন হইয়াছে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে শিখণ্ডী।

১৩

সেদিন সন্ধ্যা-ধূসর প্রকৃতির মধ্যে অলস চরণে চলিতে চলিতে সর্ব্বাণীরা ও তাদের পথে-পাওয়া সাথী চারিজনে গল্প করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলে, বিলম্বে ফেরার জন্য গোলাপসুন্দরীর অনুযোগপূর্ণ উদ্যত রসনা সহসাই নীরব হইয়া গেল। তাদের সঙ্গে যে আসিল তাঁর মন নিতান্ত ঔৎসুক্যসহকারে তাহাকেই প্রত্যাশা করিতেছিল। ডালি যে নেহাৎ ধিঙ্গী হইয়া উঠিতেছে, তার বিবাহের বিলম্ব করা যে একান্তই অন্যায়—একথা তিনি সারা পথ এবং বাড়ী ফিরিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত যুক্তি সহকারে নির্ব্বাক শ্রোতা দুইটিকে অনর্গল শুনাইয়া আসিয়াছেন। একটিবার অভয়াচরণ কে জানে কেমন করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "কেন অত রাগ করছো, মেয়েটা নেহাৎ ছেলেমানুষ আছে এখনও।" তারপর আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। যে বাপ নিজের মেয়ের বয়সের হিসাব রাখে না, তার মেয়ের ভবিষ্যৎ কি-ই না হইতে পারে? এই দুশ্চিন্তায় গোলাপসুন্দরীর অক্লান্ত রসনা নির্ব্বিবাদে আপশোস বর্ষণ করিয়া চলিল। অভয়াচরণ নির্নিমেষ নেত্রে হিমালয়ের

ধূমল গিরিরাজী এবং বাড়ী ফিরিয়া 'পাইওনিয়ারে' মারের খবরও অত
বামহস্তের অঙ্গুলিদ্বারা নিজের ধবল চামরের মতই শ্বেত শ্মশ্রূ সাবধানতা
মৃদু আন্দোলিত করিতে থাকিলেন। পত্নীর রসনা যখন সপ্ন গভীর
বুদ্ধিবিহীন পতির উদ্দেশ্যে অনুযোগ বর্ষণ করে, পতির তখন প্রতি।
কিছুই না থাকায নিজের শ্মশ্রুজালের প্রতি মনোযোগী হওয়া ব্যতীত
উপায়ান্তর কি থাকে? এই পথই নিরাপদের পথ। কিন্তু সুরঞ্জনের
পক্ষে একইরূপে নির্ব্বিকার থাকা কঠিন হইতেছিল। বাহ্যতঃ তাঁহাকে
উদাসীন দেখাইলেও ছোট বোনের কথার এক একটা তীক্ষ্ণ হুল তাঁর মনকে
নির্ম্মমভাবেই যে বিঁধিতে লাগিল। মনে তাঁর যে পুবাতন ক্ষত রহিয়াছে
যে অঙ্গেই আঘাত লাগুক না কেন সেইখানে গিয়াই তো তা' বাজে।
গোলাপসুন্দরীর মুখে আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব তীব্র মতবাদ
বাহির হয়, তার ভিতর সর্ব্বাণীর প্রতিও পূর্ণ ইঙ্গিত আছে বলিয়াই তাঁর
মনে হইবা মন ব্যথিত হইয়াও উঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার তো কোনই
উপায় নাই,—এ ব্যথা যে তাঁর ভাগ্যে অপ্রতিবিধেয়। সামাজিক
নরনারীব চক্ষে সর্ব্বাণীর অপরাধ বাস্তবিকই তো আর তুচ্ছ নয! তার
মনের খবর কে' জানে, আর জানিলেই বা তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ
করিবে এ সংসারে কয়জনা? যারা তাকে চেনে না, তারা ত' তাকে
নিবিড় করিযাহ কালি মাখায়, যারা তাকে চেনে, তারা উদ্দাম-
আধুনিকা বলিযা নিন্দা ছাড়া আর কি করিতে পারে? সুরঞ্জন নিজেই
কি তার কাজটাকে মনের মধ্যে খুবই সমর্থন করিতে পারিয়াছেন?
অথচ তাই বলিয়া তাকে দোষী করিতে গেলেও যে সারা চিত্ত ব্যথায়
টনটন করিয়া উঠে।

ছেলেমেয়েরা বাড়ী ফিরিয়াছে জানিয়া মনের মধ্যে চঞ্চল হইয়া
উঠিলেন। গোলাপ হয়ত তাদের ভৎ'সনা করিতে থাকিবেন।

দেখতে পারি নে' কঠিন কথা বলিয়া বসেন প্রতিবাদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি হই নি? কিন্তু অপ্রতিবাদে তাহাকে তিরস্কৃত হইতে দেখাও তেমনই বর্ণও,— শুধু ...কর। তাই সরিয়া পড়াই সমীচীন বোধ হইল।

মুখর 'রোজভিলা' একতলা বাড়ী হইলেও উপরতলায় প্রশস্ত একখানি কড়ি রোদ-পিঠে সুন্দর ঘর ও একটি বাথরুম ছিল। নিরিবিলি হইবে বলিয়া গোলাপসুন্দরী সুরঞ্জনের সেই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকাল সন্ধ্যায় খোলা ছাদে পায়চারী করিতে করিতে কখনও নীলকান্ত মণিপ্রভ আকাশে কখনও কাজল-কালো পর্ব্বতরাজির পিছন হইতে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত দেখা,—গভীর রাত্রে ইহারই জানালা দিয়া মুসুরী পাহাড়ের অসংখ্য নক্ষত্রপ্রভ আলোকরাজির পরিদর্শন, উন্মুক্ত প্রকৃতির পাশাপাশি নাগরিক এবং আরণ্যমূর্ত্তির বিচিত্র অপরূপতা দর্শন করিয়া তাঁর আশাহত ব্যথাকাতর চিত্ত ঈষৎ শান্তির স্পর্শ লাভ করিত। দূর দূরান্তর হইতে পর্ব্বত কান্তার-বিহারী, ফল-পুষ্পে বিচরণশীল স্বাস্থ্যপূর্ণ মন্দানিল তাঁর অন্তর্দ্দাহপূর্ণ ললাট সস্নেহে স্পর্শ করিত।—জীবনের তাপদাহ মায়ের হাতের মতই সে যেন কিছুটা মুছিয়া লইত। অবসাদময় জীবনের একটু বা প্রতিক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডল তাঁর ঈষৎ সুস্থ হইয়া উঠিত। দিবসেরও অধিকাংশ কাল সুরঞ্জন এই ঘরেই কাটাইতেন। জানালা-গুলি খুলিয়া দিলে প্রখর রৌদ্রালোকে ঘরখানি প্রথম শীতের শীতলতা হইতেও যথেষ্ট উপভোগ্য হয়। অভয়াচরণও স্ত্রীর এলাকার বা তাঁর নাগালের বাহিরে এই স্থানটাকে কিছুটা নিরাপদ বোধে খবরের কাগজ হাতে সমবয়সী শালার কাছে আসিয়া জুটিতেন। দু'জনে তাঁদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের আলোচনা আদৌ হয় না, সাহিত্যের দর্শনের এবং দেশের ও দশের কথাই হয়। মধ্যে মধ্যে সমাজের কথায় ঘরের কথাও হঠাৎ আসিয়া পড়ে, কিন্তু নিজের ঘরের কথার আলোচনা

সুরঞ্জনের পক্ষে যে একটুও আকর্ষণীয় নহে এবং পরের ঘরের খবরও অত তুল্যরূপেই অনাকর্ষণীয় ইহা বুঝিয়া অভয়াচরণও এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই চিরসহিষ্ণু স্বামী ও পিতাকে তিনি গভীর সমবেদনার সহিত সমানভাবেই অসীম শ্রদ্ধা করিতেন।

তিনি জানিতেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিলেই গোলাপসুন্দরীর রাগ একা তাঁর উপরেই নয়, তাঁদের দু'জনকার উপরেই সমান ভাবে আসিয়া পড়ে। সুরঞ্জন উপরের ঘরে চলিয়া গেলে অভয়াচরণও সেই সঙ্গে উঠিয়া পড়িতেছিলেন। গোলাপসুন্দরী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"হন্যে হয়ে ছুটে পালিও না গো! একটুখানি দাঁড়িয়ে শুনেই যাও—"

ভূমিকা করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিলেন, "ওই জি. পি. বাঁড়ুয্যে কি ছাই-পাঁশ নাম, তা' জানি নে' বাবু! আজকালের ত' ওই এক ঢঙের নামের ছিরি হয়েছে, তা' ওকে ডালির জন্যে একটু ভালো করে ধরো গিয়ে দেখি। সুকুকে বললে সে ত' হেসেই উড়িয়ে দেয়, তুমি নিজে একবারটি বলেই দেখ না আজ।"

অভয়াচরণ দাড়ী চুলকাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু কি জানো! আমার বলার চাইতে সুকু বল্‌লেই ভাল দেখায়। ওদের সমবয়সী, মনের কথা ওরাই ভাল বুঝবে। মানে, ডালিকে বিয়ে করতে ওর মত আছে কি না, সেইটে ত' জানা চাই।"

গোলাপসুন্দরীর বিরক্তি-বিরস চিত্ত প্রতিবাদে তিক্ততর হইয়া উঠিল। উত্তেজিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে সব আগেই জানা হয়ে গেছে। সুকুর কাছে বলে নি, 'তোমার বোনটি ত' বেশ আপ-টু-ডেট্!' কি বাবু, তার মানে-টানে তা' অবিশ্যি জানি নে',—সে না কি এখনকার ছেলেমেয়েদের মস্ত বড় সার্টিফিকেট।" সুকু বলেছিল,

দেখতে পারি
কি হই
বর্ণ

.তোমার ওকে পছন্দ হযে থাকে ত' বলো, ব্যবস্থা করি।'—তাতে বলে, 'দাঁড়াও চাকরীটা পাকা হোক, ওসব তখন ভাবা যাবে।'—তা চাকরী ত' পাকা হয়েই গ্যাছে। এইবার সোজাসুজি কথা বলে পাকা করাই তো উচিত। ও ছেলে ত আর হচ্চে হবে'র জন্যে পড়ে থাকবে না।"

"আচ্ছা, সুকুর সঙ্গে কথা বলে দেখি।"

অভয়াচরণ চিন্তিতমুখে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, বাহিরের দিক হইতে জুতার শব্দ শোনা যাইতেই গোলাপসুন্দরীও তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন এবং তাঁদের ঘর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুইটা দরজা দিযা দু'দল হইয়া চারজন ছেলেমেযে সবেগে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাদের মধ্যে রেস্ হইযাছিল। মেয়েরা দু'জনেই হাঁপাইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া সর্ব্বাণী। ঘরে ঢুকিয়াই সে নিকটস্থ চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল এবং বসিয়াও হাঁপাইতে লাগিল। ডালি শ্রান্ত হইলেও তার মতন ক্লান্ত হয় নাই। পুরুষ দু'জনকার দিকে হাস্যোজ্জ্বল নেত্রে চাহিয়া উৎফুল্ল-স্মিত-মুখে বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে সুকুমারকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,—"কি হলো মশাই! মেয়েরা অকর্ম্মণ্য ননীর পুতুল তুলে ধরতে গলে পড়ে না? সুযোগ পেলে তারাও যে তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এটা আমরা 'প্রুফ' করে দিলুম কি না?"

সুকুমার হঠাৎ হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে পড়ে হইল,—"হুঁ-উঁ,—হি-হি-হি! ঐ যে একজন কি রকম গট্ হয়ে বসে রয়েছেন দেখতে পাচ্চো না?—হি হি হি,—এক্ষুণি হয়ত 'প্রুফ' করে দেবেন—, ও 'ইয়েস্'! আমি যে জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে গেছি এটিও তো বারে বারেই 'প্রুফ' করে দিচ্চি।"

সুকুমার এক লাফে দুই পা ধূলা লইয়াই কার্পেট মাড়াইয়া সর্ব্বাণীর চৌকির পাশে উপস্থিত হইল। দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল,

সর্ব্বাণীর সর্ব্বাঙ্গ অবসাদে এলাইয়া আসিতেছে এবং সে শীতার্ত্তের মত কাঁপিতেছে। দৌড়ানোর প্রতিযোগিতাটা আজিকার পরিশ্রমের উপর সর্ব্বাণীর পক্ষে অসঙ্গত উপদ্রব হইয়া পড়িয়াছে বুঝিয়া তার হাসি মিলাইয়া গিয়া তাহাকে ভীত করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, সর্ব্বাণীর দাঁতে দাঁতে চাপিয়া গিয়াছে, শরীর তার শিথিল এবং শীতল।

তারা যখন ঘরে ঢোকে, মায়ের হাতের চুড়ির শব্দ পাইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইতস্ততঃ চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ইহাতে আপাততঃ ঈষৎ আশ্বস্ত হইলেও ভয় ভাবনাও বড় কমও হয় নাই। ইঙ্গিতে মিঃ ব্যানার্জ্জীকে কাছে ডাকিয়া দু'জনে ধরিয়া ইহাকে একটা কৌচে শোয়াইয়া দিল। ডালি শুষ্কমুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর অনুশোচনাপূর্ণ আত্মগ্লানিতে তার সমস্তদিনের সব কিছু আশা-উৎসাহ এবং জয়ের আনন্দ বাতাসে নেবানো প্রদীপের মত নিঃশেষ হইয়া গিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল আশঙ্কাময় উদ্বেগ। উঃ,—তার জন্যই—শুধু তার জন্যই এই হইল! কেন সে মা'র কথা শোনে নাই, কেন সে নারী-পুরুষের সামর্থ্য প্রমাণ করিতে গিয়া সারা-দিনের পরিশ্রান্ত এবং চিরদিনের সমতলবাসিনী সর্ব্বাণীকে পাহাড় হাঁটার পরেই আবার এত বড় একটা উত্তেজনা দিয়া শ্রান্ত করাইল?

সর্ব্বাণীকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিয়া সুকুমার তার গায়ের শালখানা সন্তর্পণে খুলিয়া ফেলিতে লাগিল, আর মিঃ ব্যানার্জ্জী সরিয়া আসিয়া ডালির নিকটে দাঁড়াইয়া তার ভয়ার্ত্ত মুখে সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভয় পাবেন না, ক্লান্তিতে ফিট হয়েছে, এক্ষুণি কেটে যাবে। একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসুন দেখি, আর শীগ্‌গির যাতে গরম দুধ কি চা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন।"

আশ্বাসের নূতন বলে বলীয়ান হইয়া ডালির আড়ষ্ট দেহ মন

উৎসাহ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে উপদেষ্টার আজ্ঞা পালনে ছুটিয়া গেল। সুকুমার তাহাকে সাবধান করিয়া দিল,—"আমি নাড়ী দেখেছি, ভয় নেই,—দেখিস মা যেন টের না পান, আমার কলা! তুই-ই একুনি খেয়ে মর্‌বি।"

সর্ব্বাণীর দিকে ভয়ের বিশেষ কারণ নাই জানিতে পারিয়াই— ডালির এই ভাবনাটাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মা আজ আর রক্ষা রাখিবেন না। বাস্তবিক সেই ত' সকল অনর্থের মূল। সুকুমাব যে তাকে আড়াল করিবার জন্য মা'র কাছে এত বড় কাণ্ডটা লুকাইতে রাজী আছে জানিয়া দাদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিল।

১৪

এর পর এমন যে গোলাপসুন্দরী পর্য্যন্ত এদের শিষ্টতার আতিশয্যে বিস্মিত এবং বিহ্বল না হইয়া পারিলেন না। সর্ব্বাণী সহজেই সামলাইয়া উঠিলেও সে রাত্রে শরীর ভাল নাই বলিয়া চা খাইয়া বিছানায় ঢুকিযাছিল। দুতিন দিন চলাফেরাও বড় একটা করিতে পারে নাই। তা' দেখিয়া গোলাপসুন্দরী মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ওই জন্যেই ত' বারণ করি মা! আজকালকার মেয়েদেব যুগ্যতা তো কত! কথা ত' কেউ শোন না, নাও এখন ঠ্যালা সামলাও!" কিন্তু সর্ব্বাণীর পায়ের ব্যথা সারিলেও যখন তারা নিস্পৃহ শান্তমূর্ত্তিতে সেলাই পাড়িয়া বসিল, তখন তাঁর মায়ের প্রাণে তা'ও সহ্য হইল না। একদিন থাকিতে না পারিযা বলিয়া ফেলিলেন, "কি আর এমন বলং হয়েছে বাছা, যে তোমরা পরমহংস হয়ে উঠলে? শীত পড়েছে এই ত' বাইরে বেড়াবার সময়। এখন আবার রাজ্যিশুদ্ধ সেলাই ফোঁড়াই

নিয়ে বসা কেন? সুকুমার! কাল একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে রাখিস ত',—সব্বাই মিলে টপকেশ্বর যাওয়া যাবে'খন। অনেকদিন ওদিকে যাই নি, আর দাদারও একটু বেড়ান হবে।"

ডালি ও সর্ব্বাণী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া ঈষৎ হাসিল। ডালি ইসারায় প্রশ্ন করিল, "যাবি না কি?" সর্ব্বাণী হাসিয়া মাথা হেলাইল,—ইহাতে আবার সংশয় আছে?"

গোলাপসুন্দরী আপন মনেই কহিলেন, "বর্ষার পরেই দেখবার বাহার! গরমকালে ধারার জলে জোর থাকে না, নদীও শুকিয়ে যায়। একদিন টপকেশ্বর চল্, একদিন সহস্রধারায় যা, দু'একদিন বা সবুকে নিয়ে 'ফিষ্টি-টিষ্টি' কর গে' কোথাও গিয়ে, তা' না'—কি সব বুড়োর মতন মুখ গোঁজ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকা দুচক্ষে দেখতে পারি নে'।"

গোলাপসুন্দরী পিছন ফিরিতেই ডালি হাসিযা সর্ব্বাণীর কোলে লুটাইয়া পড়িল। "যাঃ, ফাঁড়া কেটে গেল।—সবুদি! আচ্ছা ভাই! মার কি রকম মজা দেখেছিস্? আমরা বেরুতে চাইলেও বকবে আবার না চাইলেও প্রাণে সইবে না।"

সর্ব্বাণীর আঙ্গুলে অকস্মাৎ ডালির ধাক্কায় বোনার কাঁটার মুখটা ফুটিয়া গিয়াছিল, গোপনে শাড়ীর পাড় জড়াইয়া রক্ত বন্ধ করিতে করিতে স্মিতমুখে উত্তর করিল, "এই জন্যেই ত' বলে মায়ের প্রাণ!"

ডালি সর্ব্বাণীর আঙ্গুলের আঘাত জানিতে পারে নাই, সে তেমনই ঝর্ণা ধারার মত এক নিশ্বাসে অবিরল হাসিয়া চলিয়াছে, হাসিতে হাসিতেই বলিল, "কিন্তু সেদিনকার সেই ব্যাপারটি যদি জানতে পারতো, তো ঐ মায়ের প্রাণ বলেই শিউরে উঠে আমাদের ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখতো না? ভাগ্যে সেদিন্ দাদা বাঁচিয়ে দিলে, আমার ত অত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে ভরসাই হতো না।"

সর্ব্বাণী সহাস্যে চুপ করিয়া রহিল, তারপর দেখিতে দেখিতে তার সুপ্রফুল্ল স্মিতমুখ ম্লান,—ম্লানতর হইয়া গেল। একটা অনতি দীর্ঘশ্বাস অতি ধীরে মোচন করিয়া সে পুনশ্চ ঘর পড়িয়া যাওয়া কাঁটায় সন্তর্পণে ঘর তুলিতে উদ্যত হইল।

ডালি মাথা তুলিয়া তার মুখের দিকে চাহিল, একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চাপা হাসি মিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে কহিয়া উঠিল, "ষাট্!"

সর্ব্বাণী বিস্মিত হইয়া কাঁটা পশম হইতে মুখ তুলিল, "ও আবার কি? কি হলো?"

ডালি পুনশ্চ তার কোলে মাথা রাখিয়া পরম পরিতোষে শুইয়া পড়িয়া উত্তর করিল, "দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লি যে ওতে—ঐ রকমই বল্‌তে হয়,—মা যে আমায় বলে।"

সর্ব্বাণীর মুখের উপর দিয়া আবারও একটা ব্যথা সজল বহি গাম্ভীর্য্যের পাতলা মেঘ ভাসিয়া গেল; কিন্তু তখনই সে আত্মসংবৃত হইযা সহজভাবেই কথা বলিয়া উঠিল, বলিল, "তা'হলে তুইও থেকে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিস্? কেন বল তো? বিয়ে হচ্চে না বলে বুঝি? অথবা—"

ডালি চট্ করিয়া বাধা দিল, "অথবা তোমার বিয়ের পরিণাম দেখে বিয়ের নামে ভয় পেয়ে? হবে হয়ত কোন্‌টা না কোন্‌টা। কিন্তু সবুদি! তোমার এই নিশ্বাসটা কোন্ জাতীয় সে খবরটাই আগে দাও না কেন? সেই নিরুদ্দিষ্ট আধা-বরটির জন্যে বুঝি? যাকে সেদিন বলেছিলে,—'আহা বেচারী!'—"

সর্ব্বাণীর সচেষ্ট হাসি তার অন্তরের মেঘ-বাষ্পে মুহূর্ত্তে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শরৎকালের আকাশের মত একটি ক্ষণেই যেন বায়ুসঞ্চরণশীল খণ্ডমেঘ সে মুখে গ্রীষ্মকালের আকাশের মত জমাট বাঁধিয়া থমকিয়া

দাঁড়াইল। মৃদু উদ্বেলিত কণ্ঠে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কহিল, "সে আমার মা'র কথা ভেবে। সন্তানের পক্ষে মা হারানো যে কত বড় বিড়ম্বনা এখানে আসবার আগে সে কথা এমন স্পষ্ট করে কোনদিনই আমি জানতে পারি নি,—ডালি!"

ডালিও এ কথায় গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তারপর উঠিয়া বসিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিল, "কিন্তু মামাবাবু তোমায় কি রকম ভালবাসেন বল ত'? মায়ের অভাব কি তিনি কিছু বাকি রেখেছেন তোমার?"

সর্ব্বাণী এ কথার জবাব দিল না, কেবল বিষাদপ্রচ্ছন্ন যে ক্ষীণ হাসি অধরপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তার মুখের ভাষার প্রতিভূ হইয়া সে-ই যেন বলিয়া দিল,—বাপ মার স্নেহ দুইই বড় জিনিষ কিন্তু এক নয়! মায়ের হাত না পড়লে মেয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

মায়ের কাছে প্রশ্রয় পাইয়া ডালি সুকুমারকে ধরিয়া বলিল,—
"শুন্‌চো দাদা! টপকেশ্বরে যেতে হবে যে।"

সুকুমার ত' শুনিয়াই অবাক! "আবার তোরা বেরুতে চাস্? কি বেহায়া মেয়ে রে তোরা? সেদিন যাই ব্যানার্জ্জী ভদ্দরলোক ছিল তাই কোন গতিকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া গেছে, কিন্তু ফের?"

ডালি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "কি করেছিল বাবু তোমার ব্যানার্জ্জী? সবুদি ত' একটু পরে আপনিই ভাল হয়ে গেল।"

সুকুমার সরোষে কহিয়া উঠিল, "দেখ্ মিত্রদ্রোহ করিস নে' বল্‌ছি! —আমি নীতি শ্লোক জানি এবং সেই শ্লোকচ্ছন্দেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মহামুচ্যতে পাপে, মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে'—তুই কি সেই ঘোরতর রৌরব নরকে পচে মরতে চাস? তোকে জল আর দুধ আনতে কে' বলে দিলে? আমরা বুঝি জানতুম মানুষের ফিট হলে মুখের ওপোর

জোরে জোরে জলের ঝাপ্টা দেয়, আর ঢুক্ ঢুক্ করে ইয়া গরম গরম দুধ খাওয়াতে হয় ?"

ডালি কুণ্ঠিতমুখে স্বীকার করিল, "এর আগে ফিট ত' কারুরই হয় নি, কি করে জানবো ?"

সুকুমার তাহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিল, "কি করে জানবি কেন ? একটুখানি 'কমন সেন্স' থাকলেই তো জানা যায়। যাক, আমি কিন্তু তোমাদের নিয়ে যাচ্ছিনে, কোন্ দিন না কোন দিন খুনের দায়ে পড়বো নাকি !"

ডালি রাগ করিয়া বলিল, "বা ব্বা ! ছেলের সঙ্গে কথায় যদি পারবার যো আছে ! 'কমন সেন্স' তোমার ত' এখন হয়েছে ? তখন না হয় দু'জনেরই ছিল না। তারপর সবুদির ত' আর হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম নেই, সেদিন বেশি পরিশ্রমে ওরকম দৈবাৎই হয়ে গেছল, তাই বলে কি রোজই হবে ?"

সুকুমার ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, "দৈবের উপর ত' কারু হাত নেই,—এবারও যদি দৈবাৎই হয়ে যায় ? না বাপু, আমি ওসবে বড় ডরাই,—কাজ কি আমার ফ্যাঁসাদে। বলে এমন তাজাতাজা রাষ্ট্রনীতিতেই যার গেলুম না কাঁচা প্রাণটির মায়ায়।"

কয়দিন কোথাও বাহির না হইতে পাইয়া ডালির প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, আর এই কন্‌কনে শীতের মুখেই ত' ওসব স্থানে যাওয়ার মজা ! তারা সেবার যখন গিয়াছিল তখন সামনের নদীটি শুষ্ক, বুকের হাড়-পাঁজরার মত অসংখ্য পাথরের নোড়া-নুড়ি মাত্র নদীগর্ভে ছড়াছড়ি হইয়া আছে, বর্ষা শেষে এখন সেই মরা নদী নাকি জলপূর্ণ ;—মা'ও যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। তার উপর সর্ব্বাণী এখনও টপকেশ্বর দেখে নাই, কিন্তু শেষটায় সুকুমারকে লইয়া যে এমন ফ্যাঁসাদ ঘটিবে সে কি তা'

জানিত? দাদা যেন কি! শেষে সে রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ, সঙ্গে নাও তোমার ঐ ব্যানার্জ্জীকে। তা'হলে ত' মনে ভরসা হবে?"

সুকুমার সানন্দে লাফ দিয়া উঠিল,—"হুর্‌রে!—নিশ্চয়, নিশ্চয়, ডালি! তোর এইবার একটু একটু করে 'কমন সেন্স' হচ্ছে! হ্যাঁ হবে,—খুব ভরসা হবে,—যা, উদ্যোগ-আয়োজন, ক্রিম-মাখা, পাউডার-লাগানো, লিপষ্টিক চোষা যথাকর্ত্তব্য সব কিছু কর্ গে' যা। কিন্তু শোন্, বেশী করে খাবার নিস, আরও পাউণ্ড খানেক চা,—আমার আরও চারটি বন্ধু যাবে এবং খাবেও তারা পেটপুরে নিশ্চয়ই।"

"বেশ, তাই হবে'খন"—বলিয়া দু'ভাগ করা লম্বা বেণী দুলাইয়া ভিতরে ভিতরে লজ্জাভিহত অথচ সানন্দচিত্ত ডালি পালাইয়া গেল।

ব্যানার্জ্জীর কথাটা প্রাণের দায়ে বলিয়া ফেলিলেও বলার পর হইতে তার ভয় করিতেছিল, সুকুমার যে এ লইয়া তাকে জ্বালাইয়া খাইল না, এইটুকুতেই সে আপাততঃ বাঁচিয়া গিয়াছে, কিন্তু সুকুমারকে কোন ভরসাও তার নাই, তাই যত শীঘ্র পারে সরিয়া পড়াই নিরাপদ।

উদ্যোগ পর্ব্ব বড় মন্দ হইল না। গোলাপসুন্দরী অভয়বাবু ও সুরঞ্জন ছেলেমানুষদের দলে ভিড়িতে লজ্জা বোধ করিয়াই বাড়ী থাকিতেন, কিন্তু অতগুলি বেটাছেলে যাইবে শুনিয়া গোলাপসুন্দরীর শেষ পর্য্যন্ত ইজ্জত রক্ষা করা চলিল না। অগত্যাই আরও একখানা মোটরের ব্যবস্থা করিয়া বুড়োর দলটিও সঙ্গে চলিল। সামনের এবং পাশের বাড়ীর ডালির দু'টি বন্ধু রেণুকা ও বীণাকে সে জোগাড় করিয়া লইয়াছিল। বেশ একটি পুরা দলই তৈরী হইল। স্থির হইল রান্নার জোগাড় সঙ্গে লইয়া সেখানেই রান্না করা হইবে। ব্যবস্থা দিলেন অবশ্য গোলাপসুন্দরী নিজে। কার্ত্তিক মাসে বন-ভোজন করা না কি বিশেষ শাস্ত্রসম্মত, বিশেষতঃ

জোআমলকীতলা মিলিলে ত' কথাই নাই। তা বনে-বাদাড়ে আমলকী গাছ কি আর খুঁজিলে মিলিবে না?

যাত্রার প্রারম্ভেই মস্ত বড় বিভ্রাট ঘটিল। অন্ধকার মুখে সুকুমার আসিয়া খবর দিল, ব্যানার্জ্জীকে 'টুরে' বেরুতেই হবে, সে কিছুতেই যেতে পারবে না।

গোলাপসুন্দরী এ সংবাদে যেন মুষড়াইয়া পড়িলেন। ডালির মুখের মিষ্ট হাসি লুকাইয়া পড়িল, সর্ব্বাণীও আশাহত বোধ করিল। সেদিনে সেই মূর্চ্ছাবসন্ন অবস্থায় সপ্রতিভ সেবা-সাহায্য পাওয়ার পর হইতে মনে মনে সে ইহার প্রতি একটু যেন কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছিল।

কিন্তু এতখানি অগ্রসর হইয়া ফেরা চলে না। মাছ-মাংস কাটাকুটি, ময়দা মাখা, এমন কি ভুনি খিচুড়ির চালে শুদ্ধ মেওয়া মশলা মেশানো হইয়া গিয়াছে। অগত্যা দ্রব্যসম্ভার সমভিব্যাহারে ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ চিত্তেই যাত্রা করা হইল। জোগাড় দিবার জন্য চাকরও সঙ্গে চলিল।

টপকেশ্বর স্থানটি পরম রমণীয়। নির্জ্জনে প্রবাহিত অতি ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বত্যনদী, তীরে তার প্রকাণ্ড এক পার্ব্বত্য গুহামধ্যে স্বয়ম্ভু-শিবলিঙ্গ,—পাহাড়ের উপর হইতে দিন রাত শিবের মাথায় সলিল সিঞ্চিত হইতেছে, কোথা হইতে সে জল আসে কেউ জানে না, কোন গুপ্ত ধারার সন্ধানও মেলে নাই! দেখা শোনার পর রান্না-খাওয়ার আয়োজন আরম্ভ হইল। সুকুমার বলিয়া বসিল, "আমার মাকে দিয়ে রাঁধিয়ে যে সব্বাই গব্‌গবিয়ে গিলবে সে হতে পারে না।—প্রত্যেকেই কিছু কিছু রাঁধবে,—এই ডালি! তুই কি রাঁধবি বল?—সর্ব্বাণী তুমি?"

সর্ব্বাণী সখ করিয়া মধ্যে মধ্যে বাপের জন্য রান্না করে, কিন্তু এতগুলি লোকের রান্না ত কখন সে করে নাই, ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, "চাট্‌নী।"

সুকুমার মুখ সিঁট্‌কাইয়া মন্তব্য করিল, "এঃ,—ইনি দেখছি খাসা

চালাক! এই ডালি, তুই যে কিচ্ছু বল্‌ছিস না? কি মতলব? কিচ্ছুই রাঁধবি নে' নাকি?" ঈষৎ স্বর নামাইয়া বলিল, "খাবার লোকের তা' বলে অভাব হবে না। না হয় যা বাঁচবে কিছু কিছু ফিরিয়েই নিয়ে যাব'খন ব্যক্তিবিশেষের জন্যে।"

সোজা কথার ভিতরকার বাঁকা খোঁচা বুঝিতে পারিয়া ডালি' আরক্ত হইয়া সবেগে বলিল,—"ধেৎ! আমি কি না সবুদির মত ফাঁকিবাজ, আমি রাঁধবো মাংস।"

সুকুমার চীৎকার করিয়া উঠিল, "হুররে!"

এদিকে ঐ মন্তব্যে সর্ব্বাণী রুখিয়া উঠিয়াছে,—"ফাঁকিবাজি কি রকম? চাট্‌নী রাঁধা বুঝি রাঁধা নয়? আচ্ছা কতখানি গেলো, তখন দেখা যাবে!"

ডালি চোখ পাকাইযা বলিল, "সে কথা ছেড়েই দাও না, সে না হয় অর্দ্ধেকটাই খাবো, তাই বলে চাট্‌নী রাঁধা আবার রাঁধা কী? ও ত' পঞ্চম বর্ষীয়াতেও পারে।"

সর্ব্বাণী চোখ বাঁকাইয়া জবাব দিল, "হ্যাগো হ্যাঁ,—পঞ্চম বর্ষীযার পেরে কাজ নেই, বিংশবর্ষীয়া নুন-মিষ্টি ঠিক ঠিক দিতে পারে কিনা দেখি!"

সুকুমারের একটি বন্ধু আসিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন ত' বলি, আজকের রান্নাটা আমরা ক'জন 'ছেলেরা মিলেই রাঁধি আর আপনারা আমাদের 'গেষ্ট' হোন। কি বলেন? আমাদের একদিনের তরে এই চান্‌স্‌টুকু দেবেন না?"—প্রস্তাব শুনিয়া সর্ব্বাণী ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। ডালি সাগ্রহে উত্তর করিল,—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি দিচ্চি। কিন্তু যেন 'চাঁপাইছে কি নামাইছে'—করবেন না দেখবেন! যেন খাদ্যের পূর্ব্বে একটি বিশেষ স্বরবর্ণ সংযুক্ত করতে না হয়।"

ছেলের দল উচ্চহাস্যে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিল। সুকুমার দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া ডালির দিকে সবেগে প্রদর্শন পূর্ব্বক মুখভঙ্গী করিল, "তোমাদের জন্যে এই থাকবে! আমরাই সব শেষ করে দোব। নির্ভয়ে বসে থাকো গে যাও।"

গোলাপসুন্দরী এ প্রস্তাব সহজে অনুমোদন করিতে পারেন নাই, বিস্তর বাদানুবাদের পর অনিচ্ছার সহিত সম্মতিদান করিলেও সতর্ক সজাগ চক্ষে রন্ধনস্থলেই পাহারা দিয়া বসিয়া রহিলেন।

রান্না খাওয়া চুকিষা গেলে একদল বাড়ী ফিরিযা গেল। অভয়বাবুর কাছে বৈকালে লোক আসিবে, রেণু-বীণাদের বাড়ীতে কাজ আছে, সুরঞ্জনের সর্দ্দিভাব মনে হইতেছে, তাই এঁদেব লইযা গোলাপসুন্দবী একটা মোটরে বাড়ী ফিবিলেন। তাঁব ইচ্ছা ছিল মেযেরাও যায; কিন্তু স্থানাভাববশতঃ সেটা ঘটিযা উঠিল না, শীঘ্র ফিরিবার জন্য সুকুমারকে বিশেষভাবে তাগিদ দিযা তিনি অগত্যা মোটবে উঠিলেন্। মা পিছন ফিরিতেই ডালি চুপি চুপি সুকুমারকে নোটিস দিয়া রাখিল,—"আমরা কিন্তু এখন যাচ্চি নে' তা' বলে।—সেই যার নাম ভয়্-সঙ্গে!

সুকুমার বহুবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটাকেই পুনরুত্থাপন করিল, "কেমন থেলি বল? দেখছিস ত' তোবা যা' পাবিস, আমরা ইচ্ছে করলেই তা' পারি, আমরা যা' পারি—হুঁহুঁঃ!"

ডালিদের পক্ষ কার্য্যতঃ পরাজিত হওয়ায মনে মনে চটিয়া আছে। ছেলেরা রাঁধিয়াছিল ভাল, কিন্তু সুকুমারের এতখানি গর্ব্ব তার সহিতেছিল না। চড়াসুরে বলিল, আমরা কি পারিনে' তাই বল? লেখাপড়া শেখা, চাকরী করা, বই লেখা—সব কিছুই ত' মেয়েরা পারছে। করতে দিলে আরও অনেক কিছুই পার্ব্বে।"

সুকুমার মুখ গম্ভীর করিয়া একটা চিড় গাছ দেখাইয়া কহিল,—

"করাত দিয়ে এটা চিরতে পারিস্? কুড়ুল দিচ্চি। কাট দেখি নি ঐ গাছটাকে।"

ডালি ভ্রূকুটি করিয়া গাছটার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি কাটো ত' দেখি।"

"পারি নে'? নিয়ে আয় কুড়ুল, দেখ্ পারি কি না।"—এই বলিয়া গাছটার দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হ্যালো বোনার্জ্জী? তুমি কোত্থেকে? গাছ থেকে পড়লে, না ভূঁই ফুঁড়ে উঠলে?"

সেই নির্দ্দেশিত চিড় গাছের পিছন হইতে মিঃ ব্যানার্জ্জীকে আসিতে দেখা গেল। সে মাথার হ্যাট খুলিয়া হাতে লইল এবং হ্যাটধরা হাতটাকে যুক্ত করিয়া সবাইকে নমস্কার জানাইল। কহিল, "ভূঁই ফুঁড়ে এমন 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' কখন কি ওঠে? তোমাদের মত ছিপছিপে, টিক্‌টিকে চেহারাকেই ভূঁইফোঁড় বলা যায়! এসেছি টু-সিটারে। এই দিক দিয়েই ত' ফিরছিলুম,—কিছু পড়ে আছে, সব পাচার করে দিয়েছ?"

সুকুমার বলিল, "প্রসাদ-ট্রসাদ কারু পাতেটাতে পড়ে আছে কিনা খুঁজে দেখি। এই ডালি! তোদের কি সব বেঁচেছিল না, সেগুলো কি করলি? খেয়ে ফেলেছিস্ নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে?"

ডালি রাগ করিয়া কপাল কুঁচ্‌কাইয়া ভাইয়ের দিকে কোপ কটাক্ষ হানিয়া কীল দেখাইল, বলিল,—"আমরা যেন রাক্ষস!"—বলিয়াই সবেগে টিফিন কেরিয়ার খুলিয়া খানকতক লুচি, ভাজা, আলুর দম প্রভৃতি উদ্বৃত্ত বস্তুজাত বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সর্ব্বাণী মাংসের হাঁড়িটার কাছে ছুটিয়া গেল। তখনও চাকরটা তার পাওয়া একগাদা খাবার শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়াই সেগুলা

সাফ করা হইয়া উঠে নাই। হাঁড়িতে মাংস একজনের পক্ষে যথেষ্ট রহিয়াছে। কাঠ-কয়লার আংরার উপর সেটা চড়াইয়া দিয়া বসিবার স্থান করিয়া ডালির বাহির করা খাবারগুলা গুছাইয়া আনিয়া ধরিয়া দিতে দিতে ডাকিল, "সুকুমারদা'! খাবার দেওয়া হয়েছে।"

সুকুমার তখন মিঃ ব্যানার্জ্জীর কাণের কাছে গুন্‌গুন্ করিয়া বলিতেছিল, "মা এখানে থাকলে কি বলতেন, জানো বোনার্জ্জী ?—"

"কি ?"

"'সাধলে জামাই খায় না, শেষকালেতে ঢেঁকিশালের কুঁড়ো চাটে'—নিশ্চয় এই কথাই বলতেন।"

সর্ব্বাণীর আহ্বানে যেন চমকিয়া উঠিল,—"কা'র খাবার ? আমার ? ওঃ—ধন্যবাদ! সুকুমার! তুমি ?"

সর্ব্বাণী মৃদু হাসিয়া বারেক মিঃ ব্যানার্জ্জীর দিকে চাহিয়া সম্মিলিত দৃষ্টি হওয়ায় মুখ নত করিল, তার গাল দুটি আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখরা ডালি নীরব থাকিতে পারিল না। সবেগে বলিয়া উঠিল, "নাগো! দাদা যেন একটি ক্ষুদ্দুর-রাক্ষস! অত খেয়েও ফের এরই মধ্যে খাই খাই!"

সুকুমার বোনকে কীল উঁচাইয়া কহিল, "খবরদার! মিথ্যে অপবাদ দিতে পার্ব্বি না। আমি খাবার নামটিও করিনি!" মিঃ ব্যানার্জ্জীকে পাতের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "'যাও হে সেখানে তোমার মন যারে চায়।'—কোন গতিকে যখন জোগাড়টা হয়েছে, কিন্তু এসব ওঁরা রাঁধেন নি, সেটা' জেনে নাও আগে। অস্মদাদির রন্ধন এগুলি! ওঁরা যে 'গুড্ ফর নথিং'—তা' আজ স্পষ্ট রূপে প্রমাণ হয়ে গ্যাছে!"

মিঃ ব্যানার্জ্জী পাতার আসনে আসন করিয়া ভাঁড়ের জলে হাত

ধুইতে ধুইতে হাসিয়া মুখ তুলিতেই পুনশ্চ সর্ব্বাণীর সঙ্গে তার সস্মিত-দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। সে তখন গরম করা মাংসটা তার পাতে পরিবেশন করিতে আসিয়াছিল। দু'জনেই মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃষ্টি নত করিয়া লইল এবং মিঃ ব্যানার্জ্জী যে কথাটা এদের পক্ষ সমর্থনার্থ বলিতে যাইতেছিল, তাহা সে বলিতে ভুলিয়া গিয়া ঈষৎ বিমনাভাবে আহারে মনোযোগী হইল। দুইবারের এই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়া বন্য প্রকৃতির আকস্মিক ও পার্ব্বত্য তরঙ্গিণীর কুলকুলু তানের মধ্যে অরুণ স-রাগ আলোকে তার সেই আনতনেত্রে দীপ্ত হইয়া উঠিল বিস্ময় প্রশংসার মিশ্র-লেখা! তার নীরব নতদৃষ্টি যেন তার অন্তরকে অতি নিভৃতে শুনাইযা বলিল, "সুকুমারের মামাতো বোন কি আশ্চর্য্য সুন্দর! কি চমৎকার ওঁর চোখ দুটি!"

সুকুমারের অন্য বন্ধুরা মিঃ ব্যানার্জ্জী আসার পূর্ব্বেই এক একটা বন্দুক ঘাড়ে পাখী শিকারের চেষ্টায় বাহির হইয়াছিল, তারা না ফিরিলে যাওয়া হইবে না। সর্ব্বাণী ও ডালি কাজ সারিয়া জিনিষপত্র চাকরটার জিম্মায় দিয়া টপকেশ্বরের গুহার দিকে চলিয়া গেল। সেখানে সকালে এক সুন্দরী ভৈরবীকে দেখিয়াছিল, তার সঙ্গে আলাপ না করিলে তাদের মনে শান্তি হইবে না,—সে কে, কোথায় তার বাড়ী ছিল, এখনই বা কোথায় থাকে?—এসব খবর সর্ব্বাণীর যত না হো'ক ডালির জানা চাই-ই চাই।

এদিকে সুকুমার জনান্তিকে মিঃ ব্যানার্জ্জীকে প্রশ্ন করিযা বসিল, "তোমার এ আগমনটাও কি 'অ্যাক্সিডেণ্টাল'—না—কি?"

মিঃ ব্যানার্জ্জী ঈষৎ গম্ভীরমুখে উদাসীনভাবে জবাব দিল, "হিয়ার আই অ্যাম—অল্ দি সেম্—"

"ব্যস্, ওইটুকু শুনতে পেলেই চুকে গেল! তারপর তোমার সঙ্গে

আমার অতি আবশ্যকীয় একটা কথা আছে যে? এবং সেটা আজ কিন্তু না বললে নয়।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী হাতের ছড়ি দিয়া শিথিল ভঙ্গীতে নদীগর্ভের একটা চওড়া পাথর নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সেটা ঐখানে বসেই শোনা যাক্ না।" বলিয়া অল্প জলের মধ্যে অর্দ্ধ নিমজ্জিত প্রস্তর শ্রেণীর উপর দিযা সামান্য জলপথটুকু পার হইযা পূর্ব্বনির্দ্দেশিত সাঙ্কেতিক স্থানে গিয়া পৌছিল। সুকুমারও তার অনুসরণ এবং অনুকরণ করিতে দ্বিধা করিল না। চুরোট-কেস হইতে চুরোট বাহির করিয়া আবামে ধূমপান করিতে করিতে সুকুমার তার বক্তব্য আরম্ভ করিল, "মাতো আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছেন, তার কি কিছু খবর রাখো? তোমায যা' বলেছিলুম তার কি করলে? আজ আমার 'ফাইনাল' জবাব পাওযা চাই-ই চাই।"

সুকুমাব যা বলিবে মিঃ ব্যানার্জ্জী নিশ্চযই তার আঁচ পাইযাছিল, তথাপি উত্তর দিতে গিয়া খানিকটা তাকে ভাবিতে হইল। মাথার উপর আকাশের পূর্ব্বার্দ্ধ ছায়ায় ঢাকা। নদীপারের তরুবীথি ঈষৎ কুহেলিকাচ্ছন্ন, পদতলে জলধারা মৃদুমর্ম্মরে ঘুমপাড়ানিযা গান গাহিতেছে।

মিঃ ব্যানার্জ্জী কহিল, "তোমায় ত' আমার ডিফিকাল্‌টি'র কথা বলেছি। বিলাত যাবার আগে এক জায়গায় আমি বাগ্‌দত্ত ছিলুম, ফিরে এসে খবর পেযেছি, তিনি এখনও অবিবাহিতা, তাঁর শেষ মত জানতে না পারলে তো অন্য কারুকে কথা দিতে পারি নে'।"

"তাঁর মতামত জেনেই চোকাওনা? ক'মাস আগেও ত' ঠিক ঐ একই কথা বলেছিলে।"

মিঃ ব্যানার্জ্জী ঈষৎ গম্ভীর হইয়া রহিল। একবার সন্ধ্যাচ্ছায়াময় পূর্ব্বাকাশের আর একবার বিলীয়মান প্রায় ধূসর-মিশ্র ঈষৎ রক্তাভ পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া দেখিল। তারপর একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস মোচনপূর্ব্বক

কহিল, "মত জানবার জন্যে চিঠি আমি লিখেছিলুম ওঁদের হাতে সে চিঠি পড়েছে কিনা তাও ত' নিশ্চিতরূপে জানতে পারি নি।"

একটুক্ষণ কি ভাবিয়া লইয়া পুনশ্চ সনিশ্বাসে উত্তর করিল, "আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি,—তাবপর তোমায় বলবো।"

সুকুমার একটা ভাঙ্গা ডাল দিযা চলন্ত জলের উপর ঘা মারিতেছিল, সোজা হইয়া বসিযা বলিল, "একটু ত্বরা করো, মা বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন,—হওয়াও কিছু বিচিত্র নয! তবে প্রধান কথা,—ডালিকে তোমার বিয়ে করতে মত আছে কি, না? তাকে তোমাব পছন্দ কি না?"

মিঃ ব্যানার্জ্জী আর একবাব দ্রুত ছাযাচ্ছন্ন আকাশে চঞ্চল-দৃষ্টি বুলাইযা লইল। সাদা মেঘগুলাকে এখন প্রায় কালোই দেখাইতেছে। পশ্চিমের লালিমা গাছের মাথার উপর হইতে প্রাব মুছিয়া আসিয়াছে, বনাকীর্ণ দৃশ্যপটের পিছনে কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা সবেগে নামিয়া আসিতেছিল। হিম কুহেলিকায অদূরের বন পর্ব্বতাদি দিগন্তের কোলে বিলীযমান হইয়া পড়িতেছিল। সমুদ্গত-প্রায একটা দীর্ঘশ্বাসকে বক্ষতলে নিরোধ পূর্ব্বক শান্তকণ্ঠেই সে জবাব দিল, "অপছন্দ করবার মত কিছু আছে কি ওঁতে?"

উত্তর শুনিয়া সুকুমার মনে মনে অবশ্য প্রীতই হইল, কিন্তু বাহিরে উদাস-গম্ভীর মুখে প্রত্যুত্তর করিল,—"সেটা তোমরাই জান্‌বে। আমার নিজের বোনকে আমি কি আর মন্দ দেখবো?"

মিঃ ব্যানার্জ্জী এবার ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "মন্দ নয, তাই দেখ না, মন্দ হলে তুমিও দেখতে পেতে।"

সুকুমার গভীর আনন্দে বন্ধুর হাত ধরিয়া সজোরে আলোড়ন করিযা দিল, মুখে কোন কথাই বলিল না। ডালিকে সে বড় বেশি ভালবাসে, তার শুভেচ্ছায় তার সারা অন্তর পরিপূর্ণ। এদিকে সর্ব্বাণী ও ডালি

তাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, এতক্ষণে দেখিতে পাইযাছে। তীরে দাঁড়াইযা ডালি ঝঙ্কার ঝাড়িয়া উঠিল, "দেখ দেখ সবুদি! কোথায় গিয়ে সব বসে আছেন দেখ! ও মাগো, আমাদের একটু বল্লে কি এমন হতো? আমরাও না হয একটু যেতুম।"

শুনিতে পাইযা সবেগে হাতেব ছিপ্‌টির আঘাতে তুমুলভাবে জল ছিট্‌কাইতে ছিট্‌কাইতে সুকুমার উচ্চৈঃস্বরে বলিযা উঠিল,—"বসবে না ত' কি? ওঁরা গেলেন পাহাড় টপ্‌কাতে, আমরা নদী লঙ্ঘনও করতে পাবো না?—এ মেযেটা কে'রে!"

অদূরে কোলাহল শোনা গেল, সুকুমারের বন্ধুরা পাখী শিকাব করিয়া ফিরিতেছে।

পার্ব্বত্য-সন্ধ্যার হিম-শীতল বাতাস শরীরে বরফের ছুরি বিঁধিতে আরম্ভ করিযাছে। জঙ্গলের গাছে গাছে পাখীবা প্রায় নীরব হইয়া গিয়াছে, স্তব্ধ বনতলে বাদুড়ের পাখাব ঝটাপটি ইত্যবসরে সুস্পষ্ট হইযা আসিয়াছে,—আকাশের ললাটে চাঁদের টিপ পরা সূক্ষ্ম ওড়নায ঢাকা যেন নববধুব ছোট্ট টুলটুলে একখানি মুখ লইযা সন্ধ্যারাণী ধরাতলে নামিযা আসিযাছেন। আর দেরি করা নয়।

১৫

বহুকাল পরে মণিকার পত্র আসিল। লিখিবার অজস্র কথা যেখানে বুকের মধ্যে ঠেলা মারে অথচ কলমের আগায় ফুটে না, ভদ্রতার ফাঁকা বুলি জোর করিয়া চাপাইয়া ভদ্রতা রক্ষা কবা সহজ নয়। উপরের মিষ্ট প্রলেপ গলাইয়া ভিতরের তিক্ত-কটুতা প্রবল হইয়া ফুটিযা উঠিতে চায়।—এ পর্য্যন্ত তাই মণিকা তাকে পত্র লেখে নাই, ইচ্ছা করিয়াই লেখে নাই।

সর্ব্বাণীই বা কোন্ মুখে লিখিবে? মনের ইচ্ছা তাই মনেই চাপিয়া রাখিয়াছে।

এতকাল পরে বাড়ীর ফেরত সর্ব্বাঙ্গে অনেকগুলা দেশের ও নানা ডাকঘরের ছাপমারা মণিকার পত্রটা পাইয়া সর্ব্বাণীর বুক উল্লাসে ও অভিমানে ভরিয়া উঠিল। মুখটা ভার হইয়া আসিলেও অবাধ্য চোখ দুইটা ঔৎসুক্যে স্মিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল, অথচ অভিমানী মন বলিতে লাগিল,—'মনে পড়েছে এতদিনে? বেঁচে আছি কি মরে গেছি খবরও ত' নে'ন না একটিবার!' তার মুখ দেখিবে না বলিয়াই মণিকা যতদিন তারা ছিল নিজের বাসা বাড়ীতেও তো ফিরিয়া আসে নাই দেশেই থাকিয়া গিয়াছিল।

লেফাপাটা ছিঁড়িয়া ফেলিতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। এ পত্র তার বাঁচা-মরার খবর নেওয়ার জন্য নয়! সেই পূর্ব্বতন দৌত্যকার্য্যের জের টানিয়া—মণিকা লিখিয়াছে,—

স্নেহের সর্ব্বাণি!

রাগ করেই তোমায় চিঠি লিখিনি, কিন্তু সময় সময় ভাবি তা'তেই বা খুব বেশি কি লাভ করেছি? যে রাগ নিজের মনকেই শুধু পোড়ায়, বিশ্ব-সংসারের আর কোন কাজেই লাগে না,—সেটা চিত্তবৃত্তির অহেতুক অপব্যয় মাত্র।—সাদা কথায় যাকে বলে, 'চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া'।

বাজে কথায় তোমার সময় নষ্ট করব না, হয়ত ইতিমধ্যে বিরক্তিকর হয়েই উঠেছি! আজ যে-কথা লিখতে বসে এই বাজে কথার অবতারণা, হয়ত তা' তোমায় এরও চেয়ে বিরক্ত করবে,—অথচ তা' জেনে শুনেও আমার যতই অনিচ্ছা থাক,—না জানাবারও কোন উপায় নেই। এ জগতে ভুল করে মানুষ কখন পার পায় না যতক্ষণ তার প্রায়শ্চিত্ত

সম্পূর্ণরূপে শেষ না হয়। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, মিথ্যে খেয়ালে আর একটা জীবনকে শুদ্ধ কেন এমন করে ব্যর্থ করে রেখেছ? এখনও ইচ্ছা হয় ত' খেয়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে জটিলতার জালটিকে জীবন থেকে খুলে ফেল। যদি দেখতে ইচ্ছে থাকে ত' দেখবে, জাল বড় বেশি জটিলও হয়নি,—প্রায় খোলাই আছে। আর কারুকে বিয়েও যখন করলে না, কোন বড় কাজেও হাত লাগালেও না, তখন মিথ্যা-মিথ্যি এ বেচারাকে কেন এমন করে ঝুলিয়ে রেখেছ, সে শুধু তুমিই জান। আর ইনিই বা তোমায় 'চোখে না দেখে শুধু বাঁশী শুনে'—এমন কি মজাই যে মজেছেন,—ভারতে ও বিলাতে তোমার জোড়াটি বুঝি আর খুঁজে পান নি? তবে একটা কথা স্বীকার করবো, পুরুষদের এই রকম জব্দ করলে নেহাৎ মন্দ হয় না! সেকালে ধনুর্ভঙ্গ-পণ করে যে মেয়েরা ওঁদের শৌর্য্য, বীর্য্য এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিত সে হয়ত খুব ভালই করতো,—তারই জন্যে মেয়েদের তখন মান এবং দামও ছিল। আমাদের মতন মিনি-কড়িতে কেনা বাঁদী পেয়েই না ওদের আস্কারা এতখানি বেড়েছে।

তোমার ত সে ভয় নেই, আমার ঠাকুরপো যখন তোমার 'মিনি-কড়ির কেনা গোলাম' হয়েই আছেন, তখন নির্ভয়ে তোমার সেবার অধিকার তাঁকে দান করে কৃতার্থ করো না কেন? উনি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছেন যখন—

"আমি তব মালঞ্চের হ'ব মালাকার!
দেবি! প্রতিদিন…" ইত্যাদি—

আমার মত রাগ করে নিরুত্তর থেকো না, শরণাগত ভদ্রলোককে কি লিখব শীঘ্র জবাব দিয়ে আমাকে ও তাঁকে কৃতার্থ করো। তাঁর পত্র এই

সঙ্গেই পাঠাচ্ছি, পড়ে দেখো। কি আর লিখবো! ভালবাসা নিও। জ্যেঠামশাইকে শতকোটী প্রণাম দিয়ো।

—মণিকা

পত্র পাঠ করিতে করিতে সর্ব্বাণীর ঠোঁটের দু'কোণ ভরিয়া বারে বারে বিদ্রূপের কৌতুক হাস্য প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল, পত্র পাঠ সমাধা করিয়া সে খানিকক্ষণ সহাস্যমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।—মণিকাদি'-বেচারী আমায় নিয়ে কি যে করবে,—ভুলতেও পারে না, ফেলতেও পারে না,—অথচ মন থেকে ক্ষমাই বা কি ক'রে কর্ব্বে? হাজার হোক· ওর তো ঠাকুরপো।—হ্যাঁ, ওর—ঠাকুরপো। আহা, সম্পর্কটি কিন্তু বেশ!—স্নেহাস্পদ ভাইয়ের মত অথচ বন্ধুর মতও অনেকটা,—ভারী মিষ্টি!

ডালি স্নান করিতে গিয়াছে, কাপড় পরার ঘরে চুল বাঁধার চেয়ারটা টানিয়া নিয়া সর্ব্বাণী চিঠি পড়িতেছিল। জানালাটা খুলিয়া দিয়াছে, গোলাপের গন্ধে-উতল হাওয়া শীতের আমেজ লইয়া ঘরময় ঘুরিয়া গন্ধ বিলাইতেছে, স্খলিত হইয়া পড়া গরম চাদরটা গায়ে টানিয়া দ্বিতীয় পত্র পড়িবার আগে ভাল করিয়া বাহিরের পানে তাকাইল।

প্রাভাতিক কোয়াসা কাটিয়া গিয়াছে। আকাশের শুক্তি-শুভ্র পুঞ্জিত মেঘের স্তরে প্রখর সূর্য্য-কিরণ কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ বিস্তার করিয়াছেন,—জানালার পাশেই গোলাপলতা বাঁশের গায়ে ভর দিয়া ছাতে উঠিয়া গিয়াছে, তার উজ্জ্বল গোলাপী রংয়ে ও ঘন সৌরভে স্থানটা পূর্ণ হইয়া আছে। রাত্রের শিশির তার গায়ে সূতা-ছেঁড়া মুক্তার মত জড়িত থাকিয়া এখনও মাটিতে ঝরিতেছে, একটা ভ্রমর গুন্‌গুন্ করিয়া সন্নিলার্দ্রতার দুরধিগম্য পুষ্পগুচ্ছের বিরুদ্ধে কি যেন নালিশ-ফরিয়াদ লইয়াই সর্ব্বাণীর

পাশে পাশে খানিকটা উড়িয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি করিয়াই বাতায়নপথে বাহির হইয়া গেল।

সর্ব্বাণী আলস্য-শিথিল করে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দ্বিতীয় পত্র খুলিল। মনে পড়িল এ হাতের লেখা সে এর আগেও একবার পড়িয়াছিল। চিঠিখানা মণিকার নামে।

শ্রীচরণেষু—

মেজ বৌদি! একটা সমস্যা সমাধানের জন্য অনন্যোপায় হইয়া তোমার শরণাগত হ'লাম। এর সঙ্গে তোমারও সংস্রব আছে, তাই হয়ত সমাধানেও তোমার সহায়তা প্রয়োজন।

পূর্ব্ব ইতিহাস তোমার সুবিদিত। আমি সে রাত্রে শ্রীমতী সুলোচনা দেবীর পাণিগ্রহণরূপ বিপদোত্তীর্ণ হওয়ার জন্য গোপনে পলাইয়া আসি এবং বহু চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা ইংলণ্ডে পলাইয়া যাই। সে সব খবর তুমি এতকালের মধ্যে নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবে এবং আমার সেখান হইতে ফেরার খবরও হয়ত জান। ফিরিয়া আসিবার পর খবর লইযাছিলাম সুরঞ্জনবাবুব কন্যা আজিও অবিবাহিতা এবং বিবাহার্থীদিগকে নির্ব্বিচারেই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। কি অর্থ এর আমি অবশ্য জানি না, কোন একটা নিগূঢ় নিহিতার্থ হয়ত এর ভিতর উহ্য থাকা সম্ভব! সন্দেহ হয়, হয়ত—যাক সন্দেহ মনকে অনর্থক আশা দেখায় এবং তার অধিকাংশই দুরাশা। সুরঞ্জনবাবুকে পত্র লিখে উত্তর পাই নাই। জানি না তাঁরা এখন কোথায় থাকেন। তুমি যদি আমার হইয়া সুরঞ্জনবাবু ও তাঁর কন্যাকে আমার আবেদনটা জানাও এবং তাঁদের অভিমত আমায় জানিতে দাও বিশেষভাবেই উপকৃত হই।

আমি জানি যে মেয়ে বিবাহসভায় বরকে প্রত্যাখ্যান করে কোন

বরের বাপ তাকে ক্ষমা করিতে পারেন না, কিন্তু আমি যে বিবি-বিবাহ করি নাই, তাতেই বাবা এত খুসী যে শ্রীমতীকে পুত্রবধূ করিতেও তাঁর আপত্তি নাই। বিশেষ ছোটমার মৃত্যুর পর তাঁর যে বিশেষ ভাবেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে কথা হয়ত তুমিও জান, যদিও ইহাতে আমরা একান্তই মর্ম্মাহত।

তাঁর আদেশ ও আত্মীয়-বন্ধুদের অনুরোধ ঠেলিয়া রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে, অথচ উহার কাছে আমার যেন একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁর মতটা জানা গেলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিতে পারি। শীঘ্র উত্তর দিতে চেষ্টা করিও। আশাকরি, দাদা, তুমি ও ছেলেমেয়েরা ভাল আছ। তোমরা আমার প্রণাম নিও ও ছেলেদের আশীর্ব্বাদ দিও। ইতি—

তোমার সেজ-ঠাকুরপো

ডালি আসিতেছে,—তার পায়ের শব্দ, তার গুঞ্জন-স্বরের মৃদুগীতি কানে আসিল,—এই ঘরেই সে আসিতেছে, সর্ব্বাণী তাড়াতাড়ি পত্রখানা ব্লাউজের বুকের মধ্যে ফেলিয়া দিল। ডালিকে সে এ পত্র দেখাইবে না। না, নিশ্চয়ই না। তার বাবার যদি এ খবর কানে ওঠে আরও একবার আশাহত হইবেন মাত্র! সর্ব্বাণী সে আঘাত তাঁকে আর দিতে চায় না। দ্বিপ্রহরে ডালি ঘুমাইয়া পড়িতেই সে নিঃশব্দে উঠিয়া মণিকাকে সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিল,—

ভাই মণিদি!

বাবা এবার যেতে যেতে ফিরে এসেছেন। শরীর একেবারেই ভেঙ্গে গ্যাছে। তাঁকে যাতে সারিয়ে তুলতে পারি তারই জন্যে একান্ত ব্যস্ত। বিবাহ করবার অবকাশ আমার একেবারেই নাই। তোমার

এই ঠাকুরপোটিকে ব'লো আমার সম্বন্ধে তাঁর কোন দায়িত্বই নেই। রাস্তার আর পাঁচ জন যেমন আমিও তেমনিই তাঁর কাছে অতি নিঃসম্পর্কীয় পর বই আর কেউই নই। দয়া করে আমার ভাবনা ভেবে তিনি বৃথা মস্তিষ্কের অপব্যবহার যেন আর না করেন, তাঁর কাছে আমার এই বিনীত নিবেদন। তাঁর প্রথম পত্র আমি ছিঁড়ে ফেলেছিলুম, এখন দেখছি উত্তর না দেওয়া ভুল হযেছে।—মণিদি লক্ষ্মীটি ভাই! অনুরোধ করে বলো তাঁকে,—আমায় দয়া করে যেন আর তিনি দয়া দেখাতে না আসেন, আমি ওঁদের দয়ার একান্তই অযোগ্যা। আশা করি, সব্বাই মিলে বেশ ভালই আছ?—আমার ভালবাসা নিও। ছেলেদের আশীর্ব্বাদ দিলুম।

তোমার সর্ব্বাণী

চিঠিখানা চুপি চুপি চাকরের হাতে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাকে ডাকথানায় পাঠাইয়া দিল। তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া বাপের উদ্দেশে উপরে উঠিয়া গেল। সেখানে অভয়াচরণের সঙ্গে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে দাবা খেলিতেছেন দেখিয়া শান্তচিত্তে ফিরিয়া আসিল এবং একটা অসমাপ্ত সেলাই লইয়া বসিল। এই মাত্র এত বড় যে একটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিল, মুখে তার জন্য এতটুকু বিক্ষোভ-চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। এইটুকু শুধু ভাবনা যে, তার এই স্বার্থত্যাগের খবরটা যেন তার বাবা না টের পান। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত এ ব্যথা বারে বারে তাঁকে দিতে তার বুক ফাটে অথচ সর্ব্বাণীর এমন কপাল যে তাঁকে আঘাত না দিয়াও যেন সে নিষ্কৃতি পায় না। কি কুক্ষণেই বাবাকে নিশ্চিন্ত করিবার লোভে সে সাত তাড়াতাড়ি বিবাহে সম্মত হইয়াছিল, আবার এদিকে তার মত ধৃষ্ট অসহিষ্ণু দুর্ব্বিনীতা মেয়েকে কেনই যে

ফিরিয়া ফিরিয়া সেই অজানা ভদ্রলোকটি কামনা করিয়া ফিরিতেছেন, এ'ও যে এক প্রহেলিকা? এ কথা ভাবিয়াও সে অবাক হয়! তাকে সে চোখে দেখে নাই;—তা' হইলে না হয় একটা জোড়াতালি দিয়া অর্থ বাহির করা যাইতেও বা পারিত। নারী-চরিত্রকে শাস্ত্রকাররা দুর্জ্ঞেয় বলিয়াছেন কিন্তু এই গভীর রহস্যময় পুরুষ-চরিত্রটি দেখিলে তাঁরা কি বলিতেন? যে স্ত্রীর নিকট হইতে এতটুকু প্রতিবাদ পুরুষের পৌরুষে নিদারুণ আঘাত হানিয়া তাকে উন্মাদ করিয়া দেয়, যাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিতে যাওয়ার কালে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতে হয়, 'তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্চি'—সেই একান্ত দয়া-প্রত্যাশী অপদার্থ জীবটার জন্য কোন্ পুরুষ-পুঙ্গব এমন করিয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কাঁদিয়া ফিরে? এ পুরুষ না কাপুরুষ? সর্ব্বাণীর অধর প্রান্তে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি তীক্ষ্ণ শ্লেষে ফুটিয়া উঠিল।—নাঃ,—এঁর মধ্যে একটা 'ওরিজিন্যালিটি' আছে এ কথা বলতেই হবে! তারপর এই কথা বলিয়া নিজের মনটাকে সে ভুলাইল,—'কিছু না!—এ-ও ঠিক ঐ একই মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা! পেতে গিয়ে পায় নি বলেই সেই না পাওয়ার বায়না এটা! কথায় বলে,—'যে মাছটা বঁড়শি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়,—সেইটেই বড়', হয়ত সেই জন্যেই সেটার উপর টানটা বড় বেশি।

শীতের কোয়াশাচ্ছন্ন দীপ্তিহীন ম্লান রাত্রি। নৈশ প্রকৃতির গায়ে একখানা সাদা লংক্লথ যেন মুড়ি দেওয়া। আকাশে হয়ত বা একটু জ্যোৎস্না আছে, নক্ষত্রেও চিরদিনের মত দীপ্তির অভাব নিশ্চয়ই নাই, কোয়াশার মেঘে কিন্তু সবই অস্পষ্ট, যেন সব থাকিয়াও অবাস্তব, কোথাও কিছু নাই,—ম্লান, শ্রীহীন, ছায়াচ্ছন্ন, মোহাভিভূত।

সর্ব্বাণী সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। যতই ভাবিবে না মনে করে, ততই ঘুরিয়া ফিরিয়া আজকের পাওয়া চিঠি দু'খানার কথাই তার

মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়।—"ইঁহার কাছে আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে বলিয়া আমার অনুভূত হয়।" কথাগুলা তার কানের মধ্যে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে থাকে। সত্যই কি তাই? দায়িত্ব যদি তার কাছে উহার থাকে, তবে সর্ব্বাণীরও কি সে দায়িত্ব একেবারেই তাঁর কাছে নাই? সর্ব্বাণী মনে মনে যেন উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সত্যই কি তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক অচ্ছেদ্যভাবে তার অজানিতে জন্মিয়া গিয়াছে এবং সেটা থাকিয়াও গিয়াছে? অথচ—না, না,—এ শুধু একটা মনগড়া কল্পনা! ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। শুইয়া শুইয়া আর যেন ভাবিতে পারা যায় না। কে যেন তার বুকটাকে দুহাতে চাপিয়া ধরিয়াছে, তার মনটা যেন বিষম ভারি হইয়া উঠিল। হয়ত এ কথাটা নিছক মিথ্যাও নয়! অন্ততঃ প্রাচীন কালের দেশাচার ও শাস্ত্রাচার এই রকমই কিছু বলিবে। এ দেশে এক সময় বাগ্‌দত্তা কন্যাকে বিবাহিতা হিসাবেই ধরা হইত। সর্ব্বাণী শুনিয়াছিল, কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে এক সময় বাগ্‌দত্তা কন্যার বাগদত্ত-পতি-বিয়োগে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন পর্য্যন্ত করিতেও নাকি হইত।—তবে সাধারণতঃ বাগ্‌দত্তারা পঞ্চ-আপদ ঘটিলে অন্যত্র পরিণীতা হইতে পারিতেন,—এ'ও সে জানে, পরাশর সংহিতা হইতে সহসা সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, কে জানে,—তাদের মধ্যে একটি দায়িত্বের সম্পর্ক সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায় নাই ত? সর্ব্বাণী নিজেই সে বিবাহে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, তার বাগ্‌দত্ত-বেচারীর ইহাতে কোনই অপরাধ ছিল না। দায়িত্ব যদি থাকে তাঁর দিকে না থাকারই কথা, তথাপি যে সে লোকটি নিজেকে তার কাছে পণে আবদ্ধ রাখিতেছেন, এর ভিতরে সত্যই একটা অনন্যসাধারণ চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় বই কি! এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে সচরাচর এ রকমটা সংসারে দেখা যায় না।

সর্ব্বাণী গায়ে জড়ানো রাগ্‌খানা খুলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শার্সি খুলিয়া খড়খড়ির পাখী টানিয়া বাহিরের পানে তাকাইল। চারিদিক নিসুপ্ত, এক প্রান্তে কুহেলিকাচ্ছন্ন চাঁদও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, —রাস্তার কুকুরদের সাড়াটুকুও পাওয়া যায় না।

গভীর সংশয়াকুলচিত্তে সে নিজের অন্তরের অভ্যন্তরে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিল। অকস্মাৎ তার লজ্জাহত চিত্ত উচ্চকণ্ঠে ও আর্ত্তরবে আকুল হইয়া বলিয়া ফেলিল,—না, না,—আর হয় না,—সেই অজানা না-দেখা বাগদত্তের জন্য কোন সঞ্চয়ই তো তার অন্তরের অন্তঃস্থলে সঞ্চিত নাই! কেমন করিয়া থাকিবে? সে কি তাঁকে চোখে দেখিয়াছিল? এই রূপ রস শব্দ স্পর্শ শূন্য অশরীরী দেবতার পূজার উপকরণ আহরণ করা তার পক্ষে এখন অসম্ভব, অসাধ্য! আর কেন যে তা' অসাধ্য সে লজ্জার ও সেই গ্লানির কথা মুখে ছাড়িয়া মনের ভিতরেও যেন তার কোন একটি মুহূর্ত্তেও স্থান না পায়। ভগবান! ভগবান! তার মনকে এই দুর্ব্বলতার মহা পাপ হইতে বিমুক্ত করো! এ কি তার এতদিনকার গর্ব্বের প্রতিশোধ নাকি? না এ শুধু একটা অস্থায়ী দুঃস্বপ্ন মাত্র?

জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সরিয়া আসিল। চির শূন্য চিত্ততলে এই অতর্কিত মুহূর্ত্তে কা'র এ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে? ছি ছি! শত ধিক্ সর্ব্বাণীর এমন দুর্ব্বল চিত্তকে! না, না,—এ কখন হইতে পারে না, যে নিজের সর্ব্বস্ব অনায়াসে অবহেলায় বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে কি শেষে পরস্বাপহারী হইবে না কি? তার ভাগ্যের একি বিড়ম্বনা! সর্ব্বাণী জোর করিয়া তার এ অনধিকার প্রবেশকে বাধা দিয়া ফিরাইয়া দিবে। মাটির পুতুল সে নয়,—নয়,—নয়,—সে মানুষ,—এ দুর্ব্বলতাকে সে অন্তরে কিছুতেই লালন করিবে না,—না, না, না!—

অবসাদ-ক্লান্ত দেহ বিছানায় লুটাইয়া দিয়া গায়ের উপর গরম চাদর

টানিয়া দিল, তার পর নীরব-স্তব্ধ পড়িয়া থাকিতে থাকিতে কোন্ সময় অদূরাগত কেনালের অশ্রান্ত জল-কল্লোলের সমতানে সম্মোহিত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল……

শীতটা খুবই জোর করিয়াছে। মেঘ বৃষ্টি যুক্তি করিয়া সূর্য্য-দেবতার বিরুদ্ধে যেন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি চারিদিক ঘেরিয়া ঘেরিয়া কোয়াশার ঘন জাল পরিব্যাপ্ত, আকাশে চাঁদ ওঠে কি না তা জানা যায় না, তারার মালার তো দেখাও নাই! তা' ভিন্ন সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ওসব দেখার লোকই বা কই? 'ভবনে ভবনে রুদ্ধ দ্বার' তার উপর মোটা-মোটা গরম কাপড়ের পর্দ্দা টানা, অনেকেরই ঘরে চিমনিতে —যাদের সে ব্যবস্থা নাই তাদের মাটির 'বর্সিতে' আগুন জ্বালিয়া ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। গরীব দুঃখীরা কুটা পালা কুড়াইয়া শুষ্ক ঘাস জোগাড করিয়া আগুন জ্বালিয়াছে, তা' নৈলে এ ঠাণ্ডায় হাত পা কিছুতেই গরম হইতেই চায় না।

সুরঞ্জনের দুর্ব্বল শরীর শীতের এতটা প্রতাপ সহ্য করিতে পারিতেছিল না। এত যত্ন, এত সাবধান, অথচ কোন্ সময় একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া যায় অমনি সর্দ্দি করে, কাশি ও হাঁচি হয়, সর্ব্বাণী ভয়ে আঁৎ-কাইয়া ওঠে। তার মনে কে জানে কেন দিনে দিনেই একটা যেন 'হারাই-হারাই' ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। বাপকে ছাড়িয়া সে আজকাল বেশিক্ষণ নীচেও থাকে না। পিসির ও বাপের পীড়াপীড়িতে যদি বা নামে তো একটুক্ষণ না যাইতেই উপরে উঠিয়া যায়। নানান্ ছলে ছুতায় নাতায় বাপের কাছে কাছেই ঘোরে ফেরে। কে যেন তার ভয়ার্ত্ত মনে উঁকি দিয়া দিয়া বলিয়া যায়,—আর যেন ধরিয়া রাখা চলিবে না! মর্ম্মন্তুদ্ আবেগে তার বুকের মধ্যের রুদ্ধ রোদন গলার কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া ঠেলিয়া ওঠে, অসহ্য ব্যথায় বুকখানা টন টন

করিতে থাকে। বাবা যদি তার না থাকেন, তবে এত বড় বিশাল বিশ্বে সে একাকী কেমন করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিবে? এ-কথা ভাবিতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু না ভাবিয়াও যে কোনই উপায় নাই,—কে যেন জোর করিয়াই যে ভাবায়। ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়, চোখে চারিদিক অন্ধকার দেখে, আবার জোর করিয়া নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিয়া মনকে শক্ত করিয়া লয়। ভাঙ্গিয়া পড়া চিত্তকে আশ্বাসে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়া বুঝাইয়া বলে,—'এমন কি কখন হয়? আমার মা, ভাই, বোন—কোথাও কেউ নেই;—বাবা পর্য্যন্ত কি কখন আমায় একেবারে একলা ফেলে এত শীঘ্র চলে যেতে পারেন?'—এইটুকু জোর করিয়া ভাবিতে পারিলেই গভীর আশ্বাসে ও অপরিসীম সান্ত্বনায় মন তার ভরিয়া উঠে, কিন্তু সব সময় তো এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসকে সে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অনেক সময় মনে হইত বাপকে লইয়া সে না হয় দেশেই আবার ফিরিয়া যাইবে, সেখানে এতটা তো শীত নাই। কিন্তু সুরঞ্জনের সে ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তিনি হয়ত বা মনে মনে কিছু একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মুখে অবশ্য কাহাকেও কিছুই তিনি বলেন নাই,—বলা তো তাঁর স্বভাব নয়, কিন্তু ভাবে ভঙ্গীতে জানা যাইত এখানেই তিনি থাকিতে চান। হয়ত নিজের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া একমাত্র অসহায়া কন্যাকে তার পৃথিবীর এই অবশিষ্ট আত্মীয়ার নিকট হইতে অপসৃত করিতে তাঁর মন সরিতেছিল না, করা উচিত ও সমীচীন ঠেকিতে ছিল না। মেয়ে ব্যাকুল হইয়া যখনই অনুযোগ তোলে, "এখানকার শীত তোমার সইছে না, চলো আমরা দেশে যাই।"—তখনই ক্লিষ্ট হাস্যে তাহাকে শান্ত করিতে চাহিয়া স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধকণ্ঠেই উত্তর দিতেন, "এ তোমার মনের ভুল! এমনও তো হতে পারে যে দেশে গেলে আরও হয়ত বেশি করেই ভেঙ্গে

পড়বো ! কেন ভয় করছো ? এখানে তো আমরা বেশ শান্তিতে আছি,—
"নেই ?"

সর্ব্বাণী বুঝিত পিসেমশাই ও পিসিমার সঙ্গ ছাড়িয়া আবার সেই নিরালা নির্জ্জনবাসে ফিরিয়া যাইতে বাবা ভয় পান। সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তারও কি দেরাদুনের এই আনন্দপূর্ণ পরিবেশটি ছাড়িয়া নিজেদের ভূতগ্রস্ত সেই সাবেককেলে হানা বাড়ীটার কোটরের নিরানন্দ জীবনে ফিরিয়া যাইতে একটুও আগ্রহ ছিল ? কিন্তু তার নিজের ব্যক্তিত্বকে সে তো কোনো মতেই প্রশ্রয় দিতে চায় না, তার বাপ যেমন করিয়া হোক যেখানে থাকিয়া হোক ভাল থাকিলেই হইল।

এমনই 'টাল-মাটালে'র মধ্য দিয়া শীত কাটিয়া বসন্তকাল আসিয়া গেল। গোলাপ-লতার আপ্রান্ত ভরিয়া কুঁড়িগুলি ফুটিযা উঠিল, লুকট্ গাছে কমলা লেবু রংযের ফলের গুচ্ছগুলি পথচারীর দৃষ্টি সাগ্রহে আকর্ষণ করিয়া লইতে লাগিল। 'ইউক্যালিপ্টাসে'র সুদীর্ঘ ঋজু দেহ পুরাতন ত্বক্ জীর্ণবস্ত্রের মত অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া শুক্তি-শুভ্রতায় দেহ-শোভা বর্দ্ধিততর করিয়া তুলিল, গগনস্পর্শী বাঁশঝাড়ে শ্বেতাভ-হরিদ্র নবীন পত্রোদ্গম হইল, পক্ষীকাকলীতে বসন্তোৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল।

আবার উৎসবের সমারোহ শুধু বাহিরেই নয, গোলাপসুন্দরীর বাড়ীতেও তাহারই একটা অনুকৃতি চলিতেছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী ডালিকে বিবাহ করিতে এবার পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিযাছেন। যদিও কাজের জন্য তিনি এ তিন মাস দেরাদুনে অনুপস্থিত আছেন, তথাপি সেজন্য এবাড়ীতে আসন্ন বিবাহোৎসবের আয়োজনের বিন্দুমাত্র হানি হইতেছিল না। বিবাহ অবশ্য এইখানেই হইবে। বরের বাপ বিবাহের সময় আসিবেন এবং বর-কনেকে দেশে লইয়া গিয়া বৌ-ভাত সেইখানেই করিবেন। দেনা-পাওনার কথা কহিতে গিয়া সুকুমার মিঃ ব্যানার্জ্জীর কাছে ভীষণভাবে এবং

অশ্রুতপূর্ব্ব রূপে তাড়া খাইয়াছে। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, 'বরাভরণটা জোড়-শাড়ী এবং কনের দু'গাছি লাল শাঁখা ভিন্ন আর যদি কিছু দেওয়া হয়, তবে তিনি বিবাহ সভা হইতে উঠিয়া যাইবেন।' সুকুমার স্বীকৃতি দিয়াছে এবং বলিয়াছে এর একটুও ব্যতিক্রম কোন মতেই সে ঘটিতে দিবে না। মেয়ের বিবাহে খরচ করিতে না হইলে মেয়ের পক্ষ অবশ্য বর্ত্তিয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়াই এতটা বাড়াবাড়িও কোনমতে সমর্থন করা যায় না। নিজের মেয়েকে সাধ্যমত সকলেই ধন-রত্ন-সমন্বিতা করিয়াই সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক থাকেন, সাধ্যাতীত পীড়নটাকেই এড়াইতে চান। গোলাপসুন্দরীর এই একটিমাত্র মেয়ে। তিনি এরকম সর্ত্ত মানিতে বাধ্য হওয়ায় একান্ত দুঃখিত হইলেন এবং নিজেই ছেলেটিকে ডাকাইয়া কথাটা তুলিলেন, বলিলেন, "তুমি তো নিজে কিছু চাইছো না, আমার যদি সাধ্য থাকে আমি কেন দোব না?—দেশে তোমার পাঁচজন আপনার লোক আছেন, তাঁরাই বা কি বলবেন? আমায় আমার সাধ্যমত ইচ্ছামত কিছু কিছু দিতে দাও।"

ভবিষ্যৎ জামাতা একটু গোঁয়ার গোছের, অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া ঘাড় নাড়িলেন,—সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "যা' বলবার সুকুমারকেই আমি বলেছি।"

বিরক্ত হইলেও গোলাপসুন্দরী এর উপর আর আপত্তি তুলিতে ভরসা করিলেন না। বেশী নিংড়াইলে লেবুর অমন অম্লরসও তিক্ত হইয়া যায় সেই কথাটা মনে পড়িল,—'যা সব আজকালের একরোখা মানোয়ারী ছেলে।'

সুকুমার ও সর্ব্বাণীর সহিত পরামর্শে এইরূপ স্থির হইল,—বিবাহের দিন ডালি শাঁখা শাড়ী পরিয়াই ক'নে সাজিবে,—বিবাহ হইয়া গেলে সে যখন শ্বশুরবাড়ী যাইবে সুকুমারকে তো তার সঙ্গে যাইতে হইবে,

পড়বো! কেন

“নেই ?” াপত্র লইয়া গিযা বৌ-ভাতের দিনে ‘বৌ-দেখানি’ হিসাবে সে দিলে জামাইএব তো আর ফেবত দেওয়ার অধিবার থাকিবে না, সে হইবে তখন ডালির অযৌতুক স্ত্রীধন।

মনে খুঁত রাখিয়াই গোলাপসুন্দরী বিরক্ত চিত্তে এ সব আঁকা-বাঁকা গলি পথে অগত্যাই চলিতে সম্মত হইলেন। কন্যাদায যে বড় দায়! তাঁদের কালে ত আর ছেলেমেয়ের সর্ব্বত্র সমানাধিকার স্বীকৃত হয নাই, একেলেদের চেষ্টার সঙ্গে সেকেলেরা তখনও তাল ঠুকিতেছিল।

শীতের জড়তা কাটার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহোৎসবের সূচনায এ বাড়ীর সকলকেই অনেকখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিল। সুরঞ্জনের নিরানন্দ চিত্তেও এই সমাগত প্রায় শুভকার্য্যের আনন্দোচ্ছলতার একটুখানি রেস লাগিয়া ছিল, স্বভাবতঃ মৃদুভাষী সর্ব্ব-নির্লিপ্ত মাতুল প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে ডালিকে কাছে ডাকিয়া সুগভীর স্নেহভরে তার মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ডালির আনন্দ চপল দুটি চোখ সে আদরে সজল হইয়া উঠিল। সে নত হইয়া ভক্তিভরে নীরবে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সর্ব্বাণী আসিয়া বলিল, “ওকে তো আইবড়ভাতে কিচ্ছুটি দে’বার উপায় নেই,—বৌ-ভাতেই—আমরা কিন্তু একসুট মুক্তোর গহনা আর খুব ভাল একটা জংলা বেনারসী শাড়ী ওকে দোব।—না বাবা ?”

মৃদু-স্মিত হাস্যে সুরঞ্জন উত্তর দিলেন, “তাই দিও।”

তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসকে তিনি ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে টানিয়া দমন করিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল,—ক’খানা সামান্য গহনার জন্যই আজ তাঁর মেয়ের এই দুর্দ্দশা! ঐ একটি সেট মুক্তার গহনা নিজের জন্য ব্যবস্থা করিলে হযত বা আজ সে ঘর বর পাইয়া গৃহস্থ বধূ হইতে পারিত, হয়ত এতদিনে মা’ও হইত!

হাড়-কাঁপানো শীতের হাওয়াটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বেলা বারটা পর্য্যন্ত কোয়াশার জল আর ঝরে না, দীপ্ত সুবর্ণচ্ছটায় চারিদিক প্রসন্ন ও সুস্মিত হইয়া উঠিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ মন্দ-মধুর হাওয়া অজস্র প্রস্ফুট গোলাপের গন্ধে যেন বড় বেশি ভারাক্রান্ত ঠেকিতেছিল। গাঢ় সবুজ পাতার ভিতর গুচ্ছে গুচ্ছে আঙ্গুর ফলটাও ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডালিয়া এবং সুইট পি এখনও কম জমানোটা জমাইয়া রাখে নাই! দলে দলে মেয়ে-পুরুষ সকাল সন্ধ্যায় ছায়া-মধুর পুষ্পগন্ধামোদিত প্রশস্ত রাজ-পথে ইচ্ছাসুখে বিচরণ করিয়া ফেরে দেখা যায়। আমোদ-আলাপের গুঞ্জনে, কৌতুক কলহাস্যে পথপার্শ্ববর্ত্তী গৃহবাসিগণ মধ্যে মধ্যে সচকিতে চাহিয়া দেখে।

বিবাহের দিন নিকটতর হইয়া আসিতেছে, সকলেই এর জন্য আনন্দিত ও আগ্রহচিত্ত কিন্তু ইহারই ফাঁকে ফাঁকে সর্ব্বাণীর কিসের যেন একটা পরিবর্ত্তন ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। ইহাকে যতই অগ্রাহ্য করিতে সে চায়, ততই যেন সেটা তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। তার এই জটিল জীবনস্রোত কয়েকটা বৎসর ধরিয়া যেখানে আসিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল, তারপর আর যে সেখানকার দল-বাঁধা সেই পঙ্কিল জলস্রোত ঠেলিয়া তার এই জীবন-তরীখানা কোন এক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নদীপথে বাহির হইয়া পড়িবে,—এ যেন সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সেদিন পর্য্যন্ত সে জানিত সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে মন তার নির্ব্বিকার,—এমন কি সে মৎস্য পুরাণের একটা পুরাতন শ্লোককে মনে মনে আওড়াইয়া নিজের মনকে বেশ একটা কড়া যুক্তি দিয়াও রাখিয়াছিল ;—"সুখস্য-দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা"—ইত্যাদি—

কিন্তু কেনই যে কি একটা অযাচিত দুঃখের নেশা মনটাকে তার পাইয়া বসিতেছে, তা'ও সে জানে না! কিসের জন্য এই অভাব

বোধ সহসাই তার মনের মধ্যে দেখা দিল? নিজের উপর আকস্মিক দুঃখ-ক্লান্ত এই মনটা নিদারুণ বিতৃষ্ণায় যেন একান্ত বিরূপ হইয়া উঠিতে চায়! কিসের এ দুর্ব্বলতা? যে বাপের মুখ চাহিয়া সেও তাঁর সত্যকার সন্তোষ বিধান করিতে পারে নাই, আজ জীবনের এই প্রায় অবেলায় সে কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজের সুখ খুঁজিতে চাহিতেছে? মরুময় জীবনের একপ্রান্তে স্বপ্নজালমণ্ডিত স্বর্গোদ্যানের মতই অপূর্ব্ব লতা-গুল্ম-পত্র-পুষ্প সমাচ্ছন্ন হরিৎ শ্রী র যে সমাবেশটুকু আকস্মিক ভাবে দেখা দিয়াছিল, নির্ম্মম রুক্ষ নেত্রের জ্বলন্ত ভ্রূকুটি দিয়া সে তাদের ভস্ম করিতে চাহিল। একান্ত বিতৃষ্ণ-অবহেলায় ঘৃণার সহিত সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। তার মন কি এতই দুর্ব্বল? নিশ্চয়ই না! না না না—কিছুতেই না!—এমন সময় ডালি কোথা হইতে দুর্দ্দান্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া তার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, আবদারে ভরা আদরে গলানো অভিমানের নাকি সুরে কহিয়া উঠিল,—

"বাব্বা রে বাব্বা! যে দিকে তাকাবো কেবল শিল্প-চর্চ্চাই হচ্চে! আমি যে এর ভিতরে কোথায় যাই,—ভেবেই পাইনে'!"

বাস্তবিকই ডালির বিবাহের জন্য বরের জুতা আসন ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যকীয় শিল্পজাত লইয়া সর্ব্বাণীরা পিসি-ভাইঝিতে লাগিয়া গিয়াছে। এখনও তাদের বসিবার ঘরের একটা নরম কোচের ভিতর ডুবিয়া বসিয়া সর্ব্বাণী লতাপাতার বর্ডার দেওয়া কার্পেটের আসনের ঘর কালো পশম দিয়া ভরাইতেছিল। মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল,—"তুমিও এর ভেতরেই ঢুকে পড়ো,—বাইরে থাকছো বলেই তো' বিপদ বেধেছে।"

ডালি ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "আহা রে! আমার বড় বয়েই গেছে! —আমার গরজ কি-না।"

সর্ব্বাণীর সূচের পশম ফুরাইয়াছিল, নূতন পশম পরাইতে পরাইতে ঘাড় না তুলিয়াই মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "তোর না-তো গরজটা কা'র শুনি? আমরা দয়া ক'রে করে দিচ্চি ব'লেই না,—না হ'লে হাতে সূতো বেঁধেই তো তোকে এইসব তৈরী করতে লেগে যেতে হতো, তা' জানিস?"

ডালি ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "আহা গো! সে আর নয়!—কেন শুনি? এইসব বরকে না পরালে বুঝি বিয়ে আজ কাল আইন-সিদ্ধ হয় না? না,—মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? হ্যাঁ সবুদি! তুমি বুঝি তোমার বরের জন্যে নিজেই সব ক'রেছিলে? নিশ্চয় ক'রেছিলে,—না হ'লে আমায় এ কথা বলেছো কেন?"

সর্ব্বাণীর সূচে সূতা পরানো হইয়া গিয়াছিল, সে অর্দ্ধসমাপ্ত আসন-খানার উপর পশমের টোপ তুলিতে তুলিতে হাসি মুখখানা ওর দিকে ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, "দূর! আমার আবার বর কে'রে?"

ডালিও হাসিয়া ফেলিল, উত্তর করিল, "কেন,—সেই আধখানা বিয়ের অর্দ্ধেক বর!—যার জন্যে আজও উদাসিনী হ'য়ে 'পথ চেয়ে আর কাল গুণে' বসে রয়েছ,—সেই ব্যক্তি,—আবার কে'!"

সর্ব্বাণী এবার হাসিল না, দেখিতে দেখিতে তার আয়তনেত্র বিস্ফারিত ও স্মিত-মুখ ম্লান হইয়া আসিল। চাঁদের উপর হাল্কা মেঘ আসিয়া পড়িলে যেমন দেখায় তার হাস্য দীপ্ত মুখখানাকে তেমনই দেখাইল এবং কি একটা অজ্ঞাত গোপন মনোবৃত্তির আবেগে বুকটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের ভারে ঈষৎ ফুলিয়াও উঠিল, কিন্তু সেই আকস্মিক জাগিয়া-ওঠা মানসিক দুর্ব্বলতাটাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া মুখের উপর একটা সচেষ্ট হাস্যাভাস টানিয়া আনিয়া সে সহজস্বরেই উত্তর

দিল, "তবেই দেখ,—আমি ও সমস্ত করি নি ব'লেই না—'আধখানা বরের' কনে হয়েই র'য়ে গেলাম! মহাভারত অশুদ্ধ হয না হয় স্বচক্ষে দেখেই নিচ্ছো না কেন ?"

ফস্ করিযা সর্ব্বাণীর হাত হইতে কার্পেটের টুক্‌রাটা টানিযা লইয়া ডালি অত্যন্ত ব্যগ্রতা দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে বাবা! তা' হ'লে এক্ষুণি আমি ওব অঙ্গে দু'চার ফোঁড়ও অন্ততঃ তুলে দিচ্চি দাও,—তোমার মতন আধখানা-ববে আমার তা'বলে পোষাবে না,—সে তোমরা আমায় বেহায়া বলো,—আব যাই-ই বলো, আমার যদি বর জোটে তো আস্ত গোটাটাই আমার চাই।"

আবাবও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সর্ব্বাণীর বুক ঠেলিযা গলার গোড়া পর্য্যন্ত উঠিযা আসিল। একান্ত বিমনাভাবে কলের মত উচ্চারণ করিয়া গেল, "আচ্ছা নে', সবটাই তুই পেলি।"

ডালি কথাটা বলিযা ফেলিযা নিজের লজ্জায নিজেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল তাই সর্ব্বাণীর এই অসঙ্গতি—দুষ্ট অসংলগ্ন ভাষাটা তার কাণে ঠেকিল না, ঠেকিলে নিশ্চযই হাসিযা উঠিয়া কোনো না কোনো একটা বেফাঁস প্রশ্নই সে করিয়া বসিত, হযতো বলিযা বসিত, 'এটাও কি তোমার দখলে এসে গেছলো না কি যে তুমি আমায় সদয় হয়ে সর্ত্ত ত্যাগ করে দান করছো ?—'

সন্ধ্যাবেলায় কাপড় কাচিযা সান্ধ্য প্রসাধন সমাপনান্তে সর্ব্বাণী বলিল, "শোন ডালি! বিযের জন্যে এই বেলা অন্ততঃ একটা গান শিখেনে,' বাসর ঘরে গাইতে হবে ত!"

ডালি তাহাকে ঠেলিযা দিয়া ঠোঁট উল্টাইল, "কা'কে ? আমাকে না তোকে ? নিজের বাসরে বুঝি কেউ আবার নিজে গান গায় ? সে'তো গায় বরের শালীরা।"

"এটা শালী শালার জন্যে তো রচিত হযনি, এ'হলো সাক্ষাৎ স্বয়ম্বরেক্ষণ-গান।"

"তুই বুঝি তাই শিখেছিলি?"

সর্ব্বাণী নিরাপত্তিতে স্বীকাব কবিল, "সত্যি তাই! হযত বাসরে গাইতুম না, কেননা কাকা কাকী পিসিবা তাহলে ধরে মার দিতো না!"

ডালি হাসিযা বলিল, "তা' যে গায সে গাইবে বা নাই গাইবে, কিন্তু গানটা তো আমায় এক্ষুণি শিখিযে দাও।" বলিযাই সে অর্গানের কাছে উঠিযা আসিল, "এখানে অবশ্য সে ভয নেই। মা পছন্দ না করলেও মার অবশ্য আমায দেবে না, এক যদি দেয়তো সে দাদা। তা' ওর হাতের মার খাওযা আমার জন্ম থেকেই অভ্যেস হয়ে গেছে,—আর ও মাবলেও মোক্ষম মার তো আর মাববে না, যা'তে হাড়গোড় ভেঙ্গে যাবে, শিখেই রাখিনা কেন,—অমন একটা নির্যাত হিষ্টোরিক সঙ্গীত যখন।"

ডালির গলাটি ভাল, সুর জ্ঞান থাকায় যে কোন সুর সে সহজেই ধরিতে পারে। দুজনে একসঙ্গেই গাহিতে আরম্ভ করিল,—

তোমারই মিলন সাজে সেজেছি হে প্রিয়তম!
হৃদয সেজেছে মম, অভিসারিকার সম।
বসন অনল শিখা, ভালে চারু ললাটিকা,
মুখর মঞ্জীর রব চরণে ধ্বনিছে মম।—

গান বন্ধ করিযা ডালি মাথা ঝাড়া দিযা একটা তীব্র প্রতিবাদ তুলিল, ঠোঁট বাঁকাইযা বলিল,—"উহুঁ,—এ গান আমি গাইবো না,—'অভিসারিকা' হ'তে গেলুম কিজন্যে? বারে! তোমার সেই 'মিলন রাতি'টা শিখিয়ে দাও না এর চাইতে।"

সর্ব্বাণী সুর ছাড়ে নাই, সেও মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিল, "গানে ওসব দিল, "তবে চলে, আজকাল কিইবা না চলছে? নে' ধর্,—"

বরের'

দে

গলে শতনরী সাজে, বলয়ে কঙ্কনে বাজে,
কবরীতে যূঁথীমালা সাজিয়াছে অনুপম।
তোমার রূপের জ্যোতি রূপসী করেছে মোরে,
তাই তারে সাজায়েছি যেখানে যা' শোভা ধরে,
মধুর কল্পনা দিয়ে সাজায়ে তুলেছি সবি,
আঁকিতে পারিনি শুধু তব অ-রূপের ছবি,
বহুরূপী তুমি স্বামী, কিরূপ আঁকিব আমি,
কোনরূপে দিবে দেখা, হে চির দয়িত মম?—

অকস্মাৎ জমিয়া ওঠা গীত ধ্বনি ডুবাইয়া ডালি চেঁচাইয়া উঠিল, "সবুদি! তুমি সেই তাকেই এখনও মনে প্রাণে পূজো করছো! এখনও তাকে ডেকে নাও, এখনও হয়ত তার খোঁজ পেতে পার্ব্বে। এ গান আমি কিজন্যে গাইতে যাবো শুনি? আমার তো আর ইনি অরূপ-রতন ন'ন, বহুরূপী ত ন'নই। ওঁর ঐ এক এবং অদ্বিতীয় রূপই তো দুটো চোখের উপর জ্বলজ্বল করছে।"

সর্ব্বাণী অকস্মাৎ লজ্জায় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল। ডালির এ আবিষ্কারকে তো নেহাৎ মিথ্যা বলা যায় না! সত্যই কি আজও মনে মনে সেই অপরিচিত বাগ্‌দত্তের উপরেই তার অবচেতন মনের সমস্ত প্রেম সে উজাড় করিয়া দিয়া রাখিয়াছে না কি? এ গানের ভাষা তাই কি বলে না? প্রকাশ্যে হাসিয়া কহিল, "এ যে একেবারে আধ্যাত্মিক ব্যাপার রে! যাক্ ওটা তোর পক্ষে সত্যিই খাটবে না।"

ও এমন ক্ষণ-
সেখানের
কাশ্মীর-

১৬

এ সব তো ছোটখাটো ঘরোয়া ব্যাপার। এবৎসর হরিদ্বার কুম্ভের সে যে কি বিরাট উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে সে এক বিরাট কাণ্ড! দু তিন মাস আগে হইতেই পর্ব্বতারণ্য সাফ করিয়া অজস্র কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইতস্ততঃ অসংখ্য তাঁবু পড়িয়াছে। অসংখ্য লোকসঙ্ঘের জন্য অপর্য্যাপ্ত অশন ব্যবস্থায় অক্লান্ত ভাবে লরি লরি মাল চালান আসিতেছে। সরকারী বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান ও সহস্রাধিক কর্ম্মী মিলিয়া এই কাণ্ডটাকে রাজসূয়যজ্ঞে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় নিরত রহিয়াছে। সাধু-সন্তদের অসম্ভব ভিড় হইবে, বহু লক্ষ লোক সমাগমে পর্ব্বতারণ্য পরিবেষ্টিত এই ক্ষুদ্র সহর যে একটি বিশাল জনপদের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। এই কুম্ভমেলা ব্যাপারটি তো আজিকার নহে, এ ঐতিহাসিকই শুধু নয়, পৌরাণিকও। কথিত আছে তৈমুরলঙ্ ভারত বিজয়ে আসিয়া মহাকুম্ভে বহু লক্ষ লোক একত্রিত হইয়াছে সংবাদ পান এবং তাঁর নৃশংস রাক্ষসী লীলা নরমুণ্ডের পর্ব্বত রচনা দ্বারা নরমেধ যজ্ঞ রূপে সমাধা করেন। এ কার্য্য এই রক্তমাংসের শরীরধারী একজন মানুষের দ্বারা সম্ভব একথা কি ভাবা যায়? অথবা না যাইবেই বা কেন? বোমা-বিধ্বংসিত দেশ দেখিয়া আজও মানুষেরই সেই আদিম রাক্ষসী প্রবৃত্তিকে কে অবিশ্বাস করিবে? অ্যাটম বোমের কার্য্য দেখিলে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইবে না কি? ঐ হিংস্র শ্বাপদ প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে নির্ব্বাপিত হয় নাই। পরন্তু নানা পথে দিনে দিনে বর্দ্ধিতই হইতেছে ইহা অনস্বীকার্য্য।

মেলা-স্নানের পূর্ব্বে একদিন সপরিবারে অভয়বাবুরা মোটরে করিয়া

দিল। সর্ব্বাণী স্বয়ং গিয়া দেখা-শোনা করিয়া আসিলেন। ভিড়ের দিনে চলে, আজকানটা হইলেই যথেষ্ট, দেখা শোনা কিছুই হইবে না এ জানা

অতি সুন্দর আরণ্যপথ। দুধারেই তার দৃশ্য অপরূপ। যা কিছু দেখা যায়, যেটুকু অগ্রসর হইয়া আসে মনে হয় আশ্চর্য্য নূতন! মনে হয় এইটাই বুঝি সবচেয়ে সুন্দরতম! মেঘ-নীলাভ তুঙ্গ গিরিশ্রেণী সুদূর প্রসারিত পাষাণ-প্রাকারের মতই এ অঞ্চলকে পাকে পাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তাদের পাদপ্রান্তে কোথাও অসংখ্য বিচিত্রবর্ণের উপলখণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে, কোথাও বা একটি ক্ষীণকায়া নির্ঝর-ঝরা পার্ব্বত্য তটিনী অপূর্ব্ব ছন্দে নাচিয়া ও মৃদুল গীত গাহিয়া চলিয়াছে। মৃদু-ক্ষীণ সঙ্গীতময় কল্লোলধ্বনি অদূর হইতে যেন কিন্নরীর কণ্ঠ-সঙ্গীতের মতই মৃদুচ্ছন্দে কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্ময়ে মন ভরাইয়া দেয়। কোন কোন অজানা পাখার অশ্রুত সঙ্গীতকে অপ্সরার নৃত্য-মুখর-চরণ-মঞ্জিরের আরাব বলিয়া সহসাই ভ্রম জন্মে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া সর্ব্বাণী দেখে তাদের মোটরের অভদ্র তর্জ্জনে সন্ত্রস্ত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণশীল মৃগযূথ প্রাণপণ বেগে ছুটিয়া বনান্তরালে পলায়নপর হইতেছে। এদিকে প্রকাণ্ড একটা পর্ব্বত-প্রাচীরের আপ্রান্ত সু-শুভ্র পুষ্পাস্তৃত মল্লিকালতায় অদ্ভুতরূপে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। সেই ফুটন্ত অসংখ্য অসংখ্য পুষ্প-স্তবকের চারিপাশে অজস্র প্রজাপতি তাদের বর্ণ-বৈচিত্র্যময় অপূর্ব্বতম সুন্দর সুন্দর হাল্কা ডানাগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া ঘুরিতেছিল। একটা তীব্র মল্লিকা-গন্ধী দম্‌কা হাওয়া একবারের জন্য ছুটন্ত গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া বিস্ময়-বিহ্বল মনগুলাকে সতেজ ও স্নিগ্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। বাস্তবিক প্রতিক্ষণের এই যে অপরূপ দৃশ্য-পরিবর্ত্তন এ যেন—বিশেষ করিয়া সর্ব্বাণীকে কতকটা বিহ্বল ও দিশাহারা করিয়া

তুলিয়াছিল। সমতল বাসিনী সে, এমন বন-পর্ব্বতাকীর্ণ ও এমন ক্ষণ-পরিবর্ত্তিত দৃশ্যনিচয দর্শনে দৃষ্টি অথবা মন তার অভ্যস্ত নয। সেখানের সমুদয়ই ধীর স্থিব এবং সমধর্ম্মী। ডালির কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কাশ্মীর-বাসিনী সে, এ আব তার কাছে এমনই বা কি বেশি!

গিরিরাজপুবী হরিদ্বারে পৌছিয়াও এই বিস্ময়াশ্চর্য্যের রেশ সর্ব্বাণীর মন হইতে দূরে গেল না। কাশ্মীরবাসিনী ডালির কাছে এসব বিচিত্র না হইলেও সর্ব্বাণীর সপ্রশংস নির্নিমেষ নেত্রে পর্ব্বতারণ্য পরিবেষ্টিত জননী জাহ্নবীর পাদরেণু চুম্বিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক এই ক্ষুদ্র সহরটি স্বপ্ন-পুরীর মায়াময-সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিল। পরপারে হিমাচলেব বিশাল ও সুনীল পর্ব্বতরাজি, তাদের মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুনিবিড় পাদপশ্রেণী, তারপরই জাহ্নবী জননীর শুভ্র-শান্ত সু-বিমল জলধারা,—যেমনই স্নিগ্ধ তেমনি শীতল।

স্নান-দান এবং জলযোগ সারিযা ক্ষুদ্র সহরটির এদিক্ সেদিক্ পরিক্রমা কবিতে করিতে হঠাৎ তাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িল এক-প্রান্তের একটি নিভৃত আশ্রমের উপর। ছোট্ট সুপরিচ্ছন্ন একটি বাগানের ভিতর খান দুই-তিন বা চার পর্ণকুটীর মাত্র! বাগানটি গোলাপে, ক্যানায় এবং মল্লিকা-মুকুলের অজস্রতায় খচিত হইযা রহিয়াছে। ছিম্‌ছাম্ পরিচ্ছন্নতার জন্য সহজেই লোকের নজরে পড়ে, নহিলে বিশেষত্ব এমন কিছুই নাই। তথাপি কি যেন একটা আকর্ষণীয় বস্তু উহাতে সংশ্লিষ্ট রহিযা গোলাপকে টানিল।

একজন পাণ্ডা জাতীযকে সঙ্গে লওযা হইযাছিল। উহাকে জিজ্ঞাসায় জানা গেল নিভৃত প্রান্তের এই আশ্রমটি একজন মাতাজীর আশ্রম। বহু বর্ষ পূর্ব্বে তিনি একজন অতি বৃদ্ধ লামার সঙ্গে আসিয়া শাস্ত্র পাঠের

জন্য এইখানে বাস করিতেন। তারপর আবার তাঁরা সিকিম রাজ্যে ফিরিয়া যান, আশ্রমে একজন রক্ষক থাকে। যখন কোন যোগ-যাগ উপলক্ষ্যে বড় বেশি জনসমাগম হয়, তখন এখানে ফিরিয়া মাতাজী সেবাব্রত গ্রহণ করেন। সর্ব্বদা তাদের মধ্যে এখানে থাকেন না তিনি। সুদূর পূর্ব্বোত্তরে, হয়ত তিব্বতে হয়ত ভূটানে হয়ত বা সিকিমেই চলিয়া যান, আবার কখনও দু'-এক কখনও বা দুই-চারি মাস বা বৎসর পরে পরেও এখানে ওঁর পুনরাবির্ভাব ঘটে। পাণ্ডাজী শুনিয়াছেন, ইনি ভারতের বহু তীর্থ এবং এমন কি তিব্বতের ক্লেশ-বহুল মানসসরোবর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এখন ওঁর গুরু অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় বেশি দূরে আর যাইতে পারেন না, তাই এই আশ্রমে অথবা বিষ্ণুপ্রয়াগের কাছের পাহাড়ের অন্য একটি আশ্রমে বেশির ভাগ বাস করিতে হইতেছে। মাতাজী সাক্ষাৎ দেবী, এমন রূপ আর এমন সেবা-যত্ন মানুষের দ্বারা হয় কেউ কখন এ ধারণা করিতেই পারে না।

একে তো সন্ন্যাসিনী, তার উপর অসামান্যা রূপগুণবতী, ইহাতে গোলাপসুন্দরীর চিত্তে অপরিসীম কৌতূহল যদি জাগিয়া উঠিয়াই থাকে, সে এমন কিছুই বিচিত্র নয়! ব্যগ্র হইয়া পাণ্ডাজীকে প্রশ্ন করিলেন,—"হ্যাঁ, বাবা! গেলে কি ওঁর সঙ্গে দেখা হয় না? সাধুমায়ী কি হাত গুণতে জানেন?"

পাণ্ডাজী উত্তর করিল, "মাতাজী কখনও কারু হাত দেখেন না, মায়ীজি! তবে সাধুজী দেখতে পারতেন, কিন্তু এখন তাঁর চোখের জলুষ তো চলেই গেছে, তাই আর দেখতে চান না।—দেখা কেন হবে না, দেখা হবে,—কিন্তু মাতাজী কারু সাথে বেশি কথা তো ক'ন না।"

গোলাপসুন্দরীর কৌতূহল বর্দ্ধিত হইতেছিল, "কথা ক'ন না? কেন? মৌনী না-কি?"

পাণ্ডা বলিল, "না মায়ীজি! মৌনী তিনি ন'ন, ওঁর গুরুজীর সাথে ওঁকে কথা কইতে আমরা শুনেছি, কিন্তু আর কারুর সাথেই কথা কইতে কক্ষণো শুনি নি। জোয়ান পুরুষদের সাম্‌নে বড় বেশি বারও তো হ'ন্ না।"

ডালি শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করিল, "ও মা! সে আবার কি রকম সন্ন্যাসিনী গো? সন্ন্যাসিনীর বুঝি আবার পর্দ্দা থাকে? ওমা চল না,—আমরা দেখে আসি গে, ওই পর্দ্দানসীন সাধুনীকে।"

সর্ব্বাণীর সাধু-সন্ন্যাসীদের এবং তাদের রীতি-নীতির সহিত বিশেষ কোন পরিচয়ই তো ছিল না, সে তাই নীরবই রহিল।

সুকুমার আশ্রমের বাহিরেই রহিয়া গেল, কিন্তু বোনের সবিশেষ আগ্রহে সুরঞ্জনকে তাঁদের সাথী হইতে হইল। গোলাপসুন্দরী বলিলেন, "দাদা বয়েসওয়ালা লোক, তা ছাড়া তিনি না বেরোন, গুরুর কাছে ওঁকে বসিয়ে রেখে আমরা না-হয় আশ্রমের ভিতরেই যাবো'খন। রাস্তায় কোথায় ওঁকে রেখে যাই।"

সুন্দর করিয়া রচিত ছোট্ট একটি ফুল-বাগান, পিছনের দিকে কয়েকটি ফলের গাছ। একপাশে বাঁধানো অশ্বত্থতলা, অন্যত্র একটি তুলসী-কুঞ্জ, পরিপাটিরূপেই তা পরিমার্জ্জিত। অশ্বত্থের ছায়া-নিবিড় তলদেশে একখানি বাঘের চামড়ার উপর একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ, মাথায় চূড়ার মত করিয়া বাঁধা একরাশি জটা, পদ্মাসনে সোজা বসিয়া আছেন। রং রোদ পোড়া হইলেও মূর্ত্তিখানি সৌম্য, অধর-প্রান্তের ঈষৎ একটু স্নিগ্ধ হাসি যেন একটি শান্ত দীপ-শিখার মতই মুখখানিকে সুস্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

গোলাপসুন্দরী পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া পরম ভক্তিসহকারেই সাধুকে প্রণাম করিলেন। দু'হাতে পায়ের ধূলি লইয়া নিজের মাথায়

দিলেন। মেয়েরা এবং সুরঞ্জনও দেখাদেখি প্রণাম করিলেন, কিন্তু গোলাপসুন্দরীর মত অকৃত্রিমতা কাহারও প্রণামে প্রকাশ পাইল না।

সাধু কয়েকখানা কুশাসন দেখাইয়া বসিতে বলিলে, গোলাপসুন্দরী হাত দুটি যোড় করিয়া বলিলেন, "বাবা! শুনেচি আপনি নাকি হাত গুণতে পারেন, আমার হাতটি একবারটি যদি দয়া ক'রে দেখে দেন,—আমি সধবা মরবো কি না, ছেলে-মেযে দু'টিকে রেখে যেতে পার্ব্বো কি না, আর আমার তীর্থ-মৃত্যু হবে কি না এইগুলি আমায় বলুন।"

সাধুর মুখের সেই স্নিগ্ধ হাস্যটুকু স্নিগ্ধতর হইয়া উঠিল। শান্তকণ্ঠেই তিনি কহিলেন, "আমার দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হ'য়ে গেছে মায়ি! ভাল তো দেখতে পাইনে, তবে অন্তর থেকে আশীর্ব্বাদ করছি, সব ভাল হবে, মনোবাঞ্ছা তোমার পূর্ণ হবে।"

কিন্তু গোলাপসুন্দরী যে বহুদিন হইতেই তাঁর এই প্রশ্ন তিনটির সদুত্তরের জন্য একটি গণৎকার সাধু মনে মনে খুঁজিতেছিলেন, ইঁহাকে হাতে পাইয়া ঐ একটি কথায় তো ছাড়িতে পারেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া সাম্‌নে বসিয়া হাতখানি পাতিয়া দিয়া বলিলেন, "একটু কষ্ট ক'রে দেখুন না বাবা! আপনারা মহাপুরুষ, আপনাদের আবার শক্তির অভাব কি!"

অগত্যা সাধু হাতটি বাধ্য হইয়াই দেখিলেন। তীর্থ-মৃত্যু হইবে না, ছেলে মেয়ে ও স্বামী রাখিয়া গোলাপসুন্দরীর মৃত্যু হইবে বলিয়াই যেন মনে হয়। সন্তুষ্টচিত্তে গোলাপসুন্দরী শুভ বার্ত্তাবহের পায়ের ধুলা লইয়া পুনশ্চ মাথায় মাখিলেন। বলিতে লাগিলেন, "তা' হোক, তীর্থে না মরি নাই মরবো, ওই আমার পরম তীর্থ।"—বলিয়াই এবার খপ্ করিয়া সর্ব্বাণীর হাতটা ধরিয়া টানিয়া তাহাকে একটুখানি আকর্ষণ করিয়া সাধুর সামনে আনিয়া কহিলেন, "দেখুন তো বাবা! এ মেয়েটার হাতখানা

একটু দয়া করে দেখুন তো,—আচ্ছা এর বিয়ে হবে কিনা, ভাল ক'রে একটু দেখে বলুন তো—"

সর্ব্বাণী তড়িৎবেগে হাতখানা টানিয়া সরাইয়া লইল, দুই চোখে ঘনীভূত বিরক্তিপূর্ণ ভৎ‌র্সনা লইয়া পিসিমার দিকে চাহিল।

গোলাপসুন্দরী ভাইঝির সেই তীব্র নীরব ভৎ‌র্সনার ধাক্কা খাইয়া হটিলেন না বরং বিস্ময়াপ্লুত বিরক্তির সহিত তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিলেন, কেন ? কি হয়েছে ? বিয়ে কি কখনও তোমায় করতে হবে না, না কি ভেবে রেখেছ ? নে', হাত বার কর, বরাতে যদি থাকে, তাকে তো আর খণ্ডাতে পারবি নে,—আছে কি নেই, সেইটেই তো বাবার ঠেঁয়ে জানতে চাচ্ছি।"

সর্ব্বাণী পিসিমার উপদেশে কর্ণপাতও করিল না, বরঞ্চ হাতখানাকে মুঠা করিয়া চাপিযা রাখিল। রাগ করিয়া গোলাপসুন্দরী সাধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড় একগুঁয়ে মেযে বাবা ! যা' মনে করবে কা'র বাপের সাধ্যি আছে যে, তার থেকে ওকে নয় করে !"

সাধু সস্মিতমুখে সর্ব্বাণীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁর চোখের মধ্যে ইতিমধ্যে একটু যেন বিস্ময়ের রেখা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিগাছিল। ক্ষণ পরে সহাস্য মুখ গোলাপসুন্দরীর দিকে ফিরাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "এর বিয়ে তো হয়ে গেছে।"

সকলেই যেন বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল। এমন কি নির্ব্বিকার সুরঞ্জনও এতক্ষণ পরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সাধুর পানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। গোলাপসুন্দরী সখেদে উচ্চারণ করিলেন, "হ'য়ে আর কই গেছে বাবা ! হ'তে হ'তেও যে হয় নি।"

সাধু আর একবার সর্ব্বাণীর আনত এবং লজ্জা-বিরক্তির সংমিশ্রণে অরুণবর্ণ মুখের উপর স্থির কটাক্ষ করিয়া প্রসন্ন-কণ্ঠে উত্তর করিলেন,

"হ্যাঁ, হয়েই গেছে! এটা তো একটা দুষ্টগ্রহ জনিত প্রচণ্ড বাধা,—এর জন্যে কিছুই আসে যায় না,—সময় হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

"কতদিনে সে সময় হবে বাবা? দয়া ক'রে সেইটি যদি একটু ব'লে দেন, আর যাতে ক'রে সেই বাধাটি কেটে যায়, তার জন্যে কিছু যদি আপনি উপায় করেন।"—

বাধা দিযা সাধু কহিয়া উঠিলেন, "সব ঠিক হযে যাবে মায়ি! সব ঠিক হযে যাবে।"

হঠাৎ তাঁদের পিছনে কুটীরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে অতি মৃদু গুঞ্জনধ্বনির মতই নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতময় স্বরে উচ্চারিত হইল—

"সর্ব্বং সুখং বিদ্ধি সসুখনাশাৎ—"

সকলেই সবিস্ময়ে একসঙ্গে সেইদিকে মুখ ফিরাইল। সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমের পক্ষে অবশ্য অদ্ভুত কিছুই নয়,—শুধু একজন অ্যালামাটি রং করা হরিদ্ররঞ্জিত-বসনা সন্ন্যাসিনী সেই আশ্রমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিযা দুই হাতে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু—যারা যারা সে দিকে চাহিল তাদের কাহারও আর সেদিক হইতে যে দৃষ্টি ফিরিল না! হ্যাঁ, সন্ন্যাসিনীর বেশ যদি পরিতে হয় তো এমন রংযেই পরা উচিত! আর শুধুই কি রং? হাতের পায়ের, মুখের নাকের,—সর্ব্বশরীরের গড়নই বা কি সুন্দর কি সুডৌল! সদ্যস্নানে-সিক্ত রাশিকরা চুল তারই কি কিছু কম শোভা নাকি? গলায় ও হাতে ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা, এ-ছাড়া এই ভৈরবীর সিঁথিতে সিন্দূর এবং হাতে শাঁখার বালাও দু'গাছি আছে।—চাহিয়া থাকিবার মত মূর্ত্তিখানি বটে!

সাধু ডাকিলেন, "তারা-মায়ি! তোমার অতিথ্‌দের কিছু ভোজন করাবে না মায়ি?"

কিন্তু তাঁর তারামায়ীর মুখ দিয়া তখন একটি মাত্র শব্দও বাহির হইল না। ভূত-ভয়গ্রস্ত মানুষ যেমন করিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া থাকে,—সুরঞ্জনের দিকে সে তেমনই করিয়াই আকৃষ্ট—বদ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপরই দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখখানা তার ছাই-এর মত পাংশু হইয়া গেল এবং রক্তশূন্য অধরোষ্ঠ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বোধ হইল সে এখনই হয়ত চৌচাপটে মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

গোলাপসুন্দরীই সবার আগে আত্মসম্বরণ করিলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর মুখ দিয়া কি যেন একটি আত্মীয়তা-সূচিত মিষ্ট সম্ভাষণ অর্দ্ধস্ফুটভাবে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছিল, অদম্য চেষ্টায় সেটাকে প্রাণপণ বলে নিরোধ করিয়া লইয়া তিনি তড়িৎ গতিতে উঠিয়া ভৈরবীর কাছে এক প্রকার ছুটিয়াই আসিলেন। তার হাত ধরিয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে যেন সকলকে শুনাইবার জন্যই দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দেবেন আসুন তো।"

পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিলেন।

মেয়েরা ঈষৎ বিস্ময়বোধ করিল, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝিল না। সর্ব্বাণীর শুধু মনে হইল, এ মুখ যেন তার চেনা,—খুব—খুব বেশিই চেনা,—অথচ ইঁহাকে সে যে কখন দেখে নাই ইহাও তো সুনিশ্চিত! একবার এমনও সন্দেহ হইল, তার আয়নায়-দেখা নিজের মুখ বিম্বের সঙ্গে এঁর মুখের খুব বেশী করিয়াই যেন মিল আছে!

এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে সুরঞ্জনের দিকে কেহই লক্ষ্য করে নাই।

গোলাপসুন্দরী প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁর শাদা-পদ্মের মত শুভ্রবর্ণ রক্তপদ্মের মত আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। ঝটিকা বিধ্বস্ত প্রকৃতির মতই সমস্ত মূর্ত্তিটা তাঁর শুদ্ধ স্থির অথচ বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত।

আসিয়াই নিঃশব্দে সাধুর পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "আবার আমি আসবো বাবা।"

মাথায় বারেক করস্পর্শ করিয়া সাধু কহিলেন, "এসো মায়ি।"

সকলেই উঠিয়া পড়িল। ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা গভীর রহস্যাভিময় হইয়া গিয়াছে,—কি যেন একটা অত্যাশ্চর্য্য অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিতে ঘটিতে হঠাৎ ঘটিল না,- এই রকমই একটি অস্পষ্ট অনুভূতিতে মেয়েদের, বিশেষ করিয়া সর্ব্বাণীর মনটা কেমন যেন বিষাদ সমাচ্ছন্ন ও মোহাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বারম্বারই তার মনে হইতেছিল, পিসিমার মতন সেও যদি ঐ আশ্চর্য্য সুন্দরী ভৈরবীর পিছনে পিছনে ছুটিয়া গিয়া ঐ দরজাটার ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। কেবলই মনে হইতেছিল, কেন তা' করিল না এবং এখনই বা কেন সে সুযোগ সে ছাড়িয়া দিতেছে? অথচ এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড করিবেই বা কি জন্য, একথাটাও তো কোন মতে ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

আশ্রমের ফটকের কাছাকাছি চলিয়া আসিয়াছে,—এখনই পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে,—এমন সময় সহসা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল। এতক্ষণকার,—শুধু তাই নয়,—চিরদিনকার স্তব্ধ স্থির চিরসহিষ্ণু দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ সুরঞ্জন আজ অতর্কিতে বালকের মতই ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছোট বোনের হাত দু'টি দৃঢ়বলে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"আর একবার দেখে যাবো,—গোলাপ। আমায় একটিবার নিয়ে চল্—"

ঝর ঝর্ করিয়া দু'চোখ দিয়া তাঁর জলের দুইটি মোটা ধারা ঝরিয়া পড়িল। গোলাপসুন্দরীও বহুকষ্টে সামলাইয়া রাখা অশ্রুজলের আকুল বন্যা-ধারা উৎসারিত করিয়া দিয়া ভায়ের বুকে মাথা দিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

"ঢের বলেছিলুম দাদা! সে কিছুতেই যে রাজী হ'লো না। বল্লে,—'এর বেশী আমার এ-জন্মে আর পাওনা নেই। ওঁকে চিনতে ব'লো, ওঁকে না বুঝতে পারার মহাভুলের মহাপ্রায়শ্চিত্ত আমি এই সুদীর্ঘ কাল ধ'রে প্রাণ-পণেই করেছি, আরও যতকাল বাঁচি ক'রেই চলবো, শুধু একমাত্র এই কামনা নিয়ে,—যেন জন্মান্তরে আবার আমি পাই,—আর ওঁকেই আমি যে কি পেয়েছি, তা' সেবার যেন চিন্‌তে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ কামনা আমার অপূর্ণ থাকবে না, যেহেতু ভুল করলেও পাপ আমি তো করি নি। আমার প্রচণ্ড অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্ত করতেই এই সেবাব্রত গ্রহণ করেছি, এই করেই একবারের জন্যও দেব-দর্শন তো আমার বিধাতা আমায় করালেন, এই তো আমি ঢের পেলুম।"

গভীর রাত্রে অসহ্য যন্ত্রণাময় বিনিদ্র শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া গোলাপসুন্দরীর মাথার কাছে বসিয়া সর্ব্বাণী আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—"পিসিমা!"

গোলাপসুন্দরীও বোধকরি ঘুমান নাই, হয়ত বা কত কি পূর্ব্ব-স্মৃতি স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে তিনি রোদনই করিতেছিলেন,—প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "কি মা?"

"পিসিমা! আজ যাঁকে দেখলাম উনি কে? উনি কি আমার—কেউ হ'ন?"

সর্ব্বাণীর রুদ্ধস্বর অকস্মাৎ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল সব কথাটা আর সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেই পারিল না।

গোলাপসুন্দরী এবার নিজের রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া অনেকটা সহজভাবেই উত্তর দিলেন, "সবু ঠিকই ধরেছ! শুধু 'কেউই' নয়, সত্যিই ও তোমার মা। আজ সতেরো বচ্ছর পরে ফের ওর সঙ্গে এমনভাবেই দেখা হোল!"

সর্ব্বাণী অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া পিসিমার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

"দেখা না হ'লেই যে ভাল হতো পিসিমা! আমি যে জানতুম, মা আমার স্বর্গে গেছেন, কিন্তু—মেজকাকার সন্দেহই তা'হলে ঠিক?"

গোলাপসুন্দরী উঠিয়া বসিলেন, সন্তর্পণে শোকাহতা ও লজ্জাক্লিষ্টা ভাইঝির মাথাটি কোলের উপর টানিয়া লইয়া সস্নেহে তার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে নিবিড় পরিতোষের সহিত উত্তর করিলেন, "না, মা! এ ভালই হ'লো। আসল খবর সবই তো আমি জানতে পেরেছিলুম। প্রচণ্ড রাগ ও অভিমানেই ওর সমস্ত গুণরাশিকে যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে ত জানি কিন্তু সে ছিল অগ্নিময়ী। বিশুদ্ধ খাঁটি সোনার মতই পবিত্র! রাগ করে না বুঝে বন্ধু ভেবে তোমার বাপের বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যায় আর সে পাপিষ্ঠটা ও'কে নেশা করিয়ে নিয়ে যায় দার্জ্জিলিংয়ে। নেমেই রটিয়ে দেয় ও ঘোরতর উন্মাদ এবং ওরই স্ত্রী। সকলেই অতি সহজেই সেটা বিশ্বাস করে নেয়। তখন নিরুপায়ে ও সেইরাত্রেই খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরবে বলে, কিন্তু মৃত্যু ওর তাতেও হয় নি। তিনমাস হাসপাতালে থেকে যেদিন বাধ্য হয়েই ফিরতে হবে, তার আগের রাত্রে সেখান থেকে পালিয়ে যায় ও এদিকে ঐ লামার আশ্রয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে চলে যায় সিকিমে। মৃত্যু-রটনা হয়েছে ওর পরে যাওয়া শাড়ী জুতো ঝরণার ধারে ফেলে যাওয়ায়। সেই থেকে কঠোর সেবাব্রতী তপস্বিনী হয়ে ও মেয়ে আজ ওর তিনকুল পবিত্র করে চলেছে। ও আর ফিরতে পার্ব্বেনা, তবে তোমার বিয়ের পর তোমাদের দুজনকে দেখবে বলেছে। দাদাকেও সম্ভব হলে সেই সময় নিয়ে যাবে তোমরা।

সর্ব্বাণী নিঃশব্দে পিসিমার কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। তার চোখের জলে তার পিসিমার কাপড় ভিজিয়া যাইতে লাগিল। এ যে

কি অনুভূতি—সুখ না দুঃখ, না আরও কিছু—যাহা ব্যক্ত করিবার কোন ভাষা নাই, থাকিলেও বিশ্ব সংসার খুঁজিয়া হাতের কাছে মেলে না, কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিল না। কেবল জীবনের অনেকগুলো অমীমাংসিত গোপন রহস্য আজ তার কাছে অনাবৃত হইয়া গেল। আর সেই সঙ্গে হৃদয়-ভরা গভীর সহানুভূতিতে তার হৃত-সর্ব্বস্ব বাপের প্রতি তার মমতার স্রোত যেন নূতন ঢল-নামা জলের স্রোতের বেগে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ওঃ! ওই নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যশীল মানুষটা চিরদিন ধরিয়া কত বড় আঘাতটাই না সহিয়া আসিয়াছেন, অথচ চিরদিনই প্রাণপণ করিয়া তাহাকে সেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড সামান্য আঘাতটুকু হইতেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন! এতবড় আহত চিত্তের উপরেও সে নিজে পর্য্যন্ত নির্ম্মমতার শেল হানিতে ত কিছুমাত্রও দ্বিধা করে নাই? কি নিষ্ঠুর, কি হৃদয়হীনা সে! আর তার মা,—তিনি তো সাক্ষাৎ দেবী! এতবড় ত্যাগ এতবড় আত্মনিপীড়ন কে' কবে করিতে পারিয়াছে? এই মাকে সে আর পাইল না, না? না, সে হয়না, এ ওকে পাইতেই হইবে, তা' সে যে সর্ত্তেই কেন হোক না। মা! মা!—আঃ! কি মধুর এ নাম!

১৭

ইহার পরেই সুরঞ্জনের স্বাস্থ্য আবার সহসাই ভাঙ্গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ এত বেশী দুর্ব্বলতা দেখা দিল যে, সর্ব্বাণীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁকে লইয়া কলিকাতা যাওয়া এ অবস্থায় আর সম্ভবপর হইল না। একদিকে ডালির বিবাহের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, অপর দিকে সুরঞ্জনও ক্রমশঃ শয্যাশ্রয়ী হইয়া পড়িতেছেন। উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া গোলাপসুন্দরী যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে তিনি আর একবার সুকুমারকে লইয়া সাধুর নিকট হইতে মাদুলী আনিতে যাইবার ছলে হরিদ্বার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাধুর আশ্রমে সাধু বা ভৈরবী কেহই ছিলেন না। সেখানে শুধু আশ্রম-রক্ষক একটি ভৃত্য ছিল। সে একখানি চিঠি তাঁর হাতে দিয়া বলিল, 'মায়ীজী বলিয়া গিয়াছেন, যদি সেদিনকার মায়ীজী ফিরে আসেন তো তাঁকে এই পত্র দিতে, নতুবা এই পত্র এক মাস পরে ছিঁড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিতে বলিয়াছেন। সে পত্র খুবই সংক্ষিপ্ত। তাতে এই কয়টি লাইনমাত্র পেনসিলে লেখা ছিল,—

"বোন! নিজের উপর ভরসা হইতেছে না। তাই বাবাকে সব কথা জানাইয়া তাঁর সঙ্গে আবার হিমালয়ের দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছি। আমি আমার জাগ্রত দেবতার অপমান করিয়াছিলাম। এ দেহে তাঁর পদ সেবার কোন অধিকারই আর আমার নাই। তা'ছাড়া জগতের চক্ষে আমি যে মৃত! মরা মানুষ কখন ফিরিতে পারে না, পারিলে,— একবার সেই পা দু'খানির ধূলা লইয়া মাথায় নিতাম!—যাক্ এ বৃথা দুরাশার প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। একটা কথা তোমায় বলিয়া যাই,—তোমরা হয়তো ভাবিয়া পাও না, অমন দেবতার মত স্বামী যার, তার এমন মতিচ্ছন্ন হয় কেন? আমি নিজেই সেকথা আজ পর্য্যন্ত জানি না। এ বোধহয় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল! এ-ভিন্ন এর আর কোন অর্থই আমি বা গুরুজী এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। তবে এ যে আশৈশব যথার্থ ধার্ম্মিক শিক্ষা না পাওয়ারই কুফল, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই।

আশীর্ব্বাদ করি, আমার মেয়ে তার পিতৃ-পুণ্যে সকল অবস্থার মধ্যেই পবিত্র ও সুখী হোক। তাঁকে আমার শতকোটি প্রণাম দিও। ভগবান তাঁকে ভাল রাখুন, দীর্ঘজীবী করুন। ফিরিতে বড় বেশী সাধ

যাইতেছে বলিয়াই তুরন্ত প্রলোভন জয় করিতে দূরে চলিলাম। 'ক্ষমা করিও।"

—ভৈরবী।

চিঠি গোলাপসুন্দরী সুরঞ্জনকে দেখাইয়াছিলেন, পত্র পাঠ করার পর সুরঞ্জনের ক্লিষ্ট অধরে পরিতৃপ্তির মৃদু স্নিগ্ধ হাস্যরেখা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র। একটিও কথা তিনি মুখ ফুটিয়া বলেন নাই।

নীচে সেদিন সুকুমারের সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জ্জি চা খাইতে আসিয়াছিল। গোলাপসুন্দরী বিবাহের দিন পিছাইবার জন্যই তাঁর ভাবী জামাতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। বিবাহটা বৈশাখে হওয়া যেন অসম্ভবই মনে হইতেছে। সুরঞ্জনের আজ চার-পাঁচদিন হইতে বুকের কষ্ট বড় বেশি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছেন, হার্টের অবস্থা এমন যে, যে-কোন মুহূর্ত্তেই হার্ট-ফেল হইলেও হইতে পারে। ডাক্তারের মন্তব্যে সন্দিগ্ধ হইবার মত মনের বল গোলাপসুন্দরীর তো ছিলই না, সর্ব্বাণীও এবার যেন তার মানসিক শক্তির উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। সে বুঝিতেছে বাপের শরীরই শুধু নয়, মনেরও অবস্থা কি বিপর্য্যস্ত!

উপরের ঘরে সর্ব্বাণী বাপের কাছে বসিয়া আছে, সে ঘরে আর কেহ তখন উপস্থিত নাই। সহসা অবসাদ-নিমীলিত নেত্র উন্মিলিত করিয়া সুরঞ্জন ডাকিলেন, "ক্ষণু!"

অস্ত-সূর্য্যের উত্তাপ-বিহীন সুবর্ণ-কিরণে ঘরের মধ্যটা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই স্বর্ণচ্ছটায় সুরঞ্জনের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখ অধিকতরই বিবর্ণ ও ক্লান্ততর দেখাইতেছিল। সর্ব্বাণী নির্নিমেষ চোখ মেলিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

"বাবা!"—বলিয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল। সুরঞ্জন নিজের

একটি দুর্ব্বল হাত তার কোলের উপর ধীরে ধীরে তুলিযা দিলেন, তারপর ক্লান্ত দৃষ্টি মেয়ের মুখে তুলিয়া ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "বুঝতেই পারছো তোমার সঙ্গে আমার দু'চারটে নিতান্ত দবকারী কথা কয়ে নেওয়ার সময় এসে পড়েছে! না, এটাকে অস্বীকার কর্ব্বার কোন পথ তোমার নেই। গোলাপের সাধ সুকুমারের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন, কিন্তু তোমার যদি মন না থাকে আমি তা'তে অবশ্য মত দোব না। তবে একথাটাও তোমায় জোর দিযে বল্‌ছি যে, সে যা বলছে সেটা নেহাৎ অন্যায কথাও নয়! সুকুমার অতি সৎ ছেলে এবং এ বিয়ে সব দিক থেকেই তোমার সম্পূর্ণ উপযোগী হবে। ভাল করে তুমি সেটাও ভেবে দেখ।"

সর্ব্বাণী বাপের হাতখানিব উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল, "না বাবা!—আমার এতে মত নেই।"

সুরঞ্জনের পাণ্ডুমুখ মেয়ের এই উত্তরের উত্তেজনায় এবার ঈষৎ রক্তাভ্ হইয়া উঠিল। মাথার বালিশ হইতে কষ্টে মাথাটা তুলিয়া উত্তেজনা-পূর্ণ ঈষদুষ্ণ চঞ্চল-স্বরেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি এখনও বুঝতে পারছো না যে, আমি—যাচ্ছি? এরপর তুমি কি নিয়ে থাকবে?—তোমায় দেখবেই বা কে'? এসব কি কথা এখনও,—তুমি ভেবে দেখবে না অতি প্রয়োজনীয় নিজের জিদেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে?"

সর্ব্বাণী প্রাণপণ বলে ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া আকস্মিক উচ্ছ্বসিত উদ্দাম অশ্রুস্রোতকে ভিতরে চাপিয়া রহিল, তারপর একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সবলে দমন পূর্ব্বক সহসা গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার বিয়ে হ'লে তুমি কি বড্ড বেশি খুশি হবে? তাই যদি হও,—তবে আমি—আমি—হ্যাঁ আমি বিয়েই করবো। কিন্তু করি তো সুকুমারদা'কে নয,—সেই—সেই—সেই আগের লোকটিকেই।"

সুরঞ্জনের শিখা শূন্য প্রদীপের মত নিষ্প্রভ মুখ বারেক গভীর আনন্দের জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে গেল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কা'কে? গৌরীপতিকে?"

সর্ব্বাণীর মুখখানা ইতিমধ্যেই শ্রাবণ-মেঘের মত স্থির গম্ভীর ও জলভারাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। নির্লিপ্ত কণ্ঠে সে ধীর স্বরে উত্তর করিল, "কি 'পতি' সে তো আমি জানি নে' বাবা! সেই যার সঙ্গে তুমি সেবারে আমার বিয়ে দিচ্ছিলে না,—মণিকাদির সেই যে কি রকম দেওর হয়।"

সুরঞ্জনের মুখের সেই ক্ষণিক উজ্জ্বলতা সহসা মেঘাবৃত চন্দ্র-কিরণের মত ম্লানায়মান হইয়া আসিল। মৃদু সংশয়াচ্ছন্ন স্তিমিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন, "সে কি এখনও বিয়ে করে নি? না হলেও হয়তো সে আর তোমায় নিতে মত করবে না।"

সর্ব্বাণী বাপের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাঁর মাথার চুলের ভিতর আস্তে আস্তে আঙ্গুল চালাইয়া তাঁহাকে একটুখানি স্বস্তি দেবার চেষ্টা করিতেছিল। সচেষ্ট সহাস্য মুখে উত্তর করিল, "হয়ত মত করলেও করতে পারে বাবা! মাস দুয়েক আগেও সেই ভদ্রলোকটি মণিকাদিকেই চিঠিতে জানিয়েছিল,—আচ্ছা আমি কাল বরং মণিকাদিকেই খবরটা নিতে লিখবো'খন, কি বল?"

গোলাপসুন্দরী নিজে ভাইয়ের কাছে বসিয়া সর্ব্বাণীকে যখন নীচে এ-বাড়ীর ভাবী জামাইকে চা খাওয়াইতে পাঠাইয়া দিলেন, তখন তার মনে শাড়ী বদলাইয়া চায়ের টেবিলে যাইবার পরিবর্ত্তে একটি কোন ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে বসিবার আগ্রহ অনেক বেশিই প্রবল ছিল, কিন্তু উপায় কি? ডালি আজকাল সর্ব্বাণী না থাকিলে মিঃ ব্যানার্জ্জীর সামনে বাহির হইতে চায় না। আর পিসিমারও সেটা পছন্দ নয়। অগত্যা পিসিমার আদেশ না রাখিলে ভাল দেখায় না, অথচ,

সর্ব্বাণীর কি এখন এসব কিছু ভাল লাগে? তার উপর আজ যে কাজ সে করিতে বাপের কাছে সম্মত হইয়া আসিয়াছে, তারপর? নাঃ, এ পৃথিবীতে,—বিশেষ করিয়া এই ভারতবর্ষে মেয়ের সৃষ্টি যে ভগবান কেনই করিয়াছিলেন!

পাশের বাংলোয় একজন কা'দের গ্রামোফোনের রেকর্ডে তখন বাজিতেছিল—

"মানিনী তোমার এত কি অভিমান?
আমার শিখি-চূড়া মোহন-বেণু চরণ-তলে ধূলি-ম্লান।"

রোদনারক্ত নেত্র দুইটি বারে বারে জলে ধুইয়া কোনমতে একটা মারহাট্টি রাঙ্গা শাড়ী গায়ে জড়াইয়া লইয়া সর্ব্বাণী আসিয়া পাত্রে পাত্রে চা ঢালিয়া দিল। তার মুখের দিকে দু'জনেই একসঙ্গে সাগ্রহে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তার মুখ দেখিয়া কেহ কোনো কথাটিও যেন বলিতে পারিল না। শ্রাবণ-সন্ধ্যার জলভারসমাকুল ব্যাপ্ত মেঘ-গগনের মত তার সমস্ত মুখখানা যেন অব-রোদনের গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। হাত দিয়া সে জল খাবার সাজাইতেছে, পরিবেশনও করিতেছে, অথচ তার সমস্ত দেহ মন যেন এখানের কোনো কিছুতেই সংশক্ত হইয়া নাই, একান্ত উদাসীন ও নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তার মনের মধ্যটা যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের আক্রমণের জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়াই জানা যাইতেছিল। সুকুমার আবার একবার গভীর স্নেহের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ চোখ দু'টি তুলিয়া তার সেই স্তব্ধ বাহ্য মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া দেখিল। মিঃ ব্যানার্জীও যখন সবিস্ময়ে তাহাকে প্রতি-নমস্কার করিয়া তার বাপের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, তখন তার চোখের দৃষ্টিতে এবং কণ্ঠস্বরে সমানভাবেই সহানুভূতি প্রকাশ পাইল।

সর্ব্বাণী যখন দেখিল তার জন্য অন্যে দুঃখ অনুভব করিতেছে, তখন নিজের বুকের অসহ্য যন্ত্রণা সযত্নে নিরোধ করিয়া সে ডালিকে লক্ষ্য করিয়া রহস্যালাপ জমাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে গেল। পাশের বাড়ীর গ্রামোফোন রেকর্ডে তখনও ঐ গানটারই অন্তরা বাজিতেছিল,—

"তবু রাধে, না তোল বয়ান, তুমি পাষাণে কি বেঁধেছ—
পরাণ গো,—
আমার শিখি-চূড়া মোহন-বেণু চরণ-তলে
ধূলি-ম্লান।"

বর্ষণ-মুখর বর্ষারাত্রের ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ চমকের মত পরিম্লান মন্দহাস্যে সে ডালির লজ্জানত মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোল না বাপু, মুখ,—এক্ষণই কি মোহন-টেরি, হ্যাটের চূড়া 'চরণ-তলে ধূলি-ম্লান' হবে?"

ডালি তার কালো চোখে হাসির বিদ্যুৎ হানিয়া কৃত্রিম কোপে কুঞ্চিত ললাটে মুখখানা ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে একটা চড় মারিয়া বলিল, "সবিদি' কি যেন হ'চ্ছে দিনকের দিন!"

মিঃ ব্যানার্জ্জী চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া মুখ নত করিল এবং তার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা গভীরার্থনিহিত দীর্ঘশ্বাস তার অজ্ঞাতসারেই উত্থিত ও নির্গত হইয়া গেল। কি ভাবিয়া বলা যায় না, কোনমতে চাটা নিঃশেষ করিয়া কাজের ছুতায় সে বিদায় লইয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় এক নিমেষের জন্য সর্ব্বাণীর প্রতি চাহিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিল। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, কিন্তু এমন একটু বিসদৃশ ভাবে সেটা ঘটিল যে, সকলকারই সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিল না। এমন কি যাত্রাকালের সেই চাহনীটুকু

ডালির মনে সহসাই যেন একটুখানি আঘাত হানিল। মুখ ঈষৎ রাঙ্গা করিয়া সে স্তব্ধ হইয়া থাকিল। মুখে না ফুটিলেও মনের মধ্যে তার যেন একটা অস্ফুট সন্দেহের আভাষ বারেকের মত জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছিল এবং সন্দিগ্ধচিত্ত অভিমানে গুমরিয়া বলিতেছিল,—"আমি দেখেছি সবিদি কথা ব'ললেই ওঁর মুখ কি এক রকম হ'যে যায়। সবিদির সঙ্গে ভাল ক'রে মুখ তুলে কথা কইতেও যেন আজকাল আর পারেন না,—এর মানে কি? বোধ হয় মনে মনে ওকেই উনি ভালবাসেন! কিন্তু—তা' হ'লে আমায় বিয়ে করতে মত দেওয়ার কি দরকার ছিল?—না দিলেই তো পার্ত্তেন?"

শেষে এই সিদ্ধান্তটাকেই দৃঢ় করিয়া লইয়া মন হইতে সন্দেহের বিষ ঝাড়িয়া ফেলিল। "কি যে পাগলামী করছি! তা'হলে সেকথা না বল্‌বেনই বা কেন? কে' আর কি করতে পারতো? কেউ তো জোর করতে পার্ত্তো না আর ও ওতো ফ্রিই রয়েছে, বাধা তো ছিল না কিছুই।"

চায়ের পর্ব্ব শেষ করিয়া সর্ব্বাণী বাপের কাছে ফিরিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে একাকী একবার পিছন দিক্‌কার বাগানটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। সার-বন্দী বাঁশঝাড়গুলি তাদের সরল দেহ যষ্টি উন্নত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে মহাকাশে তাকাইয়া আছে। ঝাউগাছের পাতায় পাতায় বসন্তের শেষ হাওয়া ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই বাতাসে সরু সরু পাতাগুলি থাকিয়া থাকিয়া থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বহুবিধ আরণ্য লতা ও গোলাপের অস্পষ্ট গন্ধের সহিত মিশ্রিত ওষধিজাতীয় পত্রাবলীর তীক্ষ্ণ গন্ধ বাতাসটাকে স্নিগ্ধতায় ভরাইয়া রাখিয়াছে। ইতিমধ্যেই অনেকটা দূরের ধূমল পর্ব্বতমালার আলস্য অলসিত অঙ্গ হইতে যেন একখানি নিদ্রাভরা শিথিলবাস ধীরে ধীরে ধরণীর অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

মুখর পক্ষী কলরবে মর্ম্মরিত পত্ররবে স্নিগ্ধ হাওযায় সন্ধ্যা-ধূসর গিরি-চিত্রে নিদ্রাভরা অবসাদ যেন সর্ব্বাণীর মনেও ছড়াইয়া পড়িল। তার বোধ হইল এতদিনে সে যেন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, সে যেন সমর-পরাজিত আহত সৈনিক,—সে যেন ঘরছাড়া বিপন্ন-পথিক,—কিসের যেন একটা উপলব্ধিতে প্রাণ তার ব্যাকুল ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে,—সে চায় আজ কোথাও একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিতে।

"সর্ব্বাণি!"

"সুকুমারদা'!"

দু'চোখ তার অকারণেই জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, চকিতে হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া পিছন ফিরিল। গোধূলিবেলার ছায়ালোকে মুখের উপর অশ্রু-হাসির রেখাপাত করিয়া কৃত্রিম প্রফুল্লতা দেখাইয়া একেবারেই বাজে কথা কহিল,—বলিল,—"একটা পাখী বেশ মিষ্টি সুরে ডাক্‌ছিল।"

বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুকুমার তার বানানো কথা বিশ্বাস করিল না অথবা পাখীর ডাকে তার কোন আস্থা ছিল না, সে তার একটু কাছাকাছি আসিয়া অনাড়ম্বরভাবেই বলিতে আরম্ভ করিল,—"তোমায় কিছু বলতে চাই, যদি বিরক্ত না হও তো বলি।"

পাখীর ডাক এবং সান্ধ্য-বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি মুহূর্ত্তে যেন কোথায় কর্পূর হইয়া মিলাইয়া গেল। ঘুমের আবেশে তন্দ্রাভরা মন বাস্তবের রূঢ়স্পর্শে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল,—সর্ব্বাণী সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু শক্ত হইয়াই জবাব দিল,—"বিরক্ত হ'বার সম্ভাবনা যখন রয়েইছে, তখন না-ই বা বল্লে সুকুমারদা'?"

সুকুমার সাড়া দিল না। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি আসন্ন হইয়া

আসিতেছে, গাছের মধ্যে তীব্রস্বরে ঝিল্লিরব উত্থিত হইয়াছে, কুলায়াভিমুখী পাখীদের ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দ, মাঝে মাঝে কচিৎ কুকুরের ডাক, বাতাসে বৃক্ষপত্রের ঝর্‌ঝরাণি এবং গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়ার সোল্লাস গন্ধর্ব্ব-নৃত্য—সবশুদ্ধ জড়াইয়া দৃশ্যপট অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছিল। সুকুমারের মনের মধ্যে উদার প্রকৃতির এই স্নিগ্ধতা হয়ত শান্তিজলের মতই স্পর্শ করিল। বিলীয়মান-প্রায় দিনান্তের পায়ে সে তার অপরাগত পৌরুষের দ্বারা নব-জাগ্রত বাসনাকে নৈবেদ্য প্রদান-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ নিরাময় নিস্পৃহকণ্ঠে কথা কহিল,—বলিল,—"তবে থাক। অন্য আর একটা প্রয়োজনীয় বিষয়েই তা'হলে কথা বলি,—তোমার কি মনে হয় না ব্যানার্জ্জীর মনে ডালি সম্বন্ধে একটা ঔদাসীন্য রয়ে গিয়েছে? —অর্থাৎ ও তেমন আগ্রহ ক'রে ওকে বিয়ে করছে না, আমাদের এবং নিজের ঘরের তাড়াতেই যেন বাধ্য হয়েই করছে?"

সর্ব্বাণী সর্ব্বদেহে ও মনে চম্‌কাইয়া উঠিল। তার মুখ আচম্‌কা তারই হৃদয়োত্থিত দমকা রক্তের উচ্ছ্বাসে টক্‌টকে লাল হইয়া গেল, চোখ মুখ কাণ মাথা গরম হইয়া চারিদিকে যেন অসহ্য ঝাঁজ ছড়াইতে লাগিল, সেই সঙ্কটময় অবস্থা হইতে কষ্টে আত্মদমন করিয়া লইয়া যেন একান্ত নিরাসক্ত-ভাবে অবশেষে সে সুকুমারের কূটনৈতিক প্রশ্নের এই বলিয়া জবাব দিল, "এ তোমার কল্পনা,—সুকুমারদা'!"

সুকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে ঠায় চাহিয়াছিল। সর্ব্বাণীর সহিত বারেক দৃষ্টি মিলিত হইতে দু'জনেই এক সঙ্গে দৃষ্টি নত করিল। সর্ব্বাণীর চক্ষে ফুটিয়া উঠিল নিদারুণ লজ্জার বিব্রত বিড়ম্বনা এবং সুকুমারের নেত্রে ব্যক্ত হইতে চাহিল সহানুভূতিপূর্ণ খেদ। ক্ষণকালের নীরবতার পর সহজভাবে দৃষ্টি তুলিয়া সে তার স্বাভাবিক সদয়কণ্ঠে বলিল, "যে-সম্পর্ক তুমি আমার সঙ্গে কায়েমী করতে চাইলে, তারই জোরে তোমায়,

—আমার পক্ষে দুঃসাহস জেনেও বলছি,—আমার সন্দেহ যদি মিথ্যা না হয় ত আমায় এখনও তুমি বলো, আমি ওর মনের খবর জেনে নিই। যদি সত্যিই ও তোমায় মনে রেখে ডালিকে বিয়ে ক'রে, তার পক্ষে সেটা সম্মানেরও হবে না, আর সুখেরও হবে না। তোমার দিক দিয়ে যদি বাধা না থাকে তা' হ'লে এখনও অনায়াসেই এ-বিয়ের ক'নে বদল হ'তে পারে এবং সব দিকেই তা'তে সুরাহা হয়ে যায়। হয়ত এর পর আর ফেরবার পথ কারুই থাকবে না।"

আকাশে তারার প্রদীপগুলি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সূর্য্যাস্ত-রাগ-রঞ্জিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের স্তবক জ্যোৎস্নালোকে কলধৌত বস্ত্রপুঞ্জের মতই ততক্ষণে বিদ্যুৎপ্রভ শুভ্রতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই দিকে চোখের দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সর্ব্বাণী তার মানস জগতের সমুদয় দ্বন্দ্বকে পূর্ণবলে পরাজিত করিয়া দিয়া সহজ ভাবেই উত্তর করিল,—"ভুল বুঝো না সুকুমারদা'! আমার মতে মানুষ হবে একনিষ্ঠ,—সেই নিষ্ঠার জন্যে যদি তাকে চিরজন্ম ধরে দুঃখ পেয়ে মরতেও হয় তা'তেও ভয় পেয়ে তার পিছিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। মনকে যদি রাশ ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটিয়ে দিই, কোথায় না' সে আমায় নিয়ে যেতে পারে?—সে তো আমি সম্প্রতি ভাল করেই জেনেছি। যদি কখন বিয়ে করি, বাবার সেই বাকদান করা তাঁকেই—আর না হ'লে অন্য আর কারুকেই নয়।"

রাত্রি প্রহরের কোয়াশামুক্ত আকাশের নির্ম্মল নীল নবোদিত চন্দ্র-কিরণে স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, বাতাস অস্ফুট কলহাস্যে পুষ্প-সমৃদ্ধ গোলাপ-লতাদের কাণে কাণে কি না জানি কি কথাই বলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সে ভাষা তো মানব কর্ণের অনধিগম্য, শুধু স্পষ্ট হইয়া কাণে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল পথিপার্শ্বের কেনালের সেই অবিশ্রান্ত কল্লোল-মুখর ছুটন্ত জলের অশ্রান্ত তরঙ্গধ্বনি মাত্র,—আর

কিছু নয়। দুজনের বুকের মধ্যে কি তারই প্রতিধ্বনি তেমনি ভাবেই ধ্বনিত হইতেছিল? কে' বলিতে পারে?

এই সহসাগত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া স্বল্প পরে সসম্ভ্রমে সুকুমার কহিল,—"তোমার নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাক,—কায়মনে এই আশীর্ব্বাদই তোমায় করছি।—ইচ্ছা হয়তো একটু পরেই তুমি বরং যেও,—আমি এখন মামাবাবুর কাছেই যাচ্চি।"

এই সুকুমার! এমন সহৃদয়, এমন মমতাময়, এতই মহৎ, তা' হোক!—তার মা,—ওঃ! কিসের জন্য, ওঃ কি অহমিকায় জ্ঞান হারাইয়া নিজের সঙ্গে তাঁর অমন মহত্তম পুরুষোত্তম স্বামীর সারা জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন, আর কি কঠোরতা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চলিয়াছেন, আজও যার শেষ ছেদ টানা চলিল না! সর্ব্বাণীকে যে নূতন করিয়া তার মা-বাপের বংশ-পত্রিকা রচনা করিতে হইবে। এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি তো আর সেখানে রাখা চলিবে না,—অহঙ্কারের স্পর্শলেশও নয়, আগুনে-পোড়ান নিখাদ সোনার মতই সে হইবে নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ, সেও তো তার মাতৃ-শোণিতের উদ্দাম ফেনোচ্ছল তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া গভীর সমস্যার সৃষ্টি নিজ জীবনেই শুধু নয়, তাঁর জীবনেও সৃষ্টি করিতে ছাড়ে নাই! কিন্তু তার সেই পরম নিষ্ঠাবতী এবং প্রচণ্ড তেজোময়ী জননীর এত বড় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের পরও কি নিজের কৃতকার্য্যের সংশোধন সে করিবে না, পরন্তু সেই ভুলেরই জের টানিয়াই চলিবে? অথবা নতি এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইয়া স্বকৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক পিতাকে শেষ শান্তি প্রদান করিবে?

১৮

সর্ব্বাণী সত্য সত্যই তার বাপকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত মণিকাকে পত্র লিখিল। লিখিল এই কথা কযটা,—

"ভাই মণিকাদি! আমার এ চিঠি প'ড়ে তুমি হয়ত হাসবে,—কিন্তু হাসতে হয়—হেসো—আমার যা' চরম পরিণতি তার ব্যবস্থা যা কিছু তা' আমাকে আজ নিজেকেই করতে হবে। মনকে আঁখি-ঠারা আর চলে না,—সত্যি সত্যিই আমার বাবা আজ মৃত্যু-শয্যায়। এর পর আর আমার পক্ষ থেকে বেশি কিছুই যে জানাবার থাকতে পারে না, যত দূরেই থাকি, আর আমার ব্যবহার তোমার মনকে আমার প্রতি যতই বিরুদ্ধ ক'রে তুলে থাক তবুও তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে। আজ আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করবো, আমি হয়ত ভুলই করেছি। আমার বাবাকে সংসারের আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও অন্ততঃ আমার সংসারী হ'য়ে সুখী হ'বার চেষ্টা করে তাঁকে সুখী করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তো তখন সব কথা জানতুম না।—যাক, গতানুশোচনা নিষ্ফল! সময় হয়ত বেশিও আর হাতে নেই। যদি সেই ক্ষমাশীল ভদ্রলোকটি এখনও এই দুষ্ট-দুর্দ্দান্ত আধখানা কনেটাকে গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন, তাঁকে অবিলম্বে এখানে এসে আমার একটা গতি-মুক্তি ক'রে যেতে ব'লো। আমার বাবার শরীরের অবস্থা এত মন্দ যে ডাক্তার বলেছেন,—যে কোন মুহূর্ত্তে,—উঃ—আর পারচিনে আমি,—মণিকাদি! পারতো ঐ সঙ্গে তুমিও চলে এসো।—বাবাকে শেষ শান্তি দিতে চাই।

—সর্ব্বাণী।"

পত্র লিখিয়া পত্রে এখানের ঠিকানা দিয়া ডাকে পাঠাইয়া সর্ব্বাণী যেন অন্তরে অন্তরে একটা দারুণ তিতিক্ষা অনুভব করিতে লাগিল। খুনী আসামী প্রতিদিন বিচারকের রায়ের প্রতীক্ষা করিযা করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যু যাতনা অনুভব করিতে থাকে, কিন্তু সেই সর্ব্বক্ষণের প্রতীক্ষা যখন তার যেদিক দিয়াই হোক সুফল না হইলেও সফল হয়, তখন তার মনের মধ্যে আর যা-ই থাক চিন্তা করার শক্তি লেশমাত্রও থাকে না। সর্ব্বাণীরও যেন সেই রকমটাই ঘটিল। তার মনে হইল, সেও একটা যেন ফাঁসির আসামী! চরম দণ্ডের আদেশ তার হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু সেই সময়টা আসিয়া পৌছাইতে যে টুকু দেরি।

এদিকে মিঃ ব্যানার্জ্জী বৈশাখের বিবাহটাকে পাত্রীপক্ষের ইচ্ছামত যথাকালের হাতে সঁপিয়া দিয়া নির্ব্বিবাদে জঙ্গলে জঙ্গলে 'টুরে' ঘুরিয়া ফিরিতেছে। সুকুমার একান্ত ম্রিয়মাণ। ডালি কিন্তু হাজার চেষ্টা করিয়াও তার হাস্য মুখরতাকে ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের কাঁথামুড়ি দিতে সমর্থ হয় নাই। অসঙ্গত ঠেকিলেও এ বাড়ীর মরুবৎ রুক্ষতার মধ্যে শুধু সুশ্যামল 'ওয়েসিস' হইয়া রহিয়াছিল এই একটি মাত্র তরুণী মেয়ের হাসি মুখখানিই।

এদিন সুরঞ্জনের বুকের ব্যথাটা বাড়িয়া উঠিযাছে। ডাক্তারের আনাগোনা সমানেই চলিতেছিল, সেদিনে সেটা বর্দ্ধিততর হইল। সেবা-শুশ্রূষার কোনদিনই ত্রুটি ঘটে নাই, তবুও ত রোগযাতনা বাড়িয়াই চলিয়াছে! রোগী মুখে প্রকাশ করিতে না চাহিলেও ডাক্তারের যন্ত্র এবং আত্মীয়ের দৃষ্টি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে অসমর্থ হয় না, স্পষ্টই বুঝা যায় রোগটি বৃদ্ধির পথেই দ্রুত ধাবিত হইতেছে।

সারাদিনের পর সেদিনের অপরাহ্ণে আকাশের গায়ে গায়ে খানিকটা

মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল। বর্ষণের পূর্ব্বেকার একটা গুমোট ভাব যেন প্রকৃতির মধ্যেও জাগিয়া রহিয়াছে। আর তারই পূর্ণ প্রভাব পড়িয়াছিল সর্ব্বাণীর শরীর মনে। তার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সুগভীর ক্লান্তির যে অবসাদ নামিয়া আসিতেছে জোর করিয়া তাহাকে আর যেন খেদানো যায় না। বাপের বিছানার প্রান্তে বসিয়া সে তার দুটি নিষ্পলক নেত্র দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে, বাপের দিকেও বেশীক্ষণ চাহিতে যেন ভরসা হইতে ছিল না। তার মনে হইল, আকাশে আজ যেন তারা উঠে নাই, পৃথিবীতে কোথাও যেন আলোর এতটুকু চিহ্ন নাই, সমস্ত বিশ্বে যেন প্রাণ স্পন্দনের সাড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, সে যেন মৃত!—আতঙ্কে প্রাণ তার কম্পিত বুকের ভিতর আড়ষ্ট হইয়া সঁাটিয়া গেল। বুকের মধ্যের রুদ্ধ বেদনা ভয়ার্ত্ত গুঞ্জনে গুমরিয়া কাণের কাছে আসিয়া কহিতে লাগিল,—কিসের—ওঃ!—কিসের এ সূচনা?—কিসের?—কিসের? কিসের?

গোলাপসুন্দরী একটি বারের জন্য উঠিয়া গিয়াছেন। সারাদিনের পর কিছু মুখে দিয়া আবার সারারাত্রির জন্য তৈয়ারী হইয়া ফিরিবেন। সুকুমার ও ডালি ঘরের এক পাশে একখানা সোফায় নিঃশব্দে বসিয়া আছে। আজ আর ডালির মুখেও ভাষা নাই, হাসি নাই বরং একটা অব্যক্ত বেদনার অশ্রুভারে তার চোখ মুখ থম্ থম্ করিতেছে। আলোর উপর সবুজরংয়ের হাল্কা সেড্ দেওয়',—স্তব্ধ ঘরে শুধু সহিষ্ণু রোগীর ঈষদ্ব্যক্ত রোগ যন্ত্রণা ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হইতেছিল, সেও একান্ত অস্ফুট ও বহু বিলম্বিত ভাবে। এখনও সেই চিরদিনের মতই আত্মদমনের প্রাণপণ প্রয়াস!

সিঁড়ি দিয়া একটা জুতা-পরা পায়ের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কোন আত্ম-বিস্মৃত লোক খুব দ্রুত পায়েই উপরে উঠিয়া আসিতেছে। নিশ্চয়ই

এ ঘরের অবস্থার সঙ্গে সে ব্যক্তি বিশেষ রূপে পরিচিত নয়, নতুবা আজ —এমন সময়,—এ ভাবে এ কেমনই বা তার আত্ম-বিস্মৃতি ?

ত্রস্ত হইয়া সুকুমার উঠিয়া গেল, কিন্তু সে পা টিপিয়া বাহিরে যাওয়ার পূর্ব্বেই যে আসিতেছিল, সে আসিয়া ততক্ষণে খুব বেশি উত্তেজিত ভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাণী তার বিস্মিত বিরক্ত দৃষ্টি তুলিয়া মুখ ফিরাইতেই চিনিল,—যে আসিল সে তাদের অচেনাও নয় এবং এ দিনের এ ঘরের অবস্থাও তার অবিদিত নয়, ইতঃপূর্ব্বে দ্বারের বাহির হইতে এ লোক এই রোগীর সংবাদ কয়েকবারই লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের বা বাধা দেওয়ার অবকাশ মাত্র পাওয়া গেলনা। ইহার জোর পায়ের শব্দেই খুব সম্ভব সুরঞ্জনের তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল। চোখ মেলিয়া বারেক এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কে' ও ?"

সুকুমার ততক্ষণে কাছে আসিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জী তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া সুরঞ্জনের নিকটস্থ হইতে উচ্চতর ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আমি গৌরীপতি।"

রোগী একেবারে সর্ব্বশরীরে চম্‌কাইয়া উঠিলেন। পূর্ণ বিকসিত ব্যাকুল চক্ষে চাহিয়া তার দিকে একটা হাত বাড়াইয়া দিয়া অস্বাভাবিক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি গৌরীপতি ? সবু তোমায় ডেকেছিল ? তাই কি তুমি এসেছ ?"

রোগীর খাটের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে সুরঞ্জনের অতি-শুভ্র এবং শীর্ণতায় শিরা-বহুল প্রসারিত সেই হাতখানি সযত্নে ধরিয়া হর্ষোচ্ছ্বসিত স্বরে গৌরীপতি উত্তর করিল, "হ্যাঁ, ওঁর ডাক শুনেই তো আমি ছুটে এসেছি। আমিতো জানতাম না,—এই—এইমাত্র মাণিকা-

বৌদির চিঠিতে জানতে পারলাম যে—এতদিন ধরে আপনারই এখানে রয়েছেন !"

সুরঞ্জন অল্পক্ষণ নিমীলিত নেত্রে নিঃসাড়া পড়িয়া থাকিয়া তারপর যেন সচেষ্টায় হৃত-শক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক বিশীর্ণ স্মিতমুখে যথাসম্ভব উৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকিলেন, "ক্ষণু !"

গৌরীপতি যে ভাবে ছিল তার পাশে তেমনই করিয়া বসিয়া পড়িয়া সর্ব্বাণী তার ভয়-বিশুষ্ক, বিবর্ণ মুখে অতি স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটা ফুটাইয়া তুলিয়া পরম আশ্বস্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "বাবা ! এইবার তো তোমায় বেঁচে উঠতেই হবে। যে বিয়ে তুমি দিতে বসেছিলে,—তুমি সেটা শেষ করে না দিলে সে আবার দেবে কে ?"

তিনজনের মধ্যে কেহই জানিতে পারিল না সুকুমার ও ডালি তাদের অলক্ষ্যে কোন্ সময়ে সে ঘর হইতে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছিল।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

অনুরূপা দেবী প্রণীত

—অন্যান্য উপন্যাস—

পোষ্যপুত্র	৪৷৷০
বাগ্‌দত্তা	৫৲
মন্ত্রশক্তি	৪৷৷০
পথের সাথী	৩৲
হারানো খাতা	৩৲
গরীবের মেয়ে	৪৷৷০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬